পরের ছেলে

নিরুপমা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

ফোন :—৩৪-১৭৪৪ গ্রাম :—Publicasun, Cal.

পরের ছেলে

নিরুপমা দেবী প্রণীত

—অন্যান্য উপন্যাস—

দিদি 8।।০

যুগান্তরের কথা ২৲

অন্নপুর্ণার মন্দির ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

রুগ্ন স্বামী শয্যায় শুইয়া ছিলেন, স্ত্রী কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছেন। উভয়েই সংসারের নিকট বহুদিনের বহু অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন, কেন না উভয়েই চুল পাকাইয়া প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহাতে আবার স্বামী নন্দকিশোর রায় একজন বড় দরের জমিদার। তাঁহার সন্তান-হীনা পত্নী রাজেশ্বরী দেবীও স্বামীর সর্ব্ব-বিষয়ে একমাত্র অধীশ্বরী। তাঁহাদের পরস্পরের স্নেহ বা কোন বিষয়ের মধ্যেই অন্য-কোন ভাগীদার নাই।

উভয়ের মুখ কিন্তু অতি বিষণ্ণ। কর্ত্তার ব্যারামের জন্য নূতন করিয়া আজ এ অশান্তি জাগে নাই। জমিদার আজ বৎসরাবধি কাল এইরূপে শয্যাগত আছেন; সুতরাং সেটা উভয় পক্ষেরই যেন গা-সহা হইয়া গিয়াছে। এ বিষণ্ণতার অন্য কারণ ছিল।

কিছুক্ষণ পরে স্বামী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিন্তু বিনয় এটা ভালর জন্যই করেছে, বড় বৌ। ছ্যাখো, এ ক'দিন কি তুমি আমার কাছে এ সময়টা বস্‌তে পেতে? মায়ের জন্যে সে কেঁদে অস্থির করত, আর তোমরাও তাকে নিয়ে—"

স্ত্রী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে প্রথম ক'দিন, বৌমা মারা যাবার দু-চার দিন পর পর্য্যন্ত। এদানি তো আর সে কাঁদত না। আমাকেই ঘুমের ঘোরে মা মনে করে—"

বলিতে বলিতে গৃহিণীর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। কর্ত্তা তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই যেন বলিলেন, "হ্যাঁ, তা তোমায় সেই মাওড়া ছেলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখেই, বিনয় খোকাকে তার শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েচে, বুঝেচ? তুমি তো কখনো এ-সব হাঙ্গামা সওনি, ওতে তোমার কষ্ট হচ্ছে ভেবেই—"

গৃহিণী এবার একটু উচ্চ কণ্ঠে বেগের সহিতই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আর তোমার আদরের ভাগ্‌নের ভাবটি 'ভাল-ভাল' বলে আমার কাছে শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌তে যেয়ো না। তাকে কি আমার এত দিনেও চিন্‌তে বাকি? তুমি থাক্‌তেই আমার সঙ্গে চিরকাল যা করে চলেছে—এর পর সে যখন সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে বসবে, তখন যে আমায় কি হাড়ির হাল্ করবে তা আমি বুঝতেই পারচি! কেবল তুমিই তা কখনো বুঝলে না।"

কর্ত্তা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে ঈষৎ ক্ষুণ্নস্বরে বলিলেন, "কিন্তু বিনয় তো কখনো তোমায় অমান্য করে না। মুখ তুলে উঁচু করে কথাটি পর্য্যন্ত কয় না।"

গৃহিণী যেন খেদের সহিত বলিলেন, "ঐ তো, ওতেই তুমি ভাবো, ভাগ্‌নের আমার ওপর খুব ভক্তি, না? ওর চেয়ে মুখ তুলে যদি কখনো দুটো কোঁদল-কচকচি করত, সেও ছিল ভাল! তা কি মায়ে-বেটাতেও হয় না? আর এই যে ধরি মাছ না ছুঁই পানি ভাব, আমার সঙ্গে তার যেন কোন সুবাদই নেই, এ কি ভেবেছ খুব ভাল লক্ষণ?" এ প্রশ্নে স্বামীর কোন উত্তর না পাইয়া আবার তিনি আরম্ভ করিলেন, "এই যে ছেলেটাকে নিয়ে কত ক'রে তার মাকে ভুলালুম, নিয়ে দুদিন একটু নাড়তে-চাড়তে চাইলাম, তা তোমার বিনয়ের প্রাণে সইলো কি? অমনি এখান থেকে নিজের শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। যদি আমার ওপর একটুও টান্ থাকৃত, তাহ'লে কি সে এ কাজ করতে পারত? ককৃখনো না।"

কর্ত্তা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে মৃদুস্বরে আবার বলিলেন, "খোকাটা শান্ত আর কৈ হয়েছিল? কালও তো মা-মা ক'রে রাত্রে খুব কেঁদেছিল।"

গৃহিণী এবার আরও একটু অধীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, কেঁদেছিল না হয় মান্‌লাম ; কিন্তু তার দিদিমার কাছে গিয়েই সে চুপ কর্‌বে ভেবেছ তোমরা ? তাকেই কি সে চেনে ? সেই তো ছ' মাসের ছেলে সেখান থেকে আসে, আর এখন তিন বছর পেরিয়েছে, দিদিমাকে সে কটা দিন দেখেছে বা তার কাছে থেকেছে ?"

"না, না—মাঝে মাঝে দেখেছে বৈ কি ! আর কি জান, হাজার হলেও নাড়ির টান্—কি বলে গিয়ে—রক্তর সম্বন্ধ যাকে বলে, সেটা—"

"ওগো বুঝেচি গো বুঝেচি। আমার সঙ্গে তো তাদের কোন রক্তর সম্বন্ধ নেই, তাই তোমরা আমার কাছে তার থাকা পছন্দ করতে পার্‌লে না ! বেশ তো, তাতে আর এমন হয়েছে কি ! আমারই বা কেন এত ঝকি—ভাগ্‌নের ছেলে বই তো নয়। তাকে মানুষ করে কি আমি চতুর্ভুজ হব ! ভাগ্‌নেই কোন্‌দিন সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, তা আমি আবার তার ছেলে নিয়ে আত্তি করতে গেছি ! যেমন আমার কপাল !"

বলিতে বলিতে ক্রন্দন-রুদ্ধ স্বরে গৃহিণী পাখা রাখিয়া উঠিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে থাকিয়া শেষে চেষ্টার দ্বারা ঈষৎ কাশিয়া খানিক নড়িয়া-চড়িয়া দুই-একটা উঃ আঃ শব্দ করিলেন। তাঁহার অভীষ্ট তখনি সিদ্ধ হইল। স্ত্রী আবার ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "রতনকে কি ডেকে দেব ?"

"রতনকে ! হ্যাঁ, তা না হয় তুমিই বসো,—এই একটু পিপাসা পেয়েছে আর কি।" স্ত্রী সোরাই হইতে গ্লাশে জল ঢালিয়া স্বামীর মুখের নিকট ধরিলেন এবং তাঁহার পান শেষ হইলে গ্লাশ রাখিয়া আবার নিঃশব্দে যথাস্থান অধিকার করিয়া পাখা হাতে লইলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, "তাহলে তোমার ইচ্ছেটা কি, বড় বৌ ?"

"ইচ্ছে! আমার আবার কিসের ইচ্ছে!"

"ছাখো, আমার মনের কথা তো চিরদিনই তুমি জান, কিন্তু তোমার মনের কথা বল। আমার তা স্পষ্ট ক'রে জানার দরকার হচ্ছে দেখ্‌চি। তুমি কি চাও না যে বিনয়কে আমি জীবিতমানে যেমনভাবে চিরদিন রেখে এসেছি—অবর্ত্তমানে তা আর রাখি?"

"সে আবার কি কথা! আমি তোমার ভাগ্‌নেকে তাড়িয়ে দিতে বল্‌ছি না কি?"

"তাড়াবার কথা নয়,—অর্থাৎ তুমি কি সত্যিই চাও না যে তুমি-আমি অবর্ত্তমানে বিনয়ই আমাদের উত্তরাধিকারী হয়?"

"আমি তা না চাইলেই কি তুমি আমায় তা দেবে? তোমার ভাগ্‌নে,—তুমি কি তাকে—"

"বড় বৌ, বিনয়কে তাহলে তুমি আমাদের বিষয় থেকে বঞ্চিত কর্‌তেই চাও?"

"আমি একবারও সে কথা বলিনি! বল, কখনো আমি তোমায় এ কথা বলেছি? যখন চৌধুরীদের সেই নাদুস-নুদুস ছেলেটি আমায় দিতে চাইলে—আমি কি তখন তোমায় তা বল্‌তে পেরেছি যে, তোমার ন্যায্য অধিকারীকে বঞ্চিত করে তাকে আমায় নিতে দাও? এখনো ইচ্ছা কর্‌লে এই আমাদের খোকার মতন কত ছেলে পাওয়া যায়—তাদের বাপ-মায়ে ছেলে এত বড় বিষয়ের মালিক হবে জেনে আগ্রহ করেই দিতে চায়—তা আমি কি—"

"না, তা করনি বটে—কিন্তু আজ আমি ভাব্‌চি বড় বৌ—"

"তবে এটুকুও জেনো—বিনয় কখনো আমাকে মায়ের মতন দেখ্‌তে পারেনি,—আর কখনো তা পার্‌বেও না! তাই কি কেউ কখনো পারে! অত-বড় ছেলে—নিজের মায়ের কোলে বড় হয়েছে—সে অমনি পরকে

মা মনে করলেই হলো! তবে যদি ঐ খোকাকে আমি কোলে-পিঠে ক'রে নিয়ে মানুষ করতে পেতাম—ওকে যদি নিতে দিত আমায়—তবেই ঠিক্ মা-ছেলের মতন সম্বন্ধ হতো। তুমি অবর্ত্তমানে আমায় সেই ভাগ্‌নের তাঁবেদারীতে মামী থাকতে হবে—বিশেষ তোমার বিনয় যে চক্ষে আমায় ছাখে! কি যে আছে আমার অদৃষ্টে!"

বলিতে বলিতে গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন। যে সব ভবিষ্যৎ চিন্তার আভাস মাত্রেও তরুণেরা অধীর হইয়া সেদিক হইতে মনকে অন্যত্র ফিরাইয়া লয়—প্রৌঢ় দম্পতি অম্লান মুখেই সেই সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

কর্ত্তা খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া খেদের সহিত বলিলেন, "জানি, তোমার সেই নিজের ছেলের মত একটি ছেলে পাবার ইচ্ছেটা এতদিনেও মিলোয় নি। কিন্তু বিনয়ের কথাটাও মনে করো! সে আমার ভাগ্‌নে—চিরকাল তাকে ছেলের মত ক'রে আস্‌ছি—"

"কিন্তু তা বলে সে কখনো ছেলের মতন হ্যাওটো হয়নি। পনের ষোল বছরের ছেলে এসে কি তা হয় কখনো?"

"শোনো। তার পরে সেও অনেকদিন জেনেছে যে মামা-মামী অবর্ত্তমানে আমিই এ সম্পত্তির মালিক। ভাল ক'রে তাই তখন লেখাপড়াও করলে না—এখন তো বিষম বাবু হয়ে উঠেছে। আমি যা না ক'রে উঠ্‌তে পারি—বিনে ততখানি নবাবী চাল চালে। গান-বাজনা আর বেহালা নিয়েই তো দিন-রাত কাটাচ্চে।"

"যাহোক্, তোমার যে এটুকুও নজরে পড়েছে, এ দেখেও বাঁচ্‌লাম—"

"কিন্তু বুঝে ছাখো বড় বৌ, আমিই তার আখের এই রকম ক'রে নষ্ট করেছি। এখন সেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ধাড়ি ছেলেকে যদি 'যা

পারিস্ নিজে ক'রে খা গিয়ে' বলে তাড়িয়ে দিয়ে একটা পুষ্যিপুত্ত'র নিই, তাহলে ধর্ম্মে কি বলে ?"

গৃহিণী একটু ভাবিবার ভান করিয়া বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু আর এক কাজ কর্‌লেও তো হয় !"

"কি কাজ ?"

"কেন, তার ছেলে খোকাকে যদি আমায় পুষ্যিপুত্তুর নিইয়ে দাও—"

"খোকাকে ? তার মাণিককে ? বড় বৌ, তুমি ক্ষেপেছ ! সে যাকে তোমার কাছ থেকে সরাবার জন্যে—কি যে বলে ভাল—সে তা কখনই দেবে না বড় বৌ, এ নিশ্চয় জেনো।"

"কথা চাপা দিচ্ছ কেন ! সে যে আমার কাছ থেকে ছেলে সরাবার জন্যেই শাশুড়ীর কাছে দিয়ে এসেছে, তা কি আমিই জানিনে ? আমি রাক্ষুসী—আমি ডাইনি—আমি তার ছেলেকে মেরে ফেল্‌তাম, তাই সে নিজে যাকে একদণ্ড চোখের আড় কর্‌তে পার্‌ত না, তাকে বাড়ী-ছাড়া করেছে।"

"আহা-হা, কি যে বল,—তা নয়—"

"কিন্তু সে যাই হোক্, এইটে তোমায় বুঝতে হবে যে, এরই হাতে তুমি অবর্ত্তমানে আমাকে পড়্‌তে হবে। যার ছেলের দিকে চাইলে কি তাকে কোলে নিলে ছেলের মন্দ হবে বলে তার বিশ্বাস, সেই ভাগ্‌নেই আমার—"

"ওগো না গো, তা নয়। আমিও যে দেখেছি বড় বৌ, তুমি মাণকেকে নিয়ে এমনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে যে আমার দিকেও মন দেবার তোমার সময় কুলুতো না। ডেকে ডেকে তোমায় আমি পেতাম না। জানো, পরের ছেলেকে নিয়ে অত পাগল হতে নেই, তাতে কেবল কষ্টই ভোগ হয় মাত্র।"

"তা আমার ঘটতে কি আর বাকি আছে দেখচ? কিন্তু তুমি যে আমায় ঐ ভাগ্‌নের হাতে ফেলে দেবে, সে আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পারব না, জেনো। যদি অন্য কোন বিহিত না কর, দেখো, আমি কাশী গিয়ে ভিক্ষা করে খাব, তবু—"

"আঃ, কি যে পাগলের মত বকো বড় বৌ, তুমি বর্ত্তমানে বিনে কে! আমাদের অভাবে তবে তো সে বিষয় পাবে!"

"এই যদি তোমার শেষ মত হয় তাহলে আর কথার দরকার নেই, যা আমার অদৃষ্টে আছে হবে। তোমায় আর আমায় কিছু বল্‌বার নেই।"

"উঠো না, বসো। জানো তুমি যে তোমায় অসুখী আমি কিছুতেই করতে পারব না, তেমনি তুমিও আমার ধর্ম্ম রেখে আমার কর্ত্তব্য আমায় বল, বড় বৌ!"

"ঐ ছেলেকেই আমায় পুষ্যি-পুত্তুর নিতে দাও। দেখি, বিনয় কি ক'রে তাকে তখন আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়।"

"এতে তো কারও জোর চল্‌বে না বড় বৌ। যদি সে ছেলে না দেয়?"

"অন্য পুষ্যি-পুত্তুর নেবার ভয় দেখালে তখন জব্দ হয়ে আপনিই সোজা হতে হবে।"

"তাও যদি না হয়?"

"সে তখন আমি বুঝ্‌ব, তুমি পুষ্যি-পুত্তুরের অনুমতি দাও তো!"

স্বামী গম্ভীর মুখে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন, "কিন্তু আমায় ছুঁয়ে একটা দিব্যি তোমায় করতে হবে। যদি বিনে কিছুতেই ছেলে না দেয়, তখন তুমিও অন্য পুষ্যিপুত্তুর কিছুতেই নিতে পাবে না। এ দিব্যি না করলে আমি পোষ্যপুত্রের অনুমতি কিছুতেই দেব না তোমায়।"

গৃহিণী দুই হাতে স্বামীর পদ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন।

কর্ত্তা আবার বলিলেন, "তোমার ওপর আমার এটুকু নির্ভর আছে যে আমার আসল ইচ্ছাটাকে তুমি একেবারে অগ্রাহ্য করবে না। বিনয়ই আমার উত্তরাধিকারী, তবে তার ছেলেকে দেওয়াও যা, তাকে দেওয়াও তাই, তাই তোমায় সুখী করবার জন্যে এটুকুতে আমার রাজী হতে হলো। আমি উইল ক'রে লিখে রেখে যাব যে, তোমার পুষ্যিপুত্তুরের অনুমতি রইল, কিন্তু তুমিও মনে রেখো আমার কথা।"

"সে কি, উইলে লিখে রেখে যাওয়া কি! তুমি একটু ভাল হয়ে আমায় ছেলে নিইয়ে দেবে না?"

"ভাল হওয়া বড় বৌ, এ মিছে আশাটা কি কখনো কর?—যাক্, তুমি এর পরে—"

"না, সে হবে না। তুমি আমায় ছেলে নিইয়ে দেবে—তা নইলে—"

"সেটুকু আমি পারব না, জেনো। এই শেষ-সময়ে এখন যে ছেলেটী নিয়ে টানা-হিঁচ্ড়া করে বিনেকে যন্ত্রণা দেওয়া, তা আমার দ্বারা হবে না। আমি আগে যাই, তারপরে তুমি যা পার, করো।

"তবে আমার ছেলের কাজ নেই। তোমায় উইলও কর্‌তে হবে না, —আমার কিছুরই দরকার নেই।"

"ছেলে-মানুষি করো না। এখন কিছুদিন দরকার বোধ না কর্‌লেও পরে আবার একদিন হয়ত দরকার বোধ কর্‌বে! আর বিনে যাতে তোমার অধীন হয়ে থাকে, ভবিষ্যৎ ভেবে সেটুকুও আমার ক'রে যাওয়া উচিত বই কি। এই পুষ্যিপুত্তুরের অনুমতি লিখে দিয়ে গেলেই সে তোমার হাত-ধরা হয়ে থাক্‌বে, কিন্তু তুমিও আমার ধর্ম্ম রেখো।"

"কেন বারে বারে বল্‌ছ অমন ক'রে! থাক্, তোমায় কিছু লিখতে হবে না। পুষ্যিপুত্তুর, উইল, এ-সবে আমার দরকার নেই গো। যা

ভগবান করবেন, তাই হবে এর পরে, এখন ও-সব কথা থাক্, ছুটো অন্য কথা কও।"

"তা কইছি। এর জন্যে আমাদের নতুন ক'রে বেশী কিছু তো ভাবতে হচ্চে না। যা ভাববার তাতো এই এক বৎসরে আমরা ভেবেও রেখেছি। তোমার এতদিনে প্রস্তুত হয়ে ওঠা উচিত ছিল বড় বৌ, আমরা তো আর ছেলেমানুষটী নই। দু-জনেরই মাথার আর কগাছি চুল কালো আছে? এখন দু চার বছর আগে আর পরে এই তো কথা! যাক্, তাহলে ঐ পরামর্শ ভাল, বিনেও তাহলে তোমার বশে থাকবে। আর নিতান্তই যদি তুমি শেষে তার ছেলেকে নাও—তাতেও বিনের কিছু ক্ষতি হবে না!"

"ছেড়ে দাও না ও-সব ভাবনা গো—"

"এই যে! রত্নাকে ডাকাও—কি খেতে দেবে, দাও—এইবার ঘুমুতে হবে।

২

আবার বৎসর ঘুরিতে চলিল। বহু যত্ন বহু চিকিৎসাতেও যখন জমিদার আরোগ্য হইলেন না, তখন সকলেই বুঝিল, কালের আহ্বান ইহাকে নিষ্ফল করা মানুষের চেষ্টার অতীত ব্যাপার।

নন্দকিশোর রায় এই এক বৎসর রোগ-শয্যায় শুইয়া ভাগিনেয় ও পত্নীর পরস্পরের প্রতি মনোভাব লক্ষ্য করিয়া শেষে অপুত্রা পত্নীর ইচ্ছামত ব্যবস্থা করাই উচিত মনে করিলেন। বিনয়ের মনুষ্যোচিত গুণের অভাব নাই, তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে পুত্রের অভাবই সে নিবারণ করিতেছে বটে কিন্তু তবু যেন মাতুলানীর প্রতি তাহার মনের ধারণা তেমন কোমল নয়

মাতুলানীও যে তাহার প্রতি স্নেহশীলা নন, তাহা জমিদার পূর্ব্বাবধিই জানিতেন, কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে বিনয়কে তাঁহার স্ত্রীর আর একটু অধীনে রাখিয়া গেলেই যেন তাঁহার পত্নীর পক্ষে ভাল হয়, এইরূপ ধারণা ক্রমশঃই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রী তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া যে শপথ করিয়াছেন, তাহার যে তিনি ব্যতিক্রম করিবেন না, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে বিশেষভাবেই ছিল। তাহা হইলে এ দত্তক-গ্রহণে বিনয়ের ক্ষতি কিছুই নাই, তাহার উপযুক্ত মাসহারার বন্দোবস্তও না হয় তিনি করিয়া যাইবেন। বাকি, বিনয় যেমন আছে তেমনি বরং সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া থাকিবে। ইহাতে মাত্র স্ত্রীর অনেকখানি সন্তোষ, তাঁহার চিরবুভুক্ষু অন্তরের কতকটা তৃপ্তি-সাধন এবং বিনয়কে তাঁহার বশ্যতাপন্ন করিয়া রাখা এই গুরু উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে। মাতুলানীও ভাগিনার উপর যেরূপ স্নেহহীনা, ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে অশান্তি কাটিয়া যাইবারো সম্ভাবনা। কিন্তু এই ব্যাপারে মাতুলানীর মনও অলক্ষ্যে বিনয়ের প্রতি একটু সমবেদনাশীল হইয়া পড়িবার কথা, কেননা যেমন করিয়াই হোক্ বিনয়কে কতকটা বঞ্চিত এবং আঘাত দেওয়া তো হইবেই। এক্ষেত্রে মাতুলানীর বক্র মনও তাহার প্রতি একটু কোমল হইবে এ সম্ভাবনাও রহিল।

এই এক বৎসর বিনয়ের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, রোগশয্যায় পড়িয়াও মাতুল পুনঃপুনঃ তাহাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, বিনয়ও পুনঃপুনঃ উচিত উত্তর দিয়াছে—আপনি আগে সারিয়া উঠুন, পরে সে কথা। কিন্তু এই এক বৎসরেও সে ছেলেটিকে একদিনও এ-বাড়ীতে আনে নাই। সেই যে স্ত্রীর মৃত্যুর দিন-কতক পরেই তাহাকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিয়াছে, তাহার পর আর একদিনও শিশু পুত্রকে মাতুলানীর নিকট আনিয়া দেয় নাই। মাতুলের শুশ্রূষা করিয়া দিনে বা রাত্রে যে কোন সুবিধা-মত সময়ে কিরূপে ছেলেকে দেখিতে গ্রামান্তরে ছোটে, তাহাও

কর্ত্তা জানিতেন। মাণিককে না দেখিয়া সে যে একদিন থাকিতে পারেনা তাহা সকলেই জানে, কিন্তু মাতুলানীর কাছে তাহাকে রাখিতেই বা বিনয়ের কিসের এত আপত্তি? বধূ মরিয়া যাওয়ার পর মাতুলানী যে তাহার শিশুকে খুবই ভাল বাসিতেছিলেন, তাহা বিনয় তো জানে, তবে বিনয়ের এ কি রকম আচরণ! মাত্র এই একটু অপরাধই তাহার বাকি সমস্ত স্বভাবের উপরে একটা সন্দেহের ছায়া আনিয়া দিতেছে। সে ঘোর বাবু,—গাড়ী নহিলে এক পা হাঁটে না, তাহার চাল্-চলন জমিদারের উপরও সময়ে সময়ে উঠিয়া থাকে, সাধারণ জমিদার-সন্তানের মতই অল্পদিনে সেও লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া আমোদে কাল কাটায়, তথাপি মাতুল একদিনও তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন্ নাই। জানিতেন, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। তাঁহাদের যৌবনও এইভাবে ব্যয়িত হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারীও যে সেই দৃষ্টান্ত ধরিবে, এ'ত একান্তই সাধারণ কথা। কিন্তু পুত্রসম্বন্ধে বিনয়ের এই বক্র ভাব, এইটাই মাতুলের সব চেয়ে খারাপ লাগিল। তাহার শ্বশুরালয়ও মোটেই সম্পন্ন ঘর নয়, স্বামিহীনা শ্বশ্রূঠাকুরাণী অতিকষ্টেই নিজের সন্তান-সন্ততিগুলিকে পালন করিয়া থাকেন। সেই অভাবের মধ্যে বিনয় নিজের সন্তানকে রাখিয়াছে, তবু এখানকার সর্ব্বপ্রকারের বাঞ্ছিত আদরের মধ্যেও তাহাকে রাখিতে চাহে না—এ যে বড়ই বিসদৃশ ব্যবহার! জমিদারও ইহাতে ক্রমে ঈষৎ অভিমান বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু গম্ভীর স্বভাব-প্রযুক্ত ভাগিনাকে একদিনও এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করিলেন না।

নিজের মেয়াদ ফুরাইতে আর বেশী দেরী নাই বুঝিয়া তিনি অতি-বিশ্বাসী দুই-তিনটি বন্ধুর সাক্ষাতে পত্নীকে দত্তক গ্রহণের স্বাক্ষরিত অনুমতি দিলেন এবং যতদিন না পত্নী ইচ্ছা করিবেন সেই ক্ষুদ্র উইলখানি ততদিন পর্য্যন্ত গোপন রাখিতেই পত্নী ও বন্ধুদের আদেশ দিলেন। বুঝি, তখনো তাঁহার মনে ক্ষীণ আশা ছিল, যদি ইতিমধ্যে উভয়ের মধ্যে একটা

সামঞ্জস্ত আসিয়া পড়ে, তাঁহার বিয়োগে যদিই পত্নীর এ বিষয়ে একটু উপেক্ষা আসিয়া বিনয়কে এ আঘাত হইতে রক্ষা করে!

সেইদিনই জমিদার আরও বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। বিনয় সমস্ত দিন অক্লান্তভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিল। মনে আশা ছিল, অন্ততঃ সন্ধ্যার পরেও মাতুল একটু ঘুমাইতে পারিলে সে টম্‌টম্ হাঁকাইয়া এক-ছুটে গিয়া মাণিককে একবার দেখিয়া আসিবে। এটুকু না হইলে রাত্রে যে সে ঘুমাইতেই পারিবে না। নহিলে এ সময়ে না হয় একদিন গ্রামান্তরে নাই ছুটিত! কিন্তু বিনয়ের যে তা একেবারেই সাধ্যাতীত। আর তাহার মনের ধারণা, তাহার মাণিকও বুঝি দিনান্তে একবার অন্ততঃ তাহাকে না দেখিলে অসুস্থতা বোধ করিবে, বুঝি সেও রাত্রে সুস্থ হইয়া ঘুমাইবে না! রাত্রে ঘুমের ঘোরে বুঝি কাঁদিবে! এক বৎসর সে মাতৃহীন হইয়াছে, এই এক বৎসর বিনয়ই যে সন্ধ্যার পর নিত্য তাহাকে ঘুম পাড়ায়।

কিন্তু সন্ধ্যা হইতে সহিস টম্‌টমে ঘোড়া জুতিয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তথাপি বিনয় বাহির হইতে পারিল না। মাতুল যে কিছুতেই সুস্থ হন না, ঘুম আসা তো দূরের কথা। এপাশ ওপাশ উঃ আঃ করিতে করিতে এক সময় বিনয়ের মুখের পানে চাহিয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ তোমার যে বেরুনো হচ্ছে না। আমি এখন একটু ভাল বোধ করছি—তুমি যেতে পার।"

বিনয় নত মস্তকে রহিল, উত্তর দিল না। সবই বুঝিল,—মাতুলের ইহা স্তোকবাক্য মাত্র! তিনি এখনো একটুও সুস্থতা বোধ করেন নাই! নিঃশব্দে সে তাঁহার মাথায় বাতাস দিতে লাগিল। স্ত্রী পায়ের তলায় বসিয়া মাঝে মাঝে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, তাঁহার পানে চাহিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "তুমি এসে বাতাস কর, বিনয়কে ছেড়ে দাও।"

মাতুলানীর দিকে মাথা তুলিয়া চাহিয়া বিনয় বলিল, "থাক, আজ আর যাব না।"

"তাও কি হয়? যাও।"

রাজেশ্বরী উঠিয়া আসিয়া বিনয়ের হাত হইতে পাখা লইলেন। বিনয় অগত্যা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাতুল আবার বলিলেন, "দেরী করছ কেন—রাত হয়ে যাচ্ছে যে। ফিরতে বেশী রাত হলে আবার ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।"

বিনয় ধীরে ধীরে মাতুলানীর অধিকৃত স্থানে উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়ত।"

পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঈষৎ তীব্রস্বরে মাতুল বলিলেন, "তুমি তো ঘুমোওনি,—যাও।"

এ কি অভিমান? মাতুল তো কখনো এই আজিকার মত এমন ভাবের কথা বলেন নাই! অভিমান-বিদ্ধ স্বর বিনয়কে যেন চমকিত করিয়া তুলিল! এই পিতৃসম স্নেহশীল ব্যক্তিকে বুঝি সে আঘাতই দিয়াছে! তাহার এই দুর্ব্বলতাকে তিনি বুঝি ক্ষমা করিতে পারেন নাই। বিনয় উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সহসা মাতুলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই যেন শোনাইয়া বিনয় বলিল, "আমি খোকাকে আন্‌তে যাচ্ছি।"

মাতুল পাশ ফিরিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিলেন। মাতুলানী ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! কেন?"

উত্তর না দিয়া বিনয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায়,—মাতুলানীর স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "না, না, এখন আর তাকে আন্‌তে হবে না,—এখন আর কেন!"

বিনয় বাধা মানিল না, নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

*　　　*　　　*

গভীর রাত্রে চোরের মত নিঃশব্দে পা টিপিয়া বিনয় যখন মাতুলের কক্ষে প্রবেশ করিল, মাতুল তখন ঈষৎ সুস্থ বোধ করিয়াই ঘুমাইতেছেন অথবা নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া আছেন মাত্র, তাহা বিনয় বুঝিতে পারিল না। কেবল মাতুলানী বিনিদ্র-ভাবে তাঁহার নিকটে বসিয়া আছেন, দেখিল। বিনয় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দেই বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি চোখ তুলিতেই ভাগিনার সঙ্গে চোখো-চোখি হইয়া গেল। বিনয় মৃদুস্বরে বলিল, "আনতে পারলাম না, তার জ্বর হয়েছে। এই ঠাণ্ডায়—"

"ভালই করেছ। এ সময়ে কে তাকে এখন দেখ্‌বে ?"

শেষ রাত্রি হইতেই জমিদারের অসুস্থতা অত্যন্ত বাড়িল এবং প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থা খারাপ হইতে আরম্ভ করিল। সেদিন রাত্রিটা সেইভাবে কাটাইয়া পর দিন প্রাতঃকালে নন্দকিশোর বাবু প্রাণত্যাগ করিলেন। ভাগ্যের বিরূপতায় বিনয় আর নিজের ক্রটিটুকু সংশোধন করিবার অবসরই পাইল না।

৩

কয়েকদিন মাত্র স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, তখনো শ্রাদ্ধ শান্তি চোকে নাই। স্বামীর বিপুল নামের উপযুক্ত ভাবে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য, সদ্য বিধবা রাজেশ্বরী দেবী তাঁহার শোক-শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভাগিনা বর্ত্তমান থাকিলেও অপুত্র পত্নী তিনিই যে স্বামীর মুখাগ্নি হইতে সমস্ত কার্য্যের অধিকারী। কাজেই অবস্থা-গতিকে তাঁহার এ প্রৌঢ় বয়সের শোককে প্রথম হইতেই

তাঁহাকে যথাসাধ্য সম্বরণ করিতে হইয়াছিল। আর এই দুই বৎসর যে তাঁহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, ইহাও সত্য।

দাসীর মধ্যস্থতায় কর্ম্মচারীর সহিত সকল দিকের নানা বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া রাজেশ্বরী দেবী ক্লান্তভাবে বসিয়াছেন, এমন সময় সহসা চমকিত হইয়া দেখিলেন, পঞ্চম বর্ষীয় শিশু পুত্রের হাত ধরিয়া বিনয় তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

খানিকক্ষণ কেহই কথা কহিলেন না। রাজেশ্বরী বুঝিতে ছিলেন, কি উদ্দেশ্যে আজ বিনয়ের এ সন্ধি স্থাপন। আজ মাণিককে তাঁহার হাতে দিতে আসে নাই, যাঁহার জন্য সে দিন রাত্রিতে ছুটিয়া গিয়াও বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, আজ স্বর্গগত সেই তাঁহারই প্রীত্যর্থে পুত্রকে মাতুলানীর নিকট আনিয়া দিতেছে। কিন্তু কেন আর?

কিছুক্ষণ পরে অপ্রসন্ন স্বরে তিনি বলিলেন, "এখন কেন আন্‌লে? কে ওকে এখন দেখ্‌বে? আর দুদিন পরে তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে নয় একেবারেই আসতো। তিনি কাজে আসতে পারবেন তো?"

"আসবেন বৈ কি। মাণিককে আগেই আন্‌লাম।"

"কেন আন্‌লে বাছা? কার কাছে ও থাকবে? তুমি সাম্‌লাতে পারবে ত?"

বিনয় উত্তর না দিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া তখন বেগের সহিত আবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যাঁর জন্যে এনেচ,তিনি তো আর দেখতে আসছেন না! আমার আর কেন বাছা! আমি আর তোমার ছেলে নিয়ে কি করব,—কিছুতেই আর আমার কাজ নেই। সব দরকারই এখন আমার ফুরিয়ে গেছে। দিয়ে এসো ওকে তোমার শাশুড়ীর কাছে, তাঁর সঙ্গে একেবারেই তখন আসবে।"

দ্বিগুণ আঘাত পাইয়া ম্লান মুখে বিনয় সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তার মনে বিশ্বাস ছিল, মাতুলানী মুখে যতই যা বলুন, নিকটে ফেলিয়া দিয়া গেলে নারী-স্বভাব-বশে শিশুকে তিনি দেখিতে বাধ্য হইবেনই। হইলও তাই।

পিতাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মাণিক চঞ্চল হইয়া ওঠায় রাজেশ্বরী একজন দাসীকে আহ্বান করিয়া তাহাকে লইতে বলিলেন এবং একটু পরেই কিছু খেলনা ও খাবার লইয়া আবার তাহার নিকটস্থ হইলেন।

শোকের প্রাবল্যের মুখে তিনি ভাবিয়াছিলেন, আর তাঁহার কিছুতেই কাজ নাই, কিন্তু কয়েকদিন পরেই নিজের সে ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন, না, সমস্ততেই এখনো তাঁহার দরকার আছে। এমন কি বুঝি পূর্ব্বের অপেক্ষা আরো বেশী করিয়াই তাহার প্রয়োজন পড়িতেছে! এতদিন নিজের অধিকারটা তো এমন জাহির হইবার দরকার ছিল না। তাঁহারই যে সব, এ তো আর কাহাকেও কাণে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইতে হইত না! আজ যে অধিকার ভগবানের বিধানে কোথায় যেন খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে—তাই তাহার বন্ধন তাহার মোহও যেন বেশী করিয়া আঁটিয়া বসিতেছে। সর্ব্ব বিষয়ে স্বত্ব-সাব্যস্তের জন্য অন্তরে-বাহিরে একটা যেন বিদ্রোহ বাধিয়া উঠিতেছে।

উপযুক্ত সমারোহে নন্দকিশোর রায়ের শ্রদ্ধা চুকিয়া গেল। কেহ ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিল, কেহ বা নাক সিঁটকাইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, তাঁর উপযুক্ত কি এই কাজ? ছেলে নাই, পিলে নাই, দান-সাগর করা উচিত ছিল। কেহ বা উত্তর দিল, "ছেলে নাই কি গো—ভাগ্নে রয়েছে, গিন্নি কি এখনি সব উড়িয়ে দেবে! ভাগ্নে—ভাগ্নের ছেলে! ভগবান দিলে ওতেই একটা সংসার হতে পারে। কর্ত্তা তো চিরদিনই সবগুলিকে মানুষ ক'রে আস্‌ছেন, এখন ওরা ছাড়া

রুগ্ন স্বামী শয্যায় শুইয়া ছিলেন, স্ত্রী কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছেন। উভয়েই সংসারের নিকট বহুদিনের বহু অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন, কেন না উভয়েই চুল পাকাইয়া প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহাতে আবার স্বামী নন্দকিশোর রায় একজন বড় দরের জমিদার। তাঁহার সন্তান-হীনা পত্নী রাজেশ্বরী দেবীও স্বামীর সর্ব্ব-বিষয়ে একমাত্র অধীশ্বরী। তাঁহাদের পরস্পরের স্নেহ বা কোন বিষয়ের মধ্যেই অন্য-কোন ভাগীদার নাই।

উভয়ের মুখ কিন্তু অতি বিষণ্ন। কর্ত্তার ব্যারামের জন্য নূতন করিয়া আজ এ অশান্তি জাগে নাই। জমিদার আজ বৎসরাবধি কাল এইরূপে শয্যাগত আছেন; সুতরাং সেটা উভয় পক্ষেরই যেন গা-সহা হইয়া গিয়াছে। এ বিষণ্নতার অন্য কারণ ছিল।

কিছুক্ষণ পরে স্বামী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিন্তু বিনয় এটা ভালর জন্যই করেছে, বড় বৌ। দ্যাখো, এ ক'দিন কি তুমি আমার কাছে এ সময়টা বস্‌তে পেতে? মায়ের জন্যে সে কেঁদে অস্থির করত, আর তোমরাও তাকে নিয়ে—"

স্ত্রী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে প্রথম ক'দিন, বৌমা মারা যাবার দু-চার দিন পর পর্য্যন্ত। এদানি তো আর সে কাঁদত না। আমাকেই ঘুমের ঘোরে মা মনে করে—"

বলিতে বলিতে গৃহিণীর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। কর্ত্তা তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই যেন বলিলেন, "হ্যাঁ, তা তোমায় সেই মাওড়া ছেলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখেই, বিনয় খোকাকে তার শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েচে, বুঝেচ? তুমি তো কখনো এ-সব হাঙ্গামা সওনি, ওতে তোমার কষ্ট হচ্ছে ভেবেই—"

গৃহিণী এবার একটু উচ্চ কণ্ঠে বেগের সহিতই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আর তোমার আদরের ভাগ্‌নের ভাবটি 'ভাল-ভাল' বলে আমার কাছে শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌তে যেয়ো না। তাকে কি আমার এত দিনেও চিন্‌তে বাকি? তুমি থাক্‌তেই আমার সঙ্গে চিরকাল যা করে চলেছে—এর পর সে যখন সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে বসবে, তখন যে আমায় কি হাড়ির হাল্‌ করবে তা আমি বুঝতেই পারচি! কেবল তুমিই তা কখনো বুঝলে না।"

কর্ত্তা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে ঈষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "কিন্তু বিনয় তো কখনো তোমায় অমান্য করে না। মুখ তুলে উঁচু করে কথাটি পর্য্যন্ত কয় না।"

গৃহিণী যেন খেদের সহিত বলিলেন, "ঐ তো, ওতেই তুমি ভাবো, ভাগ্‌নের আমার ওপর খুব ভক্তি, না? ওর চেয়ে মুখ তুলে যদি কখনো দুটো কোঁদল-কচকচি করত, সেও ছিল ভাল! তা কি মায়ে-বেটাতেও হয় না? আর এই যে ধরি মাছ না ছুঁই পানি ভাব, আমার সঙ্গে তার যেন কোন সুবাদই নেই, এ কি ভেবেছ খুব ভাল লক্ষণ?" এ প্রশ্নে স্বামীর কোন উত্তর না পাইয়া আবার তিনি আরম্ভ করিলেন, "এই যে ছেলেটাকে নিয়ে কত ক'রে তার মাকে ভুলালুম, নিয়ে দুদিন একটু নাড়তে-চাড়তে চাইলাম, তা তোমার বিনয়ের প্রাণে সইলো কি? অমনি এখান থেকে নিজের শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। যদি আমার ওপর একটুও টান্‌ থাকৃত, তাহ'লে কি সে এ কাজ করতে পারত? ককৃখনো না।"

কর্ত্তা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে মৃদুস্বরে আবার বলিলেন, "খোকাটা শান্ত আর কৈ হয়েছিল? কালও তো মা-মা ক'রে রাত্রে খুব কেঁদেছিল।"

গৃহিণী এবার আরও একটু অধীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, কেঁদেছিল না হয় মান্‌লাম ; কিন্তু তার দিদিমার কাছে গিয়েই সে চুপ কর্‌বে ভেবেছ তোমরা ? তাকেই কি সে চেনে ? সেই তো ছ' মাসের ছেলে সেখান থেকে আসে, আর এখন তিন বছর পেরিয়েছে, দিদিমাকে সে কটা দিন দেখেছে বা তার কাছে থেকেছে ?"

"না, না—মাঝে মাঝে দেখেছে বৈ কি ! আর কি জান, হাজার হলেও নাড়ির টান্—কি বলে গিয়ে—রক্তর সম্বন্ধ যাকে বলে, সেটা—"

"ওগো বুঝেচি গো বুঝেচি। আমার সঙ্গে তো তাদের কোন রক্তর সম্বন্ধ নেই, তাই তোমরা আমার কাছে তার থাকা পছন্দ করতে পার্‌লে না ! বেশ তো, তাতে আর এমন হয়েছে কি ! আমারই বা কেন এত ঝক্কি—ভাগ্‌নের ছেলে বই তো নয়। তাকে মানুষ করে কি আমি চতুর্ভুজ হব ! ভাগ্‌নেই কোন্‌দিন সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, তা আমি আবার তার ছেলে নিয়ে আত্তি করতে গেছি ! যেমন আমার কপাল !"

বলিতে বলিতে ক্রন্দন-রুদ্ধ স্বরে গৃহিণী পাখা রাখিয়া উঠিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে থাকিয়া শেষে চেষ্টার দ্বারা ঈষৎ কাশিয়া খানিক নড়িয়া-চড়িয়া দুই-একটা উঃ আঃ শব্দ করিলেন। তাঁহার অভীষ্ট তখনি সিদ্ধ হইল। স্ত্রী আবার ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "রতনকে কি ডেকে দেব ?"

"রতনকে ! হ্যাঁ, তা না হয় তুমিই বসো,—এই একটু পিপাসা পেয়েছে আর কি।" স্ত্রী সোরাই হইতে গ্লাশে জল ঢালিয়া স্বামীর মুখের নিকট ধরিলেন এবং তাঁহার পান শেষ হইলে গ্লাশ রাখিয়া আবার নিঃশব্দে যথাস্থান অধিকার করিয়া পাখা হাতে লইলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, "তাহলে তোমার ইচ্ছেটা কি, বড় বৌ ?"

"ইচ্ছে! আমার আবার কিসের ইচ্ছে!"

"ছাখো, আমার মনের কথা তো চিরদিনই তুমি জান, কিন্তু তোমার মনের কথা বল। আমার তা স্পষ্ট ক'রে জানার দরকার হচ্ছে দেখ্‌চি। তুমি কি চাও না যে বিনয়কে আমি জীবিতমানে যেমনভাবে চিরদিন রেখে এসেছি—অবর্ত্তমানে তা আর রাখি?"

"সে আবার কি কথা! আমি তোমার ভাগ্‌নেকে তাড়িয়ে দিতে বল্‌ছি না কি?"

"তাড়াবার কথা নয়,—অর্থাৎ তুমি কি সত্যিই চাও না যে তুমি-আমি অবর্ত্তমানে বিনয়ই আমাদের উত্তরাধিকারী হয়?"

"আমি তা না চাইলেই কি তুমি আমায় তা দেবে? তোমার ভাগ্‌নে,—তুমি কি তাকে—"

"বড় বৌ, বিনয়কে তাহলে তুমি আমাদের বিষয় থেকে বঞ্চিত কর্‌তেই চাও?"

"আমি একবারও সে কথা বলিনি! বল, কখনো আমি তোমায় এ কথা বলেছি? যখন চৌধুরীদের সেই নাদুস-নুদুস ছেলেটি আমায় দিতে চাইলে—আমি কি তখন তোমায় তা বল্‌তে পেরেছি যে, তোমার ন্যায্য অধিকারীকে বঞ্চিত করে তাকে আমায় নিতে দাও? এখনো ইচ্ছা কর্‌লে এই আমাদের খোকার মতন কত ছেলে পাওয়া যায়—তাদের বাপ-মায়ে ছেলে এত বড় বিষয়ের মালিক হবে জেনে আগ্রহ করেই দিতে চায়—তা আমি কি—"

"না, তা করনি বটে—কিন্তু আজ আমি ভাব্‌চি বড় বৌ—"

"তবে এটুকুও জেনো—বিনয় কখনো আমাকে মায়ের মতন দেখ্‌তে পারেনি,—আর কখনো তা পার্‌বেও না! তাই কি কেউ কখনো পারে! অত-বড় ছেলে—নিজের মায়ের কোলে বড় হয়েছে—সে অমনি পরকে

মা মনে করলেই হলো! তবে যদি ঐ খোকাকে আমি কোলে-পিঠে ক'রে নিয়ে মানুষ করতে পেতাম—ওকে যদি নিতে দিত আমায়—তবেই ঠিক্ মা-ছেলের মতন সম্বন্ধ হতো। তুমি অবর্ত্তমানে আমায় সেই ভাগ্নের তাঁবেদারীতে মামী থাকতে হবে—বিশেষ তোমার বিনয় যে চক্ষে আমায় ছাখে! কি যে আছে আমার অদৃষ্টে!"

বলিতে বলিতে গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন। যে সব ভবিষ্যৎ চিন্তার আভাস মাত্রেও তরুণেরা অধীর হইয়া সেদিক হইতে মনকে অন্যত্র ফিরাইয়া লয়—প্রৌঢ় দম্পতি অম্লান মুখেই সেই সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

কর্ত্তা খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া খেদের সহিত বলিলেন, "জানি, তোমার সেই নিজের ছেলের মত একটি ছেলে পাবার ইচ্ছেটা এতদিনেও মিলোয় নি। কিন্তু বিনয়ের কথাটাও মনে করো! সে আমার ভাগ্নে—চিরকাল তাকে ছেলের মত ক'রে আস্ছি—"

"কিন্তু তা বলে সে কখনো ছেলের মতন হ্যাওটো হয়নি। পনের যোল বছরের ছেলে এসে কি তা হয় কখনো?"

"শোনো। তার পরে সেও অনেকদিন জেনেছে যে মামা-মামী অবর্ত্তমানে আমিই এ সম্পত্তির মালিক। ভাল ক'রে তাই তখন লেখাপড়াও করলে না—এখন তো বিষম বাবু হয়ে উঠেছে। আমি যা না ক'রে উঠ্তে পারি—বিনে ততখানি নবাবী চাল চালে। গান-বাজনা আর বেহালা নিয়েই তো দিন-রাত কাটাচ্ছে।"

"যাহোক্, তোমার যে এটুকুও নজরে পড়েছে, এ দেখেও বাঁচ্লাম—"

"কিন্তু বুঝে ছাখো বড় বৌ, আমিই তার আখের এই রকম ক'রে নষ্ট করেছি। এখন সেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ধাড়ি ছেলেকে যদি 'যা

পারিস্ নিজে ক'রে খা গিয়ে' বলে তাড়িয়ে দিয়ে একটা পুষ্যিপুত্ত'র নিই, তাহলে ধর্ম্মে কি বলে ?"

গৃহিণী একটু ভাবিবার ভান করিয়া বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু আর এক কাজ কর্‌লেও তো হয় !"

"কি কাজ ?"

"কেন, তার ছেলে খোকাকে যদি আমায় পুষ্যিপুত্তুর নিইয়ে দাও—"

"খোকাকে ? তার মাণিককে ? বড় বৌ, তুমি ক্ষেপেছ ! সে যাকে তোমার কাছ থেকে সরাবার জন্যে—কি যে বলে ভাল—সে তা কখনই দেবে না বড় বৌ, এ নিশ্চয় জেনো।"

"কথা চাপা দিচ্ছ কেন ! সে যে আমার কাছ থেকে ছেলে সরাবার জন্যেই শাশুড়ীর কাছে দিয়ে এসেছে, তা কি আমিই জানিনে ? আমি রাক্ষুসী—আমি ডাইনি—আমি তার ছেলেকে মেরে ফেল্‌তাম, তাই সে নিজে যাকে একদণ্ড চোখের আড় কর্‌তে পার্‌ত না, তাকে বাড়ী-ছাড়া করেছে।"

"আহা-হা, কি যে বল,—তা নয়—"

"কিন্তু সে যাই হোক্, এইটে তোমায় বুঝতে হবে যে, এরই হাতে তুমি অবর্ত্তমানে আমাকে পড়্‌তে হবে। যার ছেলের দিকে চাইলে কি তাকে কোলে নিলে ছেলের মন্দ হবে বলে তার বিশ্বাস, সেই ভাগ্‌ নেই আমার—"

"ওগো না গো, তা নয়। আমিও যে দেখেচি বড় বৌ, তুমি মাণকেকে নিয়ে এমনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে যে আমার দিকেও মন দেবার তোমার সময় কুলুতো না। ডেকে ডেকে তোমায় আমি পেতাম না। জানো, পরের ছেলেকে নিয়ে অত পাগল হতে নেই, তাতে কেবল কষ্টই ভোগ হয় মাত্র।"

"তা আমার ঘটতে কি আর বাকি আছে দেখচ? কিন্তু তুমি যে আমায় ঐ ভাগ্‌নের হাতে ফেলে দেবে, সে আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পারব না, জেনো। যদি অন্য কোন বিহিত না কর, দেখো, আমি কাশী গিয়ে ভিক্ষা করে খাব, তবু—"

"আঃ, কি যে পাগলের মত বকো বড় বৌ, তুমি বর্ত্তমানে বিনে কে! আমাদের অভাবে তবে তো সে বিষয় পাবে!"

"এই যদি তোমার শেষ মত হয় তাহলে আর কথার দরকার নেই, যা আমার অদৃষ্টে আছে হবে। তোমায় আর আমায় কিছু বল্‌বার নেই।"

"উঠো না, বসো। জানো তুমি যে তোমায় অসুখী আমি কিছুতেই করতে পারব না, তেমনি তুমিও আমার ধর্ম্ম রেখে আমার কর্ত্তব্য আমায় বল, বড় বৌ!"

"ঐ ছেলেকেই আমায় পুষ্যি-পুত্তুর নিতে দাও। দেখি, বিনয় কি ক'রে তাকে তখন আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়।"

"এতে তো কারও জোর চল্‌বে না বড় বৌ। যদি সে ছেলে না দেয়?"

"অন্য পুষ্যি-পুত্তুর নেবার ভয় দেখালে তখন জব্দ হয়ে আপনিই সোজা হতে হবে।"

"তাও যদি না হয়?"

"সে তখন আমি বুঝ্‌ব, তুমি পুষ্যি-পুত্তুরের অনুমতি দাও তো!"

স্বামী গম্ভীর মুখে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন, "কিন্তু আমায় ছুঁয়ে একটা দিব্যি তোমায় করতে হবে। যদি বিনে কিছুতেই ছেলে না দেয়, তখন তুমিও অন্য পুষ্যিপুত্তুর কিছুতেই নিতে পাবে না। এ দিব্যি না করলে আমি পোষ্যপুত্রের অনুমতি কিছুতেই দেব না তোমায়।"

গৃহিণী দুই হাতে স্বামীর পদ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন।

কর্ত্তা আবার বলিলেন, "তোমার ওপর আমার এটুকু নির্ভর আছে যে আমার আসল ইচ্ছাটাকে তুমি একেবারে অগ্রাহ্য করবে না। বিনয়ই আমার উত্তরাধিকারী, তবে তার ছেলেকে দেওয়াও যা, তাকে দেওয়াও তাই, তাই তোমায় সুখী করবার জন্যে এটুকুতে আমার রাজী হতে হলো। আমি উইল ক'রে লিখে রেখে যাব যে, তোমার পুষ্যিপুত্তুরের অনুমতি রইল, কিন্তু তুমিও মনে রেখো আমার কথা।"

"সে কি, উইলে লিখে রেখে যাওয়া কি! তুমি একটু ভাল হয়ে আমায় ছেলে নিইয়ে দেবে না?"

"ভাল হওয়া বড় বৌ, এ মিছে আশাটা কি কখনো কর?—যাক্, তুমি এর পরে—"

"না, সে হবে না। তুমি আমায় ছেলে নিইয়ে দেবে—তা নইলে—"

"সেটুকু আমি পারব না, জেনো। এই শেষ-সময়ে এখন যে ছেলেটী নিয়ে টানা-হিঁচড়া করে বিনেকে যন্ত্রণা দেওয়া, তা আমার দ্বারা হবে না। আমি আগে যাই, তারপরে তুমি যা পার, করো।

"তবে আমার ছেলের কাজ নেই। তোমায় উইলও করতে হবে না, —আমার কিছুরই দরকার নেই।"

"ছেলে-মানুষি করো না। এখন কিছুদিন দরকার বোধ না করলেও পরে আবার একদিন হয়ত দরকার বোধ করবে! আর বিনে যাতে তোমার অধীন হয়ে থাকে, ভবিষ্যৎ ভেবে সেটুকুও আমার ক'রে যাওয়া উচিত বই কি। এই পুষ্যিপুত্তুরের অনুমতি লিখে দিয়ে গেলেই সে তোমার হাত-ধরা হয়ে থাকবে, কিন্তু তুমিও আমার ধর্ম্ম রেখো।"

"কেন বারে বারে বলছ অমন ক'রে! থাক্, তোমায় কিছু লিখতে হবে না। পুষ্যিপুত্তুর, উইল, এ-সবে আমার দরকার নেই গো। যা

ভগবান করবেন, তাই হবে এর পরে, এখন ও-সব কথা থাক্, দুটো অন্য কথা কও।”

“তা কইছি। এর জন্যে আমাদের নতুন ক’রে বেশী কিছু তো ভাবতে হচ্চে না। যা ভাববার তাতো এই এক বৎসরে আমরা ভেবেও রেখেছি। তোমার এতদিনে প্রস্তুত হয়ে ওঠা উচিত ছিল বড় বৌ, আমরা তো আর ছেলেমানুষটী নই। দু-জনেরই মাথার আর কগাছি চুল কালো আছে? এখন দু চার বছর আগে আর পরে এই তো কথা! যাক্, তাহলে ঐ পরামর্শ ভাল, বিনেও তাহলে তোমার বশে থাক্‌বে। আর নিতান্তই যদি তুমি শেষে তার ছেলেকে নাও—তাতেও বিনের কিছু ক্ষতি হবে না!”

“ছেড়ে দাও না ও-সব ভাবনা গো—”

“এই যে! রত্‌নাকে ডাকাও—কি খেতে দেবে, দাও—এইবার ঘুমুতে হবে।

আবার বৎসর ঘুরিতে চলিল। বহু যত্ন বহু চিকিৎসাতেও যখন জমিদার আরোগ্য হইলেন না, তখন সকলেই বুঝিল, কালের আহ্বান ইহাকে নিষ্ফল করা মানুষের চেষ্টার অতীত ব্যাপার।

নন্দকিশোর রায় এই এক বৎসর রোগ-শয্যায় শুইয়া ভাগিনেয় ও পত্নীর পরস্পরের প্রতি মনোভাব লক্ষ্য করিয়া শেষে অপুত্রা পত্নীর ইচ্ছামত ব্যবস্থা করাই উচিত মনে করিলেন। বিনয়ের মনুষ্যোচিত গুণের অভাব নাই, তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে পুত্রের অভাবই সে নিবারণ করিতেছে বটে কিন্তু তবু যেন মাতুলানীর প্রতি তাহার মনের ধারণা তেমন কোমল নয়

মাতুলানীও যে তাহার প্রতি স্নেহশীলা নন, তাহা জমিদার পূর্ব্বাবধিই জানিতেন, কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে বিনয়কে তাঁহার স্ত্রীর আর একটু অধীনে রাখিয়া গেলেই যেন তাঁহার পত্নীর পক্ষে ভাল হয়, এইরূপ ধারণা ক্রমশঃই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রী তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া যে শপথ করিয়াছেন, তাহার যে তিনি ব্যতিক্রম করিবেন না, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে বিশেষভাবেই ছিল। তাহা হইলে এ দত্তক-গ্রহণে বিনয়ের ক্ষতি কিছুই নাই, তাহার উপযুক্ত মাসহারার বন্দোবস্তও না হয় তিনি করিয়া যাইবেন। বাকি, বিনয় যেমন আছে তেমনি বরং সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া থাকিবে। ইহাতে মাত্র স্ত্রীর অনেকখানি সন্তোষ, তাঁহার চিরবুভুক্ষু অন্তরের কতকটা তৃপ্তি-সাধন এবং বিনয়কে তাঁহার বশ্যতাপন্ন করিয়া রাখা এই গুরু উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে। মাতুলানীও ভাগিনার উপর যেরূপ স্নেহহীনা, ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে অশান্তি কাটিয়া যাইবারো সম্ভাবনা। কিন্তু এই ব্যাপারে মাতুলানীর মনও অলক্ষ্যে বিনয়ের প্রতি একটু সমবেদনাশীল হইয়া পড়িবার কথা, কেননা যেমন করিয়াই হোক্ বিনয়কে কতকটা বঞ্চিত এবং আঘাত দেওয়া তো হইবেই। এক্ষেত্রে মাতুলানীর বক্র মনও তাহার প্রতি একটু কোমল হইবে এ সম্ভাবনাও রহিল।

এই এক বৎসর বিনয়ের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, রোগশয্যায় পড়িয়াও মাতুল পুনঃপুনঃ তাহাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, বিনয়ও পুত্রোচিত উত্তর দিয়াছে—আপনি আগে সারিয়া উঠুন, পরে সে কথা। কিন্তু এই এক বৎসরেও সে ছেলেটিকে একদিনও এ-বাড়ীতে আনে নাই। সেই যে স্ত্রীর মৃত্যুর দিন-কতক পরেই তাহাকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিয়াছে, তাহার পর আর একদিনও শিশু পুত্রকে মাতুলানীর নিকট আনিয়া দেয় নাই। মাতুলের শুশ্রূষা করিয়া দিনে বা রাত্রে যে কোন সুবিধা-মত সময়ে কিরূপে ছেলেকে দেখিতে গ্রামান্তরে ছোটে, তাহাও

কর্ত্তা জানিতেন। মাণিককে না দেখিয়া সে যে একদিন থাকিতে পারেনা তাহা সকলেই জানে, কিন্তু মাতুলানীর কাছে তাহাকে রাখিতেই বা বিনয়ের কিসের এত আপত্তি? বধূ মরিয়া যাওয়ার পর মাতুলানী যে তাহার শিশুকে খুবই ভাল বাসিতেছিলেন, তাহা বিনয় তো জানে, তবে বিনয়ের এ কি রকম আচরণ! মাত্র এই একটু অপরাধই তাহার বাকি সমস্ত স্বভাবের উপরে একটা সন্দেহের ছায়া আনিয়া দিতেছে। সে ঘোর বাবু,—গাড়ী নহিলে এক পা হাঁটে না, তাহার চাল্-চলন জমিদারের উপরও সময়ে সময়ে উঠিয়া থাকে, সাধারণ জমিদার-সন্তানের মতই অল্পদিনে সেও লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া আমোদে কাল কাটায়, তথাপি মাতুল একদিনও তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন্ নাই। জানিতেন, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। তাঁহাদের যৌবনও এইভাবে ব্যয়িত হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারীও যে সেই দৃষ্টান্ত ধরিবে, এ'ত একান্তই সাধারণ কথা। কিন্তু পুত্রসম্বন্ধে বিনয়ের এই বক্র ভাব, এইটাই মাতুলের সব চেয়ে খারাপ লাগিল। তাহার শ্বশুরালয়ও মোটেই সম্পন্ন ঘর নয়, স্বামিহীনা শ্বশ্রূঠাকুরাণী অতিকষ্টেই নিজের সন্তান-সন্ততিগুলিকে পালন করিয়া থাকেন। সেই অভাবের মধ্যে বিনয় নিজের সন্তানকে রাখিয়াছে, তবু এখানকার সর্ব্বপ্রকারের বাঞ্ছিত আদরের মধ্যেও তাহাকে রাখিতে চাহে না—এ যে বড়ই বিসদৃশ ব্যবহার! জমিদারও ইহাতে ক্রমে ঈষৎ অভিমান বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু গম্ভীর স্বভাব-প্রযুক্ত ভাগিনাকে একদিনও এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করিলেন না।

নিজের মেয়াদ ফুরাইতে আর বেশী দেরী নাই বুঝিয়া তিনি অতি-বিশ্বাসী দুই-তিনটি বন্ধুর সাক্ষাতে পত্নীকে দত্তক গ্রহণের স্বাক্ষরিত অনুমতি দিলেন এবং যতদিন না পত্নী ইচ্ছা করিবেন সেই ক্ষুদ্র উইলখানি ততদিন পর্য্যন্ত গোপন রাখিতেই পত্নী ও বন্ধুদের আদেশ দিলেন। বুঝি, তখনো তাঁহার মনে ক্ষীণ আশা ছিল, যদি ইতিমধ্যে উভয়ের মধ্যে একটা

সামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে, তাঁহার বিয়োগে যদিই পত্নীর এ বিষয়ে একটু উপেক্ষা আসিয়া বিনয়কে এ আঘাত হইতে রক্ষা করে!

সেইদিনই জমিদার আরও বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। বিনয় সমস্ত দিন অক্লান্তভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিল। মনে আশা ছিল, অন্ততঃ সন্ধ্যার পরেও মাতুল একটু ঘুমাইতে পারিলে সে টম্‌টম্ হাঁকাইয়া এক-ছুটে গিয়া মাণিককে একবার দেখিয়া আসিবে। এটুকু না হইলে রাত্রে যে সে ঘুমাইতেই পারিবে না। নহিলে এ সময়ে না হয় একদিন গ্রামান্তরে নাই ছুটিত! কিন্তু বিনয়ের যে তা একেবারেই সাধ্যাতীত। আর তাহার মনের ধারণা, তাহার মাণিকও বুঝি দিনান্তে একবার অন্ততঃ তাহাকে না দেখিলে অসুস্থতা বোধ করিবে, বুঝি সেও রাত্রে সুস্থ হইয়া ঘুমাইবে না! রাত্রে ঘুমের ঘোরে বুঝি কাঁদিবে! এক বৎসর সে মাতৃহীন হইয়াছে, এই এক বৎসর বিনয়ই যে সন্ধ্যার পর নিত্য তাহাকে ঘুম পাড়ায়।

কিন্তু সন্ধ্যা হইতে সহিস টম্‌টমে ঘোড়া জুতিয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তথাপি বিনয় বাহির হইতে পারিল না। মাতুল যে কিছুতেই সুস্থ হন না, ঘুম আসা তো দূরের কথা। এপাশ ওপাশ উঃ আঃ করিতে করিতে এক সময় বিনয়ের মুখের পানে চাহিয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ তোমার যে বেরুনো হচ্ছে না। আমি এখন একটু ভাল বোধ করছি—তুমি যেতে পার।"

বিনয় নত মস্তকে রহিল, উত্তর দিল না। সবই বুঝিল,—মাতুলের ইহা স্তোকবাক্য মাত্র! তিনি এখনো একটুও সুস্থতা বোধ করেন নাই! নিঃশব্দে সে তাঁহার মাথায় বাতাস দিতে লাগিল। স্ত্রী পায়ের তলায় বসিয়া মাঝে মাঝে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, তাঁহার পানে চাহিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "তুমি এসে বাতাস কর, বিনয়কে ছেড়ে দাও।"

মাতুলানীর দিকে মাথা তুলিয়া চাহিয়া বিনয় বলিল, "থাক্, আজ আর যাব না।"

"তাও কি হয়? যাও।"

রাজেশ্বরী উঠিয়া আসিয়া বিনয়ের হাত হইতে পাখা লইলেন। বিনয় অগত্যা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাতুল আবার বলিলেন, "দেরী করছ কেন—রাত হয়ে যাচ্ছে যে। ফিরতে বেশী রাত হলে আবার ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।"

বিনয় ধীরে ধীরে মাতুলানীর অধিকৃত স্থানে উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়ত।"

পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঈষৎ তীব্রস্বরে মাতুল বলিলেন, "তুমি তো ঘুমোওনি,—যাও।"

এ কি অভিমান? মাতুল তো কখনো এই আজিকার মত এমন ভাবের কথা বলেন নাই! অভিমান-বিদ্ধ স্বর বিনয়কে যেন চমকিত করিয়া তুলিল! এই পিতৃসম স্নেহশীল ব্যক্তিকে বুঝি সে আঘাতই দিয়াছে! তাহার এই দুর্ব্বলতাকে তিনি বুঝি ক্ষমা করিতে পারেন নাই। বিনয় উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সহসা মাতুলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই যেন শোনাইয়া বিনয় বলিল, "আমি খোকাকে আন্‌তে যাচ্ছি।"

মাতুল পাশ ফিরিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিলেন। মাতুলানী ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! কেন?"

উত্তর না দিয়া বিনয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায়,—মাতুলানীর স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "না, না, এখন আর তাকে আন্‌তে হবে না,—এখন আর কেন!"

বিনয় বাধা মানিল না, নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

* * *

গভীর রাত্রে চোরের মত নিঃশব্দে পা টিপিয়া বিনয় যখন মাতুলের কক্ষে প্রবেশ করিল, মাতুল তখন ঈষৎ সুস্থ বোধ করিয়াই ঘুমাইতেছেন অথবা নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া আছেন মাত্র, তাহা বিনয় বুঝিতে পারিল না। কেবল মাতুলানী বিনিদ্র-ভাবে তাঁহার নিকটে বসিয়া আছেন, দেখিল। বিনয় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দেই বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি চোখ তুলিতেই ভাগিনার সঙ্গে চোখো-চোখি হইয়া গেল। বিনয় মৃদুস্বরে বলিল, "আনতে পারলাম না, তার জ্বর হয়েছে। এই ঠাণ্ডায়—"

"ভালই করেছ। এ সময়ে কে তাকে এখন দেখ্‌বে?"

শেষ রাত্রি হইতেই জমিদারের অসুস্থতা অত্যন্ত বাড়িল এবং প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থা খারাপ হইতে আরম্ভ করিল। সেদিন রাত্রিটা সেইভাবে কাটাইয়া পর দিন প্রাতঃকালে নন্দকিশোর বাবু প্রাণত্যাগ করিলেন। ভাগ্যের বিরূপতায় বিনয় আর নিজের ত্রুটিটুকু সংশোধন করিবার অবসরই পাইল না।

৩

কয়েকদিন মাত্র স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, তখনো শ্রাদ্ধ শান্তি চোকে নাই। স্বামীর বিপুল নামের উপযুক্ত ভাবে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য, সদ্য বিধবা রাজেশ্বরী দেবী তাঁহার শোক-শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভাগিনা বর্ত্তমান থাকিলেও অপুত্র পত্নী তিনিই যে স্বামীর মুখাগ্নি হইতে সমস্ত কার্য্যের অধিকারী। কাজেই অবস্থা-গতিকে তাঁহার এ প্রৌঢ় বয়সের শোককে প্রথম হইতেই

তাঁহাকে যথাসাধ্য সম্বরণ করিতে হইয়াছিল। আর এই দুই বৎসর যে তাঁহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, ইহাও সত্য।

দাসীর মধ্যস্থতায় কর্ম্মচারীর সহিত সকল দিকের নানা বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া রাজেশ্বরী দেবী ক্লান্তভাবে বসিয়াছেন, এমন সময় সহসা চমকিত হইয়া দেখিলেন, পঞ্চম বর্ষীয় শিশু পুত্রের হাত ধরিয়া বিনয় তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

খানিকক্ষণ কেহই কথা কহিলেন না। রাজেশ্বরী বুঝিতে ছিলেন, কি উদ্দেশ্যে আজ বিনয়ের এ সন্ধি-স্থাপন। আজ মাণিককে তাঁহার হাতে দিতে আসে নাই, যাঁহার জন্য সে দিন রাত্রিতে ছুটিয়া গিয়াও বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, আজ স্বর্গগত সেই তাঁহারই প্রীত্যর্থে পুত্রকে মাতুলানীর নিকট আনিয়া দিতেছে। কিন্তু কেন আর?

কিছুক্ষণ পরে অপ্রসন্ন স্বরে তিনি বলিলেন, "এখন কেন আন্‌লে? কে ওকে এখন দেখ্‌বে? আর দুদিন পরে তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে নয় একেবারেই আসতো। তিনি কাজে আসতে পারবেন তো?"

"আসবেন বৈ কি। মাণিককে আগেই আন্‌লাম।"

"কেন আন্‌লে বাছা? কার কাছে ও থাকবে? তুমি সাম্‌লাতে পারবে ত?"

বিনয় উত্তর না দিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া তখন বেগের সহিত আবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যাঁর জন্যে এনেচ, তিনি তো আর দেখতে আসছেন না! আমার আর কেন বাছা! আমি আর তোমার ছেলে নিয়ে কি করব,—কিছুতেই আর আমার কাজ নেই। সব দরকারই এখন আমার ফুরিয়ে গেছে। দিয়ে এসো ওকে তোমার শাশুড়ীর কাছে, তাঁর সঙ্গে একেবারেই তখন আসবে।"

দ্বিগুণ আঘাত পাইয়া ম্লান মুখে বিনয় সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তাঁর মনে বিশ্বাস ছিল, মাতুলানী মুখে যতই যা বলুন, নিকটে ফেলিয়া দিয়া গেলে নারী-স্বভাব-বশে শিশুকে তিনি দেখিতে বাধ্য হইবেনই। হইলও তাই।

পিতাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মাণিক চঞ্চল হইয়া ওঠায় রাজেশ্বরী একজন দাসীকে আহ্বান করিয়া তাহাকে লইতে বলিলেন এবং একটু পরেই কিছু খেলনা ও খাবার লইয়া আবার তাহার নিকটস্থ হইলেন।

শোকের প্রাবল্যের মুখে তিনি ভাবিয়াছিলেন, আর তাঁহার কিছুতেই কাজ নাই, কিন্তু কয়েকদিন পরেই নিজের সে ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন, না, সমস্ততেই এখনো তাঁহার দরকার আছে। এমন কি বুঝি পূর্ব্বের অপেক্ষা আরো বেশী করিয়াই তাহার প্রয়োজন পড়িতেছে! এতদিন নিজের অধিকারটা তো এমন জাহির হইবার দরকার ছিল না। তাঁহারই যে সব, এ তো আর কাহাকেও কাণে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইতে হইত না! আজ যে অধিকার ভগবানের বিধানে কোথায় যেন খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে—তাই তাহার বন্ধন তাহার মোহও যেন বেশী করিয়া আঁটিয়া বসিতেছে। সর্ব্ব বিষয়ে স্বত্ব-সাব্যস্তের জন্য অন্তরে-বাহিরে একটা যেন বিদ্রোহ বাধিয়া উঠিতেছে।

উপযুক্ত সমারোহে নন্দকিশোর রায়ের শ্রদ্ধা চুকিয়া গেল। কেহ ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিল, কেহ বা নাক সিঁট্‌কাইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, তাঁর উপযুক্ত কি এই কাজ? ছেলে নাই, পিলে নাই, দান-সাগর করা উচিত ছিল। কেহ বা উত্তর দিল, "ছেলে নাই কি গো—ভাগ্‌নে রয়েছে, গিন্নি কি এখনি সব উড়িয়ে দেবে! ভাগ্‌নে—ভাগ্‌নের ছেলে! ভগবান দিলে ওতেই একটা সংসার হতে পারে। কর্ত্তা তো চিরদিনই সবগুলিকে মানুষ ক'রে আস্‌ছেন, এখন ওরা ছাড়া

দেওয়া হয়, ইহাও তাঁহার মন একেবারেই চাহে না। কিন্তু ছেলে যদি এমনি করিয়া বাপের কোলের মধ্যেই ঢুকিয়া থাকিতে চায়, তাহা হইলে হয় তো সেই উভয় পক্ষেরই অপ্রীতিকর ব্যাপারের পুনরভিনয় হইতে চলিবে। মাণিক তাহারই, মাত্র এইটুকু চিন্তা করিয়া তো তাঁহার মন ভরিবে না। ছেলে যদি তাঁহার অনুগত না হয়, তাহাকে বুকে করিয়া যদি তাঁহার বুক না ভরে, তবে ত এ সবই বৃথা! ইহার চিন্তামাত্র রাজেশ্বরী সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না—মন তাঁহাকে দিনকতক ধৈর্য্য ধরিতে উপদেশ দিলেও তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিতেছিল। তিনি তো মাত্র বংশ-রক্ষার জন্য কিম্বা নাম-লোপের জন্য মাণিককে এমন যুদ্ধ-পণ করিয়া গ্রহণ করেন নাই! তাঁহার ক্ষুধা অন্যরূপ, তাঁহার অভাব যে তাঁহার নিজের কাছে—পিণ্ডলোপ প্রভৃতি চিন্তার চেয়ে তা' অনেকখানি বড়! তাই তাঁহার দুইদিনের প্রসন্ন মুখে প্রশস্ত ললাটে আবার চিন্তার মেঘ ধীরে ধীরে ছায়া ফেলিতেছিল।

কিন্তু কয়েক দিন পরেই তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বিনয় তাঁহার আশঙ্কার দিক দিয়াও হাঁটিল না! সে নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়া উঞ্ছবৃত্তির মত আর হাত পাতিয়া দ্বারে বসিল না, বা একটু-আধটু যাহা পায়, তাহাই কুড়াইয়া ফিরিল না। রাজার মত দান করিয়া সে দিক হইতে নিজেকে একেবারে টানিয়া সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। মাণিক অনেক সময়ে কাঁদিয়াও তাহাকে কাছে পাইত না। বিনয়ের চিরকালের নেশার বস্তু সেই বেহালাখানা—এই পোষ্যপুত্রের হাঙ্গামা উঠার পর হইতে এতদিন সে যাহা আর স্পর্শও করে নাই—সেইখানা টানিয়া লইয়া তাহার ধূলা ঝাড়িয়া বিনয় এখন দিনরাত তাহারি কাণ মোচ্ড়াইতেছে, আর মাঝে মাঝে ছড়ি চালাইয়া তাহাতে স্বর বাঁধিতেছে। যদিও এখনো সে তেমন করিয়া বেহালাখানাকে সঙ্গীতের ভাষায় মুখর করিয়া তোলে নাই, তথাপি

সে যে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, রাজেশ্বরী তাহা বুঝিতেছিলেন। এ তো জানা কথা এবং ইহা যে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি জানিতেন! সেটা সর্ব্বসমক্ষে আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহার সেই বয়স্থা সুন্দরী ভ্রাতুস্পুত্রীটিকে তাহার পিতা-মাতার সহিত আর চলিয়া যাইতে দেন নাই। এবং বিনয়ের সহিত যে তাহার বিবাহ দিবেন, এ কথাও এখন সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। এ কথা বিনয়েরও কাণে উঠুক এবং সকলে এ কথার আলোচনা করিয়া তাহাকে এ বিষয়ে প্রস্তুত করিয়া তুলুক, কিম্বা বিনয় মেয়েটিকে দেখিয়া ক্রমে বিবাহে ইচ্ছুক হইয়া উঠুক, এ ইচ্ছাও তাঁহার মনে ছিল। আর দিন কতক পরে বিনয় যে বিবাহে আপত্তি করিবে না, কিম্বা যদিই চক্ষু-লজ্জার দায়ে একটু-আধটু করে, তাঁহাকে অভিভাবকের পদ লইয়া এবং মাতুলানীর উপযুক্ত স্নেহের সঙ্গে একটু জোর প্রকাশ করিয়াই না হয় সে কার্য্যটা সম্পন্ন করিতে হইবে। লোকেও বুঝিবে যে এই পোষ্যপুত্র লওয়ার ব্যাপারে তাহাদের বিনয়ের জন্য অতখানি হা-হুতাশে কেবল আহাম্মকি ভিন্ন আর কিছু প্রকাশ পায় নাই। বিনয়ের বিষয়ে আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইয়া রাজেশ্বরী তবে মাণিকের দিকে মনকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করিতে পারিলেন। এত দিন তাহাকে পাইয়াও ঐ সব ভাবনায় তাঁহার স্বস্তি ছিল না।

সন্ধ্যাবেলায় দুধ ও খাবার খাওয়াইয়া তাঁহার খাস দাসী যখন মাণিককে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল এবং মাণিক বাবার কাছে ঘুমাইবে বলিয়া বায়না ধরিয়াছিল, তখন রাজেশ্বরী তাহার শয্যায় গিয়া বসিয়া দাসীকে বলিলেন, "তুই যা, আমি ঘুম পাড়াচ্ছি।"

মুক্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া রোহিণী দাসী সরিয়া বসিতে বসিতে বলিল, "তুমি কি পারবে মা? যে আব্‌দেরে ছেলে!"

"তা হোক্,—তুই ওঠ্।"

পরের ছেলে

"দাদাবাবু যে কোথায় বেরিয়েছেন, রতনকে দিয়ে বামাকে দিয়ে এত খোঁজ করান্থ সেই থেকে,—তা তাঁর দেখাই পেলে না তারা! ছেলে যখন কিছুতে ঘুমোয় না, তখন কেন বাপু এ সময়ে বেড়াতে যাওয়া?"

গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন, "তা বলে সে একটু বেড়াবে না? চিরদিন কি তাকেই ছেলে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যেতে হবে! কেন?"

গৃহিণীর চিরদিনের আদরের দাসী রোহিণী তাঁহার এ ধমকে দমিল না, বলিল, "এখন যত দিন না বশ মানে, তত দিন তো দেক্‌। ছেলে যার বলে দিদিমায়ের কাছেই ঘুমোয় না, তার—"

"তুই বক্-বক্ থামা দিকি, মাথার কাছ থেকে! ঘুমোও তো বাবা মাণিক—বাবা ব্রজকিশোর, ঘুমোও তো আমার কোলে।"

"না ব্রজকিশোর, না, বাবা আস্‌বে।"

"তোমার বিনয়-বাবা যে বেড়াতে গিয়েছে ধন, তুমি ঘুমোও লক্ষ্মী ছেলে।"

"বিনয়-বাবা না—আমার বাবা। আমি ঘুমোব না।" বালক ক্রন্দন জুড়িল।

"ছাখো দেখি, ঘুমে চোখ চাইতে পারছে না, তবু জেদ্ ছাড়বে না! আমি যে তোমার মা হই ব্রজকিশোর, আমার কথা শুন্‌বে না?"

"মা না—তুমি ঠাকুমা, আর সেই দিদিমা! আমি দিদিমার কাছে যাব। মাসির কাছে যাব—ছোট মামার কাছে যাব—"

রোহিণী বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে বলিল, "এখন কটা জেদ্ সাম্‌লাবে, সাম্‌লাও! ছি খোকা, তুমি মায়ের কথা শুনছ না?"

"কই মা?" নিদ্রা-জড়িমা-ভরা চক্ষু পূর্ণ বিস্ফারিত করিয়া বালক দেওয়ালের দিকে চাহিল। "সেই দিদিমার ঘরে কাঁচের ছবির মধ্যে মা

বসে আছে, আমি ঘুমুলে মা স্বগগে থেকে চুমু খেতে আসে। এ ঘরে মা নেই—এ ঘর ভাল না, বিচ্ছিরী।"

"এই তো আপন-মা, এই তো তোমার ঘর। এই সব বাড়ী, আর এর যত ঘর, যত জিনিষ-পত্তর—সব তোমার, জানো ব্রজবাবু?"

বালক আবার চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিল, "ব্রজবাবু না—মাণিক।"

"ব্রজবাবুই তো ভাল নাম তোমার খোকন! মাণিক নাম তো পুরানো হয়ে গেছে, এখন তাই নতুন নাম হয়েছে। জান খোকাবাবু, ঐ যে আস্তাবলে যত ঘোড়া, যত গাড়ী, যত লোক-জন চাকর-বাকর আছে, সব তোমার।"

বালক আবার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যেন আনন্দের সহিত বলিল, "আর সেই কালো ঘোড়া? সেটা বাবার। বাবা যেটা চড়ে কেমন বেড়াতে যায়। আর সেই ছোট ঘোড়া—যেটা বাবার টমটমে জোতা থাকে?"

"সে সব তোমার খোকাবাবু, সব তোমার। এই তোমার মা, আর ঐ যে দেওয়ালে কাঁচের মধ্যে মস্ত ছবি, ঐ তোমার বাবার। তুমি যখন বড় হবে, তখন দেখ্‌বে, সব তোমার। তুমিই—"

"আমার বাবা, ভাল বাবা, কাঁচের বাবা নয়। আমি বাবার কাছে যাব—"

বালক এবার এমন ক্রন্দন জুড়িল যে রাজেশ্বরী বাধ্য হইয়া শেষে বিনয়ের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। সেবারে সে লোক বিনয়কে সঙ্গে করিয়াই ফিরিল।

বহুকষ্টে বহু সান্ত্বনায় পুত্রকে ঘুম পাড়াইয়া বিনয় ধীরে ধীরে তাহাকে মৃত নন্দকিশোর রায়ের পালঙ্কে রাজেশ্বরী দেবীর পার্শ্বে শোয়াইয়া দিয়া চোরের ন্যায় সে ঘর ত্যাগ করিল।

পরের ছেলে

"বাবা—"বেহালার কাণ মোচড়াইয়া মোচড়াইয়া তাহাকে দুই-তিন বার জখম করিয়া এবং পুনঃ-পুনঃ সারাইয়া লইয়া এবার বিনয় সেটিকে সযত্নে তাহার কাষ্ঠ-কফিনের মধ্যে পুরিয়া মনে মনে তাহার চির-সমাধির ব্যবস্থা করিতেছিল, তখন সহসা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মাণিক একেবারে তাহার কোলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া মুখ লুকাইয়া ডাকিল, "বাবা—"

বিনয় তড়িতাহতের মত প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, মাণিক ঠিক যেন কাহার হাত ছিনাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে! কে সে? রাজেশ্বরী দেবী স্বয়ং কি? মাণিকের সঙ্গে সঙ্গে এখনি ঘরের মধ্যে তিনি আসিয়া পড়িবেন! তিনি যদি মাণিকের এই আশ্রয়-গ্রহণ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন্? তিনি যদি ভাবেন, বিনয় তাঁহার ছেলেকে পর করিয়া রাখিবারই চেষ্টায় আছে? বিনয় স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল যখন কেহ আসিল না, দেখিল, তখন একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পুত্রের দিকে চাহিল।

পিতা কথা কহিতেছে না দেখিয়া বালক এইবার মুখ তুলিল এবং একটু অবাক্ হইয়া যেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে পিতার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার শিশু-চক্ষেও সে যেন এই কয়দিনে পিতার ভাবান্তর ধরিয়া ফেলিয়াছে। কি চেহারায়, কি ভাবে, এ যেন মাণিকের সে বাবা নয়। সন্দেহাকুল ভীত চক্ষে ধীর ধীরে পিতার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বালক আবার মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা—"

পুত্রের চোখের এই ভীত সঙ্কুচিত বিহ্বল দৃষ্টি মুহূর্ত্তে বিনয়কে অসংযত করিয়া তুলিল। সহসা দুই হস্তে পুত্রকে বুকের মধ্যে তুলিয়া লইয়া পাগলের মত চাপিতে চাপিতে অসংযত নিশ্বাসে রুদ্ধ কণ্ঠে সে ডাকিল, "মাণিক—আমার মাণিক—"

সে যে আজ কত দিন মাণিককে এমন করিয়া একা এমনভাবে পায় নাই। উন্মাদের মত মাণিকের মুখে চুম্বন করিতে করিতে তাহার অঙ্গের ঘ্রাণ নাসিকা পথে অন্তরের মধ্যে প্রেরণ করিতে করিতে বিনয় আবার ডাকিল, "আমার মাণিক—আমার যাদু—কি বল্‌ছ বাবা ?"

চিরাভ্যস্ত আদরে মাণিকের সন্দেহ ক্রমে যেন কমিয়া আসিল। তবুও যেন একটু দ্বিধার সহিত সে প্রশ্ন করিল, "বাবা—"

এই ডাক্ এমন করিয়া বিনয় যেন কত কাল শোনে নাই! পুত্রের মুখে মুখ দিয়া বিনয় উত্তর দিল, "কেন বাবা ?"

"আমার মা স্বর্গের মা, ছবির মা—না, এই ঠাকুমা মা ?"

হারে ভাগ্য! বিনয়ের মুখ দিয়াই ইহার উত্তর বাহির হইবে! পাছে মাণিক তাহার মাকে ভুলিয়া যায় বলিয়া সে না রাজেশ্বরী দেবীর স্নেহ-পাশ হইতেও এ কয়দিন ছেলেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। মৃতা জননীর ছবি দেখাইয়া বালকের মাতার স্মৃতি চির-জাগরুক করিয়া রাখিতে চাহিত! তাই কি ভাগ্যের এই পরিহাস! বিদীর্ণ হৃদয়ে বিনয় বলিল, "ঠাকুর নন্, ইনিও মা, ছবির মাও মা।"

"ছবির মা কি আর স্বর্গে নেই ? স্বর্গে ছবির বাবা আছে ? বাবা, ছবির বাবা কেন ? সে বাবা ভালো নয়—আমি তাকে বাবা বলব না।"

যেন কোন্ দূরতর স্থান হইতে বিনয় উত্তর দিল, "বল্‌বে বৈকি বাবা, তিনিও যে তোমার বাবা।"

"আর তুমি ?"

"আমি! মাণিক—মাণিক—" উৰ্দ্ধস্বরে যেন অচেতনের মধ্যে চীৎকার করিয়া বিনয় পুত্রকে আবার বুকে চাপিয়া ধরিল। মাণিক নিজ মনে বলিয়া যাইতে লাগিল,—"বাবার নাম তো বিনয়—বিনয়ভূষণ চৌধুরী। আমার নাম মাণিকলাল চৌধুরী—নয় বাবা ?"

মূঢ়ের মত বিনয় বলিল, "হ্যাঁ।"

"তবে কেন সবাই বলে, বাবার নাম নন্দকিশোর রায়? তবে কেন সবাই বলে, ঐ ছবির বাবা আমার বাবা? ও বাবা আমি নেব না—ও বাবা ভাল নয়, বিচ্ছিরি। আমার বাবা তো তুমি—নয় বাবা?"

উত্তর কি রে—ইহার উত্তর কি! এবং এ উত্তর বিনয়কেই দিতে হইবে! হাঁ, হইবে—নহিলে স্বর্গগত স্নেহময় মাতুলের সমস্ত ঋণ বিনয় কি দিয়াই বা আর পরিশোধ করিবে? তাহার পরীক্ষার ইহাও একটি অঙ্গ।

বিনয় ধীরে ধীরে বলিল, "হ্যাঁ মাণিক, উনিও তোমার বাবা।"

"উনিও বাবা, তুমিও বাবা? দুটো বাবা?"

"না—উনিই তোমার বাবা।"

"তবে তুমি, বাবা?"

"আমি!—আমি!" একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া বিনয় গৃহের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল। "আমি আর তোর বাপ নই, মাণিক—ঐ তোর বাপ, ঐ তোর মা—আমি কেউ নই।"

"এ কি ছেলেমানুষী করচো, বিনয়! এতটুকু ছেলে, তাকে মুখে ভোগা দিয়ে থামিয়ে দেবে, তা না, তার কথাতে এমনি কাণ্ড করছ?" এতে লোকে কি বলে? সবই বাড়াবাড়ি!"

কণ্ঠস্বরে মাতুলানীর আগমনের আভাষ পাইয়া বিনয় আর্ত্তস্বরে চেঁচাইয়া বলিল, "মামীমা তোমার পায়ে পড়ি—ওকে আমার কাছে আসতে দিয়ো না। হয় ওকে নিয়ে তুমি কোথাও চলে যাও—নয় তো বল, আমিই সরি! এতদিন যেতাম, কেবল—"

"কি যে বল বাছা ছেলেমানুষের মত! এখনো একবার একবার যখন তোমার কাছে আসার ঝোঁক ধরে, তখন কেউ কি ঠেকাতে পারে!

অন্য যায়গায় নিয়ে গেলে যদি আবার হেদিয়ে অসুখ করে, তখন কি হবে, বল তো ? এই তো এখনো এক বছর হয়নি, মরে বেঁচে উঠেচে ! আবার যদি তেমনি ব্যায়রাম হয় ?"

মুহূর্ত্তে বিনয় সঙ্কুচিত হইয়া ধীরে ধীরে অশ্রু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। রাজেশ্বরী দেবী তখন বলিলেন, "কিশোর, যাও তো বাবা, দ্যাখ গে, কেমন তোমার নতুন পোষাক্ এসেছে ! কেমন খেলনা, কত বড় বল, কেমন ছোট-ছোট রেল, ইষ্টিমার—যাও তো ধন ! কিশোর লক্ষ্মী ছেলে—যাও তো।"

খেলনা পোষাকের নামে উৎফুল্লভাবে গমনশীল বালক ঘাড় বাঁকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিশোর না—আমার নাম মাণিক—নয় বাবা ? আমার বাবা ছবির বাবা নয়—এই আমার ভাল বাবা।"

কুণ্ঠিত অবনত শিরেও বিনয় অনুভব করিল, সে কি উত্তর দেয়, তাহা শুনিবার জন্য রাজেশ্বরী দেবী উন্মুখভাবে দীপ্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া আছেন। যখন তিনি ছিলেন না, তখন সে মাণিককে যা বলিয়া উত্তর দিয়াছে, এখন সে কথার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন, কিন্তু হায়, এখনই কেন তাহা এত দুরূহ লাগিতেছে ! বুঝি, প্রাণ ফাটিয়া যায় ! তবু যন্ত্রের মত ধীরে ধীরে সে উচ্চারণ করিল, কিশোর তোমার ভাল নাম, আর নন্দকিশোর রায়ই তোমার বাবা, মাণিক ! তাঁরই ছেলে তুমি—এঁরই ছেলে তুমি।"

মাণিক আর প্রশ্ন করিল না, নিঃশব্দে স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে সে চলিয়া যায় দেখিয়া, রাজেশ্বরী তখন আদর করিয়া তাহার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার দুটো বাবা,—বুঝ্‌লে কিশোর ? আর দুটো নাম—কেমন ?"

"দুটো বাবা ভাল নয়।" গম্ভীর মুখেই এই কথা বলিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত

ব্যক্তির মত ধীর গমনে মাণিক চলিয়া গেল। বিনয় শুদ্ধ কাষ্ঠপুত্তলির মত কেবল চাহিয়া দেখিল মাত্র, আদর করিয়া বালকের মনোভঙ্গের বেদনা দূর করিয়া দিবারও তাহার ক্ষমতা হইল না। সে অধিকার তাহার কোথায়!

৭

"বিনয়—মেয়েটি কেমন রে? সুন্দরী নয়?"

বিনয় সচকিতে মুখ তুলিয়া দেখিল, একটী সুসজ্জিতা সুন্দরী কিশোরী তাহার সম্মুখে জলখাবারের থালা রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে। অপরিচিতা তরুণীকে এত নিকটে দেখিয়া অপ্রতিভভাবে বিনয় মাথা নামাইল। মাতুলানী পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "কি রে, আমার ভাইঝিটি কি সুন্দর নয়? উত্তর দিচ্ছিসনে যে?"

"এটি কি তোমার ভাইঝি, মামিমা?"

"তাও এক-বাড়ীতে থেকে এতদিন জানিস্ না? আচ্ছা ছেলে তো! বল্ না, কেমন দেখ্‌লি?"

"ভালই। এটি কি এইখানেই এখন আছে?"

"ওমা তাও দেখিস্ নি? বেশ যাহোক্! খুব লোককে আমি মত জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি!"

"কিসের মত, মামিমা? মেয়েটি সুন্দর কি না?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! শোনো, এইবার স্পষ্ট কথা বলি—মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। তাই আমার দাদা আমায় ধরেছেন, মেয়েটি তোমায় সম্প্রদান করবেন।"

"আমায় সম্প্রদান কর্‌বেন।" অত্যুগ্র বিস্ময়ে বিনয় উত্তেজিত হইয়া

উঠিল। "আমায় কন্যা সম্প্রদান? কি আছে আমার? পথের ভিখিরীকে তোমার দাদা কন্যা সম্প্রদান করতে চেয়ে বস্লেন যে, হঠাৎ?"

রাজেশ্বরী দেবী ঈষৎ আহত হইয়া একটু যেন ক্ষোভবিদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তুমি নিজেকে ভিখিরী বলে জানলেও লোকে তো তা জানে না। লোকে জানে, কর্ত্তার ভাগ্‌নে, ছেলের মত।"

তীব্রস্বরে বিনয় বাধা দিয়া বলিল, "সে ছিলাম যখন তিনি বেঁচে ছিলেন। এখন তাঁতে আমাতে সম্বন্ধ কি? তাঁর ছেলের পূর্ব্ব-পিতা, এই তো সম্বন্ধ? ভিখিরী নাহলে কি কেউ ছেলে বেচে? ছেলেকে খেতে দেবার যার ক্ষমতা নেই—" বলিতে বলিতে রুদ্ধস্বরে বিনয় থামিল।

রাজেশ্বরী দেবী গূঢ় অভিমানে গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আচ্ছা, তাই যদি হয়—ছেলে দেবার জন্য তোমার মামা তোমায় বিষয়ও তো দিয়ে গিয়েছেন। কিশোরের সংসারেও তুমি সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে থাক্‌তে পার, আর ইচ্ছা কর তো—"

"ইচ্ছা করি তো মাণিককে বেচা টাকা দিয়ে আবার আমি নিজের বাবুগিরি চালাই, বিয়ে করি, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করি! না?"

বিনয়ের দীপ্ত চক্ষুর সম্মুখে একটু নতশির হইয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "এ কি জগতে কেউ করে না?"

"না—না—কেউ করে না। তুমি যা করলে এ কেউ করে না! এমন করে একটিমাত্র সর্ব্বস্বকে কেউ কেড়ে নেয় না! যাক্, তা নিয়েছ—ভিখিরীর ছেলেকে রাজা করেছ, কিন্তু সে ভিখিরীকে নিয়ে আবার কেন তোমার এই খেলা, এ বিদ্রূপ? এ মতলবেই বুঝি এখন ঘন ঘন আমায় কাছে ডেকে খাওয়াও? কথা কও? আমি বলি, বুঝি, আমার ওপর একটু দয়া হয়েছে তোমার! কপাল দেখে বুঝি এতদিন পরে

একটু মায়া এসেছে! তা না—এই মতলব? ভাইঝি গছাবার চেষ্টা? বটে!"

রাজেশ্বরী দেবী বিনয়ের উন্মত্ত ভঙ্গীতে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তুমি এমনি অকৃতজ্ঞ চিরকালই—এ জেনে শুনেও এ অপমান কপালে ছিল বলেই আমার এ মতি ঘটেছিল। তোমায় থিতু কর্বার জন্যে তোমার ভাবনায় তোমার শাশুড়ী কেঁদে মরে—নিজেও হাভাতের মত চির-জন্ম বেড়াতে, তাই দেখে—"

যোড় হাত করিয়া বিনয় সবিনয়ে বলিল, "তোমায় সাত দোহাই মামিমা, আমায় তুমি সেই অকৃতজ্ঞ বলেই জেনে রাখো। এত ভাবনা আমার জন্যে আর ভেবো না,—তোমার দোহাই। যদি ছেলেটাকে আমায় দিনান্তেও একবার দেখ্‌তে দিতে চাও, তাকে এইটুকু কাছেও থাক্‌তে দিতে চাও, তাহলে আর তোমার সুন্দরী ভাইঝি বোনঝি এনে আমায় দেখাতে এসো না! আর নয় ত বল—আমার পথ আমি বেছে নিই। ছেলে এখন তো আর আমার জন্যে হেদুবে না। সে এখন দিব্যি নিজের সব চিন্‌তে শিখেছে—বাধ্য হয়েছে, আর আমার না থাক্‌লেও তোমার কোন ক্ষতি নেই—বরং গেলেই বালাই দূর হয়! বল, আমি কি কর্ব?"

রাজেশ্বরী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাপু—আমার ঘাট হয়েছে, আমি মেনে নিলাম। আর তোমায় কখনো যদি কিছু বলি—"

বিনয়েরই শুভাকাজ্ক্ষার জন্য বিনয় তাঁহাকে যেরূপ অপমান করিল, তাহাতে তাঁহার অন্তর ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রোহী হইয়া বিনয়কে বলিতে চাহিয়াছিল—আচ্ছা, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার—যাইতে চাও, যাও।" বিনয়ের তেজ ভাঙ্গিবার, দর্প চূর্ণ করিবার এ অস্ত্র তাঁহার হাতেই ছিল,—কেন না

তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, ঐ অকর্ম্মণ্য বিনয় কি নিজের জীবিকার সংস্থান করিতে পারিবে? না। নিজের দর্প বজায় রাখিবার জন্য তিনি—কিন্তু এমন কথা একবারও জিহ্বাগ্রে আসিতে দিলেন না। স্বামীর ইচ্ছা, স্বামীর আদেশ তাঁহার অক্ষরে অক্ষরে মনে ছিল। মাণিককে দত্তক না দিলে আজ বিনয়েরই যে সর্ব্বস্ব, আর এই পুত্রদানের জন্যও যে সে এই সম্পত্তির, বহু অর্থের অধিকারী! রাগ করিয়া যদি সে তাহা নাও লয়, তথাপি রাজেশ্বরীকে তো সে কথা মনে রাখিতে হইবে! ছলে তাহার পুত্র কাড়িয়া লইয়া আবার তাহাকেই তাড়াইয়া দেওয়া! না—না—বিনয় হাজার অপমান করিলেও রাজেশ্বরী তাহা পারিবেন না।

৮

সর্ব্ব-সন্তাপহারী সর্ব্ব-ক্ষতি-সংশোধক সর্ব্ব-ক্ষতের পরম-ভেষজ কাল, তাহাকে শত শত কোটী কোটী প্রণাম! বিনয় একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াই বেহালা বাজাইতেছিল। সম্মুখে মাতুলানী অধীরভাবে কি-একটা কথা বলিতে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, তাহা সে টেরও পায় নাই। সুরের ইন্দ্রজাল তখন তাহার চারি দিকে এমনি মায়ালোকের সৃষ্টি করিয়াছিল। ছায়ানটের অপূর্ব্ব রাগিণী অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার ঝঙ্কারে বাদকের এবং শ্রোতার মনে সুখের কিম্বা দুঃখের অথবা এই উভয়ের মিশ্রণে যেন এক রহস্য-লোকেরই আভাষ বিস্তার করিতেছিল। রাগিণীটী কাঁদিতে চায় কিম্বা হাসিতে চায়—অথবা সুখের দুঃখের সকল ভার কোন সুখাতীত দুঃখাতীত বস্তুর মধ্যে মিশাইয়া দিয়া সে শুধু ভাষা-হীন সুরের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াই যাইতে চায়, তাহা যেন বুঝা যাইতেছিল না। শুধু চারিদিকে একটা ব্যথা-ভরা রাগিণীর কুহেলিকা আর তার মাঝে মাঝে

ব্যথা-হরণের আবির্ভাবের অস্পষ্ট আভাষ দুইই সমানভাবে খেলিয়া যাইতেছিল। রাজেশ্বরী দেবী কয়েকটা রুষ্ট অভিযোগের ভাষা মুখে করিয়া আনিয়া সহসা বিনয়ের বেহালার সুরের আঘাতেই যেন বাক্যহীন হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিলেন।

অন্তরা হইতে সঞ্চারী, সঞ্চারী হইতে আভোগে নামিয়া সুরের শেষ মূর্চ্ছনা অস্থায়ীতে যাইয়া মিলিতে চাহিতেছে, এমন সময় বিনয়ের দৃষ্টি সম্মুখে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ঝন্ ঝন্ শব্দে বেহালার তিনটা তার ছিঁড়িয়া সঙ্গীতের দেবী সহসা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তার পরেই চারি দিক নিস্তব্ধ। বিনয়ের হস্ত এবং মন ইন্দ্রিয় সব যেন একসঙ্গে অচল হইয়া গেল। কিন্তু প্রবাহিত সুরজালের আকস্মিক অপঘাত বায়ুতরঙ্গেও যেন একটা অশব্দ আর্ত্তনাদ উঠিল, "এ কি হল—এ কি হল!" সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ্বরী দেবীর কণ্ঠও ধ্বনিত হইল—"কি করলি বিনয়? থাম্‌লি কেন? কি হলো?"

উত্তর নাই। সুর-রাগমুগ্ধ আরক্ত মুখে পাংশু বর্ণের আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতর্কিত আঘাতে বুকের সমস্ত শিরা-উপশিরার সঙ্গে অন্তস্তলও ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া তাহাদের বিষম স্পন্দনকে দর্শকের সম্মুখে এমন করিয়া ধরাইয়া দিতেছে যে, বিনয় বিব্রত হইয়া বেহালা ফেলিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাজেশ্বরী দেবীও তখন নিজের আঘাত সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "যেয়ো না, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

আবার কথা আছে? আর কি কথা থাকিতে পারে, এবং না জানি সেই বা কি? শঙ্কিত মুখে বিনয় মাতুলানীর পানে চাহিল।

"বসো, দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চলবে না, খানিকক্ষণ সময় লাগবে।"

"বল।" দাঁড়াইয়াই শঙ্কা-অবরুদ্ধ কণ্ঠে বিনয় উত্তর দিল।

"বল্‌ছিলাম এই যে,—একে আমি মেয়ে মানুষ, তাতে বুড়ো হতে চল্‌লুম, চিরদিনই কি সংসারের সব আমায় দেখতে হবে? তাহলে লোকে ছেলেপিলের কামনা করে কেন? এ কি অন্যায় নয়?"

বিনয় একটু আশ্বস্ত হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তা তোমার সংসার, তুমি না দেখলে কে দেখাবে?"

"আমার সংসার! আমি কি মর্‌বার সময় সঙ্গে করে বেঁধে নিয়ে যাব? কিসের সংসার আমার? কিশোরের সংসার কিশোর ভোগ করুক—আমার কি!"

বিনয় এইবার একটু হাসিয়া বলিল, "তা তো বটেই! তা আমায় কেন বল্‌ছ? আমি কি কর্‌ব?"

মাতুলানী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "তবে কাকে বলব বল তো? কর্ত্তা কি আছেন যে ছেলের সব দিক দেখবেন! তুমিও যদি কিশোরের ভাল-মন্দয় না থাক্‌বে, তাহ'লে—তাহ'লে—তার দশা কি হবে, বল ত?"

"কি করতে হবে, বল।"

"দেওয়ান গোমস্তা সব আমায় এসে জ্বালাতন কর্‌বে, এটার কি কর্‌ব—ওখানে কি কর্‌তে হবে, এটা না হলেই নয়। একটু জপ কর্‌তে বসেছি, তখনো এই খেঁচকানি! ফ্যালো হাতের জপ, তাদের মন্তব্য শোনো—তাদের সঙ্গে তকাতকি চালাও—কেনরে বাপু কিশোরের কি কেউ নেই? তুমি থাক্‌তে আমার এই সব নাকাল—এতে কি মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে?"

"তুমি যে আজ নতুন কথা বল্‌ছ মামী! আমি কবে কোন্ কালে বিষয়-আশয় চালাবার মত বুদ্ধি ধরি, বা এই সব দেখে থাকি যে আজ দেখ্‌ব?"

"এতদিন না দেখেছ, নাই দেখেছ, সে আলাদা কথা। তাই বলে

চিরদিনই কি খোকা থাকবে? কিশোরের সম্পত্তি তুমি আমি যদি না দেখব, তাহলে কে দেখ্‌বে, বল তো? পাঁচ ভূতে লুটে খাবে তবে?”

“তুমি বেঁচে থাকতে ভূতের বাবার সাধ্যি কি মামী, যে, তোমার কিশোরের সম্পত্তিতে আঙুল ছোঁয়ায়? আমার কথা আজ তো নতুন নয় সে তুমিও জানো, আমিও জানি। এ-সব বাজে কথা রেখে এখন আসল কথাটা কি, তাই বল?”

“আসল আর নকল কি বাপু—সবই আমার আসল, জেনো। আমার আর এত ঝক্কি সইছে না।”

“তাহলে আমি যেতে পারি? আর কোন কথা নেই তো?”

“গিয়েই বা তুমি কোন্ লাটগিরিতে বস্‌বে? বেহালা সাধতে বস্‌বে তো? তার আগে আমার আরও গোটা কতক কথা আছে, শোনো।”

“তাই বল না, বাপের সুপুত্তুর হয়ে কে না শোনে, ছাখো।”

“কিশোর যাটের আট বছরের ছেলে হলো, এখনো যে লেখা-পড়ার দিক্ দিয়ে ঘেঁসে না, তাও কি লক্ষ্য কর্‌তে নেই তোমার?”

“কেন, মাষ্টার তো আছে।”

“তবেই আর কি! মাষ্টার যখন আছে, তখন লেখাপড়া হতেই হবে,—তা ছেলে দিনান্তে একবার তার কাছে ঘেঁযুক আর নাই ঘেঁযুক।”

“কিশোর কি পড়্‌তে যায় না?”

“কোথায়! সমস্ত দিন যত অনাছিষ্টির খেলা, সঙ্গে একপাল ছোঁড়া-ছুঁড়ি জুটেছে। কখনো পুকুরে ইষ্টিমার ভাসানো হচ্ছে, কখনো স্পিরিট জেলে রেল চালানো হচ্ছে, আর ছাতে উঠে বেলুন উঠোনোর তো কামাই নেই! কোন্ দিন কাপড়ে-চোপড়ে আগুনই লাগবে—না, ছাত থেকে পড়্‌বে, কি জলেই ডুব্‌বে, তা জানি না। মাষ্টারের কাছে দিনান্তে একবারও যায় কি না সন্দেহ।”

"কেন, তুমি বকৃতে পার না?"

"আমার কথা কেয়ার করে বুঝি! বকৃতে গেলে সেখান থেকে এমন ছুট দেবে যে খাবার সময়ে সাত বাড়ী খুঁজিয়ে সকলকে হায়রাণ ক'রে তুল্‌বে। কি দুষ্টু যে হয়েছে, তা যদি ছাখো! তাই তো বলছি যে তুমিও যদি এমন ক'রে গা ভাসিয়ে থাকৃবে, তাহলে ছেলেটার কি ক্ষতি হবে আখেরের, তা কি বুঝ্‌চ না? এই বেলা তাকে শাসিত করতে ধর।"

"মাষ্টারকে বলে দিলেও তো পারো যে পড়তে না গেলে শাসন করে কিংবা নিয়মিত ঘণ্টা ধ'রে আটকে রাখে, কি—"

"সে সব আমি পারব না বাপু। পরের ওপর আমি অমন করে ছেলে শাসন কর্‌বার ভার দিতে পারব না। সে কি ভালর জন্যে যতটুকু দরকার, তার ওজন রাখ্‌তে পার্‌বে? হয়তো খুব বেশী মার্‌বে—কি খিদের সময় কি তেষ্টার সময়েও ছেড়ে দেবে না, খুব বেশীক্ষণ ধরে রেখে ছেলেকে হাপ্‌সে দেবে! পরকে দিয়ে কি ও-সব হয়?"

বিনয় নিঃশব্দে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে অনেকগুলা কথা তাহার গুমরাইয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু মুখে তাহাদের আনিয়া মাতুলানীর সহিত আবার এক দফা কলহে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। মনও তো তাহার বক্তব্যগুলা পরিপাক করিতে পারিতেছিল না। জলের উপর তৈলের ন্যায় তাহা মনের উপরে ভাসিয়াই বেড়াইতে লাগিল। পর? কে পর, কে আপন? কোন্ অধিকারে সে ছেলেকে শাসন করিতে যাইবে? সে তো এখন আর তাহার মাণিক নয়, সে যে কিশোর। পরের ছেলের উপর তাহার এই শাসন দুইদিন পরে যদি এই মাতুলানীরই অপছন্দ হয়। আজ তিনি শাসন করিতে বলিতেছেন বলিয়া নিজের ধারণা-মত শাসন করিতে গেলে যদি ইনি চোখ রাঙাইয়া বলেন, "আমার ছেলে শাসন

করিবার তুমি কে ?" তখন বিনয়ের বলিবার কি থাকিবে ? আর কিশোর যদি বিনয়ের শাসন না মানে ! এতো খুবই সম্ভব, যখন রাজেশ্বরী দেবীকে মানেনা, তখন বিনয়কেই বা মানিবে কেন ? বরং না মানারই অধিক সম্ভাবনা। বিনয় কিশোরের কে ?—কেন সে তাহাকে ভয় বা শ্রদ্ধা করিবে ? বরং ভয় না করিবার, শ্রদ্ধা না করিবারই তো কথা !

সহসা দাঁড়াইয়া থাকিতে অশক্ত হইয়া বিনয় মাতুলানীর সম্মুখের আসনের উপর বসিয়া পড়িল। এমন কাজ সে কখনো করে না। তাই মাতুলানীও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি হল বিনয় ? মাথা ঘুরছে নাকি ?"

ভাগিনেয়ের বসিয়া পড়িবার ধরণে তাঁহার এ সন্দেহও হইয়াছিল। মামীর নিজের কথাতেই বিনয় তাহার অপ্রতিভ ভাবটা ঢাকিয়া লইবার সুযোগ খুঁজিয়া পাইয়া মাথা নাড়িয়া অস্পষ্টভাবে সায় দিল, "হুঁ।"

"মাথার আর অপরাধ কি ! দুধ ঘী কি ভালো খাবার তো ছোঁও না, দেখি ! বেড়াতে বেরুনো, কি কিছু একটা করা, মাঝে মাঝে না হয় বেহালাটা নাড়ো চাড়ো, শুনতে পাই ! এতে কি শরীর ভালো থাকে ? যাক্, যা আমি বল্‌ছিলাম—ছেলের দিকে মন দাও বাপু এই বেলা,— নৈলে পরে দুঃখ পেতে হবে।"

"ও কি আমারই কথা শুন্‌বে মামীমা ?"

"কি আশ্চয্যি ! তুমি পুরুষ মানুষ, বাপ, তোমায় ভয় করবে না ? কথা শুন্‌বে না ? আমি মেয়েমানুষ বলে আমায় মানে না। এই বয়সে ছেলেগুলো নাকি এই রকমই দুষ্ট হয়, মিত্তির-গিন্নি বল্‌ছিল। তার যাটের চার-পাঁচটি সোনার চাঁদ—ছেলে মানুষের সব জানেন। পুরুষ মানুষ ছাড়া ও-বয়সের ছেলেগুলো মেয়েদের একেবারে মানে না।"

"তাহলে মাষ্টারকেও তো ভয় করতো।"

"কি যে বল তুমি বাপু, তোমার সঙ্গে আমি আর বকতে পারি না! মাষ্টার আর তুমি! একদিন তোমারই সম্পূর্ণ বশ ছিল, তোমাকে ছাড়া কাউকে জানতো না! আজও কি এটুকু তার জানা নেই যে তুমিও একজন তার বাপই!"

না, না। এটুকু সে ভুলিয়া যাক্ ভুলিয়াই থাকুক! এ কথা তাহার মনে আর না থাকিলেই যে বিনয় বর্ত্তাইয়া যায়! একদিন সে বাপ ছিল বটে, কিন্তু আজ? কোন্ লজ্জায় সে মাণিকের কাছে সে অধিকার লইতে যাইবে? যে-মাণিক তাহাকে ভিন্ন একদিন অন্য কাহাকেও জানিত না, সে তো কিশোর নয়! সে যে মাণিক, মাণিক। সে মাণিকের একটু অস্তিত্বও কি এই জমীদারের তুলাল অগাধ সম্পত্তির ভাবী অধিকারী ব্রজকিশোরের মধ্যে থাকিবার কথা! না, না।

"দেখি, কিশোর কোথায় কোন্ নতুন ফন্দীর খেলা জুড়েছে। ডেকে দিচ্ছি তোমার কাছে, কান ধরে নিয়ে একটু পড়্তে বসাও দিকি।"

গৃহিণী চলিয়া গেলেন—আর তুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বিনয় সেই আসনটার মধ্যেই মাথা গুঁজিল।

শ্রীমান্ ব্রজকিশোর তখন বাড়ীই ছিলেন না। সঙ্গীদল লইয়া নিকটস্থ একটা ফলের বাগানের মধ্যে নূতন একটা ক্রীড়ার উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন। একদিন পূর্ব্বে খুব ঝড়বৃষ্টি হইয়া একটা অনতিগভীর অনতি-প্রশস্ত নামালো জায়গায় খানিকটা জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল এবং একটা লিচু গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে শিশুদিগের পরম প্রলোভনের বিষয় হইয়াছিল। এইটুকু জল ভাঙ্গিয়া গেলেই ডালটার মোটা গোড়ার উপর

উঠিতে পারা যায়, তার পর সেখান হইতে ধীরে ধীরে সমস্ত জলটার উপরেই বিচরণ করিতে পারা যাইবে। নীচে ছোট্ট পুকুরের মত অনেকটা জল এবং তাহার মধ্যে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত অর্দ্ধ-উন্নমিত ছোট-খাটো গাছের মত ডালটা, তাহার মাথায় মাথায় বেড়াইয়া বেড়ানো, এ কি কম সাহসের কথা! এই অভিনব বীরত্ব-প্রকাশের প্রলোভন সেই আট হইতে নয় দশ বৎসর বয়স্ক বালকদের কাহারই ত্যাগ করিতে পারিবার কথা নয়।

উরুর কাছে কাপড় তুলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া অতি-সন্তর্পণে সকলে জলে নামিল। দলের মধ্যে তাহার বয়োজ্যেষ্ঠ কেহ কেহ থাকিলেও সাহসে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বলিয়া শ্রীমান্ ব্রজকিশোরই সকলের অগ্রগামী হইল। সেই ছোট ছোট পায়ের একহাঁটু জল হইতে বেশীক্ষণ লাগিল না। তখনো ডালের মোটা গুঁড়ির নাগাল মিলে নাই। সভয়ে কেহ কেহ ফিরিবার প্রস্তাব করিলে কিশোরচন্দ্র তাহাদের অকুতোভয়ে সাহস দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রায় এক উরু জলের মধ্যে গিয়া শেষে সকলে ডালের উপর চড়িতে পারিল। তখন আর ভয়ের নামও নাই, বীরবৃন্দের আস্ফালন দেখে কে? শাখা-মৃগের মত সেই পতিত অর্দ্ধমগ্ন জলের উপর সকলে চারি হাতে-পায়ে বিচরণ করিতে লাগিল, কেহ-বা সুবিধামত স্থানে উপবেশন করিয়া জলে পা ডুবাইয়া মহা স্ফূর্ত্তিতে চেঁচাইতে লাগিল—"গ্যাখ্, গ্যাখ্, আমি কেমন মজার জায়গা পেয়েছি। কেমন রাজার মত বসে আছি, অথচ পায়ে জল ঠেক্‌ছে। তোরা কেউ এমন জায়গা পাস্‌নি, দুয়ো—দুয়ো!"

"রাজার মত বৈ কি, বকের মত! আর এই গ্যাখ, কে রাজার মত সক্কলের ওপর-ডালে বসে তোদের মজা দেখাচ্চে।"

সকলে চাহিয়া দেখিল, কিশোর, সত্যই সকলের উপরে রাজার মত সুখাসীনভাবে বসিয়াছে। পর-মুহূর্ত্তে তাহার সজোরে ঝোঁকানি দেওয়ার

বেগে সমস্ত জল কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বালকের দল চীৎকার করিল,—"ও ভাই, না ভাই কিশোর—না ভাই! পড়ে যাব—পড়ে যাব।"

"তা গেলেই বা, কতটুকুই বা জল? বড় জোর আমাদের এক বুক, কি এক গলা—তাতে আর ডুবে মর্‌বিনে কেউ। বরং একটু সাঁতার শিখে নেওয়া যাবে, ডাল ধরে। নাম্‌বি ভাই?"

"না ভাই—না! গা মাথা ভিজে যাবে—কাপড় ভিজবে। বাবা মার্‌বেন—মা বক্‌বে—না, ভাই।"

"উঃ—ভারী মা বাবা, তা বলে আমরা সাঁতার শিখ্‌ব না? পুকুরে নাব্‌তে ভয় লাগে, বেশী জল,—এতে বেশ মজা। ঐ তো ও পাশে আমাদের বেনেপোকা ধর্‌বার ঢিবিটা। আকন্দ গাছগুলোয় আজ আর একটাও পোকা নেই, বিষ্টির দায়ে সব পালিয়েছে। এখানে আর কতই জল হবে,—চল্‌, নামি।"

"না ভাই বাবা মার্‌বেন—মা মার্‌বে।"

"তবে থাক্‌ তোরা—আমিই একা নাব্‌ছি।"

"তোর মা কিছু বল্‌বেন না? টের পান্‌ যদি?"

পরম তাচ্ছিল্যের সহিত কিশোর উত্তর দিল, "নাঃ।"

"তোকে আর কে কি বল্‌বে—তুই হলি জমীদার। কিন্তু তোর মা যেন আপন-মা নয়, বাপ্‌ তো আপন বাপ্‌, তিনিও কিছু বল্‌তে পারেন না তোকে?"

আর এক সঙ্গী উত্তর দিল, "আপন বাপ আর কি করে হবেন, এখন তো কিশোর জমীদার মহাশয়ের ছেলে! বিনয়বাবুর ছেলে আর তো নয়। কি ক'রে তিনি আর বক্‌বেন—মার্‌বেন?"

কিশোর স্তব্ধ হইয়া একটু বসিয়া থাকিতে জনৈক বালকের চীৎকারে

চমকিয়া উঠিল। "ঐ ত্যাখ্ তোর চাকর এসেছে তোকে খুঁজ্তে। চ' ভাই, এই বেলা পালাই, চ'।"

সক্ষোভ গর্জ্জনের সহিত ক্ষুদ্র জমীদার তাহাদের তাড়া দিয়া উঠিল, "চাকরকেও ভয় করতে হবে নাকি?"

"তোর যেন ভয় নেই, ও গিয়ে আমাদের বাবা-মাকে বলে দেয় যদি?"

"হুঁ; ওর ভারী সাধ্যি!"

এমন সময়ে একটা চীৎকারে সকলে চমকিত হইয়া দেখিল, সকলের নীচু ডালে ঠিক জলের উপরে পা ছোঁয়াইয়া যে-ছেলেটি খেলা করিতেছিল, সে সভয়ে সেখান হইতে 'সাপ' 'সাপ' বলিয়া চেঁচাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। সকলেই বিষম আতঙ্কে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম বালকটি ডাল হইতে পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গেল।

ভয়ে আড়ষ্ট বালকের দল নিজেরা যে-পথে ডালে উঠিয়া ছিল, সেই-পথে যে আবার নামিবার চেষ্টা করিবে, তাহাও তাহাদের সাধ্যে আসিল না, কেবল দৃঢ়ভাবে ডাল ধরিয়া সকলে চেঁচাইতেই লাগিল। কিশোর শুধু দৃঢ়পদে ডাল হইতে জলে নামিবার চেষ্টা করিতে করিতে উভয়কে সাহস দিতে লাগিল, "ভয় নেই নরেন, একটুখানি জল,—ডুব্‌বিনে —ভয় নেই,—আরে একটা হেলে সাপ, ভয় নেই।"

কিশোরের সন্ধানে অদূরে যে চাকর আসিতেছিল, ইতিমধ্যে সে ছুটিয়া আসিয়া জলে নামিয়া পড়িয়াছে এবং "বাবু আপনি এই বৃষ্টির জলে নাম্‌বেন না" বলিতে বলিতে জলে-পতিত বালকের দিকে অগ্রসর হইতে-ছিল, কিন্তু তাহার নিষেধ গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া কিশোর ডাল ধরিয়া জলে নামিয়া তাহার এক-গলা জলের মধ্যে দাঁড়াইল। পতিত বালকটিও তখন হাবুডুবু খাইয়া ডাল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারও জল সেখানে

প্রায় ঐ রকমই। ইতিমধ্যে চাকরটা তাহাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিতেই কিশোর তাহাকে আদেশ করিল, "ওকে কোলে করে ডাঙ্গায় নিয়ে চল্।" ভৃত্য ক্ষুদ্র মনিবটির হুকুম তামিল করিতে করিতে বলিল, "আপনি ডালের ওপর উঠে দাঁড়ান বাবু, জলে থাকবেন না। অসুখ করবে। সাপটা ডাল ছেড়ে, ঐ দেখুন, ডাঙ্গার দিকে চলে গেল, আমি এসে আপনাকে কোলে ক'রে নামিয়ে নিয়ে যাচ্চি।"

কিশোর সে কথা কাণে না তুলিয়া তাহার পশ্চাতে ডাঙ্গার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "তুই ওকে নামিয়ে দিয়ে এই সব ছেলেদের একে একে হাত ধরে ধরে নামিয়ে নিয়ে আয়।"

ভৃত্য সভয়ে বলিল, "ততক্ষণ আপনি ভিজে গায়ে ভিজে জামা-কাপড়ে থাক্‌বেন? গিন্নিমা যে—"

প্রভু বিষম ধমক দিয়া উঠিল, "তোকে অত সর্দ্দারি করতে হবে না,—যা বল্‌ছি, আগে তাই কর্।"

কিশোর হইতে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ বালকেরা কিশোরের দেখা-দেখি সাহস সঞ্চয় করিয়া একে একে ডাল হইতে নামিয়া জল পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং কিশোরের ভৃত্যের সাহায্যে অবিলম্বে সবগুলি ডাঙ্গায় উঠিল। এইবার বাড়ী যাইবার পালা। সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছে দেখিয়া কিশোর সদম্ভে বলিল, "এত ভয়টা কিসের, শুনি? তোদের তো মেরে ফেল্‌বেই না, না হয় একটু বকুনিই খাবি! আর কে বা তোদের বাড়ীতে বল্‌তে যাচ্চে? আয়রে নরেন, তুই আমার সঙ্গে আয়, তোর কাপড় শুকিয়ে দিইগে, তার পরে বাড়ী যাস্।"

শ্রীমান্ কিশোরও বাড়ী গিয়া কিন্তু অনেকখানি অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পড়িল। নিজেও সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে বন্ধুর জন্যই সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু রাজেশ্বরী যখন অন্ধকার মুখে তাহাকে

একদিকে টানিয়া লইয়া নিজহস্তে তোয়ালে দিয়া তার গায়ের জল মুছাইতে লাগিলেন এবং দাসদাসীরা চারিদিকে তাহারই জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিল তাহার বিপন্ন অতিথির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কিশোর তখন বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল, "তুই বাড়ী চলে যা, নরেন—শীগ্‌গির যা।"

পরম স্নেহে আমন্ত্রিত বালক সহসা এই তাড়া খাইয়া অপ্রতিভভাবে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে বিনয়ের সম্মুখে পড়ায় সেভাবে আর তাহাকে বাড়ী যাইতে হইল না। বিনয় তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া দিল এবং খানিকটা গরম দুধ ও কিছু খাবার আনাইয়া খাইবার জন্য অনুরোধ করিল। বলিল, "তোমার কাপড় ততক্ষণ শুকিয়ে যাক্—তুমি এইগুলো খেয়ে নিয়ে এই ঘরে ব'সে ছবি দ্যাখো। ভিজে কাপড়ে গেলে তোমার বাপ-মা দুঃখ পাবেন। সহজে আর তোমাদের মাণিকের সঙ্গে খেল্‌তে দেবেন না।"

বালক খাইতে খাইতে বলিল, "কিন্তু দেখুন বিনয়বাবু, এতে কিশোরেরই সব চেয়ে বেশী দোষ, সেই-ই আমাদের—"

"যাক্ যাক্—আমি একটু দেখে আসি, মাণিক কেমন আছে। তুমি খাও।"

খানিক পরে বিনয় ফিরিয়া আসিলে বালক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কিশোর কি খুব বকুনি খাচ্চে, বিনয়বাবু?"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "না, কিন্তু সে আর একা বাড়ী থেকে বেরুতে পাবে না। তোমরা এক কাজ কর না কেন,—এই বাড়ীতে এসেই তার সঙ্গে খেলা করবে?"

বালক কিছুক্ষণ ভাবিয়া শুষ্কমুখে বলিল, "বাড়ীতে আর কি খেলা হতে পারে?"

"সে ব্যবস্থা আমরা ক'রে দেব, সকালে মাণিক আর খেল্‌বে না, পড়্‌বে। বিকেলে সকলে ত একসঙ্গে মাঠেই খেলা কর্‌বে—দুপুরে যদি তোমরা—"

"বাঃ আমরা যে তখন ইস্কুলে যাই! কিশোর যদি আমাদের কাছে না যায়, আমরাই বা তাহলে আসব কেন?"

"না—না, যাবে বৈকি,—যাবে বৈকি, তবে কি না—না—"

"আমার কাপড় শুকিয়েছে ওটুকু ভিজে থাক্‌গে—ওতে কিছু হবে না। আমি যাই এইবার।"

বালকের পাছু-পাছু গৃহ হইতে বাহির হইয়া বিনয় দেখিল, অদূরে কিশোর গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া আছে। নরেন তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইতে সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। গতিক সুবিধা নয় বুঝিয়া নরেন তখন নিঃশব্দে এক-পা এক-পা করিয়া চলিয়া গেলে বিনয় ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিশোরের দিকে অগ্রসর হইতেই কিশোর এক-ছুটে অন্যদিকে পলাইয়া গেল।

১০

কিশোর যখন দেখিল, সে বাড়ীর বাহির হইলেই তাহার সঙ্গে একজন গার্ড বাহির হয়, তখন তাহার বাহিরের সমস্ত আকর্ষণই নিমেষে দূর হইয়া গেল। একটা প্রহরীর সজাগ সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে নজর-বন্দীর মত ফিরিতে ঘুরিতে তাহার একটু ভাল লাগিল না। খেলার যত রস যা-কিছু মাধুর্য্য সব যেন ইহাতে একেবারেই শুকাইয়া লুপ্ত হইয়া গেল। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ চিত্ত লইয়া সে আর বাড়ী হইতে বাহির হইতেই চাহিল না; সহসা নিবিড়ভাবে পাঠে মন দিয়া একদম ভাল ছেলে বনিয়া বসিল।

আবার রাজেশ্বরী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ছেলে এমন করিয়া যদি

দিনরাত ঘরের কোণে বই মুখে করিয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলেই বা চলিবে কেন! ছেলে তাঁহার ইচ্ছামত পড়া-শোনায় খুব মন দিয়াছে বটে, কিন্তু এও যে বাড়াবাড়ি। ইহাতে তো তাহার শরীর ভাল থাকিবে না। সকালে সন্ধ্যায় বেড়ানো কিংবা ছুটাছুটি করিয়া খেলা এগুলা যে শিশু-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সেটুকু রাজেশ্বরী দেবীর ভাল রূপেই জানা ছিল। কিন্তু কিশোর যেরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহাকে একা আর কোন মতেই বাহিরে পাঠানো যাইতে পারে না।

চাকর সঙ্গে লইয়া সে যখন কিছুতে বাহির হইবে না বুঝা যাইতেছে, তখন বিনয়েরই তাহাকে লইয়া দুইবেলা বেড়াইয়া আসা উচিত। নহিলে ছেলে যে অসুস্থ হইয়া পড়িবে! আবার তিনি বিনয়কে লইয়া একদফা বকাবকি বাধাইয়া দিলেন। মাষ্টারের দ্বারা কিশোরকে গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়ার চেষ্টায় তিনি বিফল হইয়াছিলেন। কিশোর তাঁহার আর-সমস্ত উপদেশ এবং শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে প্রস্তুত আছে, কেবল বেড়াইতে চল কিংবা খেলিতে চল বলিলেই সে যে-গোঁ ধরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইতে তাহাকে টলাইতে মাষ্টারের সাধ্যে কুলায় না। অগত্যা বিনয়কে অনুযোগ করা ছাড়া রাজেশ্বরী দেবী আর অন্য উপায়ও দেখিতে পাইতেছিলেন না।

সেদিন বৈকালে মাষ্টার মহাশয় তাহাকে ঘরের বাহির করিবার প্রাণপণ চেষ্টায় বিফল হইয়া বিরক্তভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে কিশোর তাহার অঙ্কের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, ঘরে আর কেহ নাই, কিন্তু নীচের উদ্যান হইতে কতকগুলা পরিচিত কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় ভরিয়া বার বার তাহার কর্ণপথে আসিয়া বাজিতেছে। বই ও খাতা ফেলিয়া কিশোর বারান্দায় আসিয়া দেখিল, পুষ্পকুঞ্জবহুল উদ্যানের অনেকটা জমি একেবারে বৃক্ষলতাশূন্য ক্ষুদ্র

ভূমিখণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে, সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই নাই এবং সেই জমির উপরে তাহার সঙ্গীরা সদলে হাতে একটা নূতন ফুটবল লইয়া মহাস্ফূর্তির সঙ্গে খেলার উদ্যোগে ব্যাপৃত আছে। কিশোরকে বারান্দায় দেখিয়া তাহারা কলরবে সমস্বরে অভ্যর্থনা করিল, "এই যে কিশোর, পড়া হল ভাই তোর? আয়, এইবার খেল্‌বি।" কিশোর বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "তোরা যে বড় এখানে! মাঠে আর খেলিস্‌ না?"

"মাঠে বৃষ্টির জল দাঁড়িয়ে যে কাদা হয়েছে। বিনয়বাবু আমাদের খেলার জন্য এই জমি তৈরী করে দিয়েছেন, দেখছিস্‌ না? সে বলটা তো ছিঁড়ে খুঁড়ে সাতটা তালি দিয়েও আর বাগ্‌ মানছিলো না। বিনয়বাবু আমাদের এই নতুন বলও আনিয়ে দিয়েছেন। এ নতুন মেকারের বল, খুব মজ্‌বুৎ, এ বল টেঁকবে, বিনয়বাবু বলেছেন। খুব দামী কিনা, তিনি নিজে পছন্দ করে বেছে বেছে ভাল কোম্পানিদের অর্ডার দিয়েছিলেন। ও কি ঘরে ঢুকেছিস্‌ যে! খেল্‌বি না?"

"আমার এখন অঙ্ক কষা হয়নি।"

তার পরদিন বৈকালে নরেন অপরাধীর মত প্রথমেই তাহার পড়ার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে ডাকিল, "কিশোর ভাই, আমাদের সঙ্গে আর খেল্‌বি না নাকি ভাই?"

কিশোর বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "দেখ্‌ছিস্‌ না—ছবি দেখছি।"

"কি ছবি—দেখিনা ভাই—"

কিশোর তখনি পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিল, "ও ম্যাপের ছবি।"

"ম্যাপের আবার ছবি কিরে? ম্যাপ তো ম্যাপ। বিনয়বাবুর ঘরে কেমন সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, দেখেছিস্‌?"

অনিচ্ছাতেও বালকের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "না।"

"চল্ না, দেখ্‌বি। উনি এখন ঘরে নেই। একা একা দেখ্‌তে ভয় কর্‌ল, তুই থাক্‌লে ভাল করে দেখ্‌তে পেতুম। কত রকম-রকমের ছবি, চল্ না ভাই দেখাবি।"

ছবির উপর এই দুর্দ্দান্ত বালকের এমন একটা প্রবল ঝোঁক ছিল যে তাহারই নেশায় সে অসাধ্য সাধনও করিতে পারিত; তাই এ আহ্বান তাহার পক্ষে বিষম হইয়া উঠিল। তখনি সে আত্মজয়ের শেষ চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "কি-ই এমন ছবি যে—তাই—"

"ও ভাই তুই নিশ্চয় দেখিস্‌নি, দেখ্‌লে এ কথা বল্‌তিস্ না—কত বড় বড়, আর কি স্থন্দর রং-চং করা। শিকারের কটা ছবি, ছবিতে, বাপ্‌রে, একটা প্রকাণ্ড ঢাল-ওয়ালা লোককে কি প্রকাণ্ড একটা সিংহই ধরেছে,—উঃ, যেন জ্যান্ত! আরও একটায় একদল শিকারী তেমনি মস্ত দুটো সিংহকে—"

কিশোর এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "উনি ঘরে নেই ত?"

"কে? বিনয়বাবু? না, উনি আমাদের দলের খেলা দেখতে বাগানে বসে আছেন। হ্যাঁ ভাই, তুই বল খেল্‌বি না আমাদের সঙ্গে?"

"ঐটুকু জায়গার মধ্যে? রামঃ!"

"কেন ভাই বেশতো খেলা হয়, সমস্ত বাগানটাই ত ছুট্‌তে পারা যায়। চল্ না খেলবি।"

বাগানের মধ্যে তখন বালকদের কলরোল এবং চর্ম্মগোলকের অঙ্গে উপর্য্যুপরি তাহাদের পদাঘাত ঢিপ্‌ঢাপ্ শব্দ উঠিয়া নরেনকে বাগানের দিকে আকৃষ্ট করিল।

কিশোর সহসা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না, তুই ছবি দেখ্‌তে চাস্ তো চল্। আমিও নিশ্চয় ঐ রকম ছবি আনাব। আমি যে ঘরে শুই—

আর ঘরে—সে ঘরেও নিশ্চয় ওর চেয়ে ভাল ভাল ছবি আছে। কেমন ছবি তুই দেখেছিস্, দেখিগে। আমাদের ছবির চেয়ে আর ভাল হতে হয় না!"

উভয় বন্ধুতে বিনয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া ছবির বিশ্লেষণ করিতে লাগিল। বহুদিন—প্রায় বৎসরাধিক কাল হইতে কিশোর আর এ ঘরে মোটেই প্রবেশ করে নাই। আজ উত্তেজনা এবং লোভের বশে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহার কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইতেছিল, তাই ব্যগ্রভাবে সে নূতন ক্রীত ছবিগুলার মধ্যে মনকে ডুবাইয়া ধরিল। নরেন কিন্তু সহসা একখানা ছোট ফটোয় আকৃষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও ভাই ছাখ্, ছাখ্, ছোট্ট একটা ছেলের ফটোর চার দিকে কত রকমের ফুল-পাতা এঁকে সাজানো। এ সব কে এঁকেছে ভাই? বিনয়বাবু নিজে? উনি তো খুব সুন্দর আঁকতে পারেন।"

কিশোর তাহার সম্মুখের ছবির পানে ঝুঁকিয়া এক মনে সেখানা দেখিলেও তাহার শুভ্র গণ্ড ও কর্ণের উপরে একটী রক্তিম আভা ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। উত্তর না পাইলেও নরেনের প্রশ্ন সমানে চলিতে লাগিল, "এ ছোট ছেলেটী কে ভাই? তোরই ছেলেবেলার ছবি নাকি? ঐ যে আর একটি মেয়ে মানুষের—ছোট একটি বৌ-মানুষের ছবি, তাঁর কোলে একটি ছেলে, এ তুই-ই, না? আর ইনিই বুঝি তোর—তোর—"

"ওদিকে যাস্‌নে বল্‌ছি, উনি ওদিকে আহ্নিক করেন।"

কিশোরের কম্পিত অথচ উচ্চ তর্জ্জনে চমকিয়া নরেন প্রায় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যই সে অনুপযুক্ত স্থানেই পদার্পণ করিয়াছে। গৃহের যে-কোণে ছোট ছোট লম্বা লম্বা টুলের উপরে এই ফটো কয়খানি সাজানো রহিয়াছে, তাহার সম্মুখে

একখানা পুরু আসন পাতা, এবং পঞ্চপাত্র ধূপাধার প্রভৃতি এদিকে ওদিকে ছড়ানো, এটা পূজা-আহ্নিকের স্থান বলিয়াই বোধ হইতেছে।

নরেন অপ্রতিভ ভাবটা সারিয়া লইবার জন্ম বলিল, "তা কি ক'রে জান্‌ব! কোনো ঠাকুর-দেবতার ছবি সুমুখে নেই, কিছু না—এ-সব তো মানুষের ফটো। এ তো তোরই ফটো, আর তোর আপন মার ফটো। উনি কি এই সব সাম্‌নে নিয়ে পূজো করেন?"

"তা আমি কি করে জান্‌ব?"

"তুই কি এ-ঘরে আসিস্ না?"

কিশোর উত্তর না দিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। না, এ-ঘরে আর তার কি দরকার? দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে এই শিশু-কোলে-করা জননী-মূর্ত্তিখানি তাহার সন্ধ্যার আসন্ন নিদ্রার মধ্যে স্বর্গ-কল্পনাকে বহিয়া আনিয়াছে। এই মূর্ত্তিই স্বপ্নে তাহাকে কোলে লইয়াছে, তাহার মা হইয়া কত চুম্বন করিয়াছে! কিন্তু আজ বাস্তব যে তাহার ক্ষুদ্র জীবনের এ-সব স্বপ্নের সহিত কোন সম্বন্ধই রাখিতেছে না! তার আপন মা—কিশোরবাবুর পুত্র ব্রজকিশোর। সে রাজেশ্বরী দেবীর নয়নের নিধি—একমাত্র সন্তান! এ বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধীশ্বর।

"আচ্ছা, তোর বাবার ছবি দেখছিনে যে?"

"যে-ঘরে আমরা শুই, আর বৈঠকখানাতেও আছে, দেখিস্ নি?"

"কৈ, দেখিনি ত!"

"অত বড় বড় ছবি, তবু দেখিস্ নি? মার পূজোর ঘরেও আছে।"

"ওঃ, সে তো জমীদার মহাশয়ের। তোর বাপের মানে আমি বিনয়-বাবুর কথা বল্‌ছি যে। আচ্ছা, তুই কি বিনয়বাবুকে বাবা বলে ডাকিস না?"

"না।"

"সত্যি? আহা, কেন ভাই? উনিই তো আসত্ বাপ।"

কিশোর নিঃশব্দে একখানা ছবির দিকে চাহিয়া রহিল। মুখের সমস্ত লোহিত বর্ণ চলিয়া গিয়া একটা পাঁশুটে শ্বেত রংয়ে তাহার সমস্ত মুখখানি ক্রমে ছাইয়া ফেলিতেছিল। ঠোঁট দুটি একেবারে ছায়ের মত বিবর্ণ, একটু একটু কাঁপিতেছে, হাত দুটি ক্রমে ধীরে ধীরে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল।

"তোর এই মা বুঝি বারণ করেছেন? ভারী অন্যায় কিন্তু।"

এইবার কিশোর কথা কহিল। স্বর যে কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা বালকদের অনুভবেরও অতীত।

"কেন অন্যায়? বড় ছবি যাঁর আর এই যিনি মা—এঁদের তবে কি বল্‌ব? মা বাবা আবার মানুষের কটা করে থাকে?"

নরেন একটু স্তব্ধ থাকিয়া কিশোরের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তাবলে নিজের বাপকে বাপ বল্‌বে না?"

"না।" কিশোরের দৃঢ়স্বরে আবার চমকাইয়া উঠিয়া নরেন চাহিয়া দেখিল, কিশোর সে গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নরেনও ঘরের বাহিরে আসিয়া যেন অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিল, "উনি কিন্তু তোকে খুবই ভালবাসেন। ঐ যে তোর ছোট বেলার ছবিখানা, ওর চারদিকে যে সব ফুল-পাতা এঁকেছেন, তার মধ্যে কি লেখা আছে পড়েছিস্?—আমার মাণিক!—কিন্তু তুই ওঁকে—"

বিস্ময়ে অভিভূত-প্রায় নরেন দেখিল, তাহার কথা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই কিশোর এক-দৌড়ে অন্দরের দিকে চলিয়া যাইতেছে।

সাধারণ বালকের মত পুত্রকে খানিকটা পড়াশুনা খানিকটা খেলায় নিযুক্ত দেখিলেই রাজেশ্বরী খুসী হইতেন কিন্তু এ ছেলে যে সাধারণের পথে চলিবে না, এই বয়সেই তাহার সূত্রপাত দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। আর সস্নেহ তিরস্কার শত রকমের চেষ্টা করিয়াও তিনি

কিশোরকে তাহার জেদ ছাড়াইতে পারিলেন না। সেই যে পড়ায় মন দিল, তার পরে আর খেলাধূলার দিকে কিছুতেই তাহাকে ভিড়াইতে পারা গেল না! তাই বাধা-হীন স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অনুমতি পাইয়াও যখন তাহার সঙ্কল্প টলিল না, মাসের পর মাস যখন সে এই বাল্যক্রীড়া-হীন চাপল্যহীন বয়োবৃদ্ধের মত গৃহকোটরে নিজেকে আবদ্ধ রাখিল, তখন রাজেশ্বরীও অগত্যা সে চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

১১

সে বারের বর্ষাকালটায় রাজেশ্বরী দেবী একটা গুরুতর রকম অসুখে মাস দুই ভুগিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মাথা আর হার্ট এই ব্যাপারে অনেকখানি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ডাক্তারে দেখিয়া শুনিয়া বড় মানুষদের যে ব্যবস্থা সর্ব্বদাই তাঁহারা দিয়া থাকেন, রাজেশ্বরী দেবীর জন্যও সেই ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তারের ব্যবস্থা শুনিয়া রাজেশ্বরী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার জন্যে আবার হাওয়া-বদল! পোড়ার দশা আর কি! আমাদের নাকি আবার মরণ আছে?" কিন্তু সে কথা কানে না করিয়া বিনয় যখন চেঞ্জের বন্দোবস্তে কর্ম্মচারীদের ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে দেখিলেন, তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া ধমক দিলেন, "ক্ষেপেছ নাকি? আমি বাড়ীতেই ভাল হব। বাড়ী-ঘর ছেড়ে বিষয়-আশয় অব্যবস্থায় রেখে, কিশোরকে নিয়ে দেশে দেশে হৈ হৈ ক'রে এখন আমি বেড়াতে পারব না।"

"বাড়ী-ঘর বিষয়-আশয় সব যেমন তেমনি থাকবে, কেবল তোমার শরীরটা সারিয়ে নিয়ে বুকের অসুখটা ভাল করে নিয়ে আস্‌তে পারা যাবে,—লাভ হবে এইটে। আর কিশোর? মাষ্টারের চেষ্টায় সকালে

বিকেলে খানিকটা একসারসাইজ করলেও ভাল। খেলা-ধূলো ত একেবারে বন্ধ করেছে, এই বয়সে ছুটোছুটি কি বেড়ানো-চ্যাড়ানোর বিশেষ দরকার। এক বছর হয়ে গেল,—তবু জেদ ত ছাড়লে না!"

"কি যে জেদী ছেলে! কিন্তু যাক্ রোগাটোগা এজন্যে হয় নি ত।"

"তা না হলেও এর ফল পরে বুঝতে পারবে। ভোগে রোগা না হতে পেলেও শরীর অকর্ম্মণ্য হবে, যে বয়সের যা তা যদি না করে। এই জেদও ক্রমে তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, দেখচ না? এই উপলক্ষে তার এ জেদটাও ভেঙে যাবে। অন্য দেশে গেলে নতুন নতুন জিনিস দেখতে পাওয়ার লোভে সে বাইরে বেরুবে। শরীরটারও তার উপকার হবে।"

"চল বাপু তাহলে। মাষ্টারকেও সঙ্গে নিয়ো কিন্তু।"

"সে তো বটেই।"

"কোথায় যেতে বলেছে ডাক্তার?"

"সে তো অনেক তর্কাতর্কি চলল,—এখন ডাক্তার রাঁচি যাওয়াই ঠিক করে দিয়েছে।"

"রাঁচি! সেখানে কোন ঠাকুর-দেবতা নেই। না বাপু, সেখানে যাব না। যেতেই যদি হয় তো এমন জায়গায় চল, যেখানে তোমাদের এই হাওয়া বদলের খেয়ালও মিটবে, আমারও কিছু দর্শন-টর্শন—"

"সেইজন্যেই আরও এমন জায়গায় যাচ্ছি, যেখানে তোমার এ সব দৌরাত্মি একেবারে চলবে না। তোমায় একা কি দোষ দেব,—মামা, তাঁর মত লোকও চেঞ্জে গেলেন কিনা দেওঘর কি বিন্ধ্যাচল নয়তো এলাহাবাদ! একটু সারেন অমনি পুণ্যি স্নান আর দর্শন-টর্শনে এমনি মেতে যান যে যে-উদ্দেশ্যে যাওয়া তার বিপরীত কাণ্ডই বাধিয়ে তুললেন। শেষের দিকে তো আর বাড়ী থেকে বেরুতেই চাইলেন না, দর্শন-টর্শন করা ক্ষমতায় কুলুবে না ব'লে।"

"তবেই বোঝো বাপু, তাঁর মত অমূল্য জীবনের জন্তও যখন তিনি এতে রাজী হন্‌নি তখন তোরা কিনা আমার মত একটা বিধবা মানুষের জীবনের জন্যে তীর্থ-ধর্ম্মহীন জায়গায় নিয়ে যেতে চাস্‌?"

"হ্যা, তাইতো চাই। তীর্থ-ধর্ম্ম এখন মাথার ওপরে থাকুন, আজো তোমায় বাঁচতে হবে—বুঝেচ! তীর্থ-ধর্ম্ম পালাবে না।"

ক্ষণেক ভাবিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "তা এক রকম ঠিকই বলেছিস্‌। কিশোর এখনো বড্ড ছেলে মানুষ,—এখন যদি আমি মরি, তাহলে ওর কি কিছু থাক্‌বে? পাঁচ ভূতে লুটে নেবে।—তুই যদি মানুষ হতিস্‌, তাহলেও বা ভরসা থাক্‌তো।"

"জানই ত! এই বুঝে আর ও-সব আপত্তি-টাপত্তি করো না।"

তাহাই হইল। উপযুক্ত ব্যবস্থার সহিত সকলে রাঁচি যাত্রা করিলেন। হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনে কিশোরেরও অনেকখানি পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়ায় বিনয়ের পরামর্শ এবং বুদ্ধির উপর রাজেশ্বরীর এবার অনেকখানি শ্রদ্ধা জন্মিল। পথে বাহির হওয়ার পর হইতেই ছেলের এই পরিবর্ত্তন তিনি লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার সম্মুখে সে তাহার পিতার সহিত ইদানীং আর কথা বলা দূরে থাকুক হাজির থাকিতেই চাহিত না। রাজেশ্বরীর এমনও সন্দেহ হইত যে কিশোর বোধ হয় বিনয়ের সহিত আর বাক্যালাপই করে না বা তাহার কাছেও ঘেঁষে না। এ চিন্তায় তাঁহার কিন্তু তেমন সুখ বোধ হইত না—আঘাতই বাজিত। অথচ এই তিনিই একদিন কিশোরকে এমনি একান্তভাবে পাইবার জন্য কি উন্মত্তই না হইয়া উঠিয়াছিলেন! তাঁহার সে সাধ এখন তো পূরা মাত্রাতেই পূর্ণ হইয়াছে, খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে সর্ব্বপ্রকারে কিশোর তো এখন তাঁহারই একান্ত নিজস্ব হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সেই প্রবল পিতৃ-অনুরক্তি তো তাহাকে দত্তক লওয়ার কয়েক মাস পার হইতেই ধীরে ধীরে কমিয়া

দাঁড়াইয়া এখন এমন স্থানে আসিয়া ঠেকিয়াছে—তাহাতে সেই রাজেশ্বরীও কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। এতখানি না হইলেই বুঝি ভাল হইত। নিজের প্রার্থিত বস্তুর পূর্ণ মূর্ত্তি এখন যেন তাঁহাকেই ফিরিয়া আঘাত দিতে চাহিতেছে। বিনয়ের উপর তাঁহার স্নেহও বোধ হয় এই কারণেই যেন ক্রমে গভীর হইতেছিল। সে যে জীবনে আর কোন অবলম্বন পাইল না। রাজেশ্বরীর সে-সব চেষ্টা যে বিফল করিয়া দিয়া এই ছন্নছাড়া মূর্ত্তিতে তাঁহার কোলের কাছেই বসিয়া রহিল, ইহার উপর কিশোরের সেই পিতার সম্বন্ধে এরূপ উদাসীনতা তাঁহাকে যেন বিনয়ের কাছে একটু লজ্জিতই করিয়া তুলিত, কিন্তু ইহা লইয়া বিনয় বা কিশোর কাহারো সহিত কোন আলোচনা করিতেও তাঁহার সাহসে কুলাইত না। তাহার ফলও যে ভাল হইবে না, এটা তাঁহার মন অলক্ষ্যে যেন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিত।

তাই রাঁচির পথে যখন কিশোর বিনয়ের একটু কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া তাহাকে এটা কি, ওটা কি, এটা কোন্ নদী, কিসের পুল, কোন্ জেলার মধ্য দিয়া ট্রেণ চলিতেছে ইত্যাদি প্রশ্নে তাহার ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া লইতেছিল, তাহাতেই রাজেশ্বরী দেবী বেশ খুসী হইয়া উঠিলেন। বিনয় অবশ্য বুঝিতেছিল যে তাহার মার গাড়ীতে মাষ্টারকে নিকটে না পাইয়া সে অগত্যা বিনয়ের কাছেই তাহার কৌতূহলগুলা মিটাইয়া লইতেছে। তবুও উভয় পক্ষেরই এইটুকুকেই পরম লাভ বলিয়া মনে হইল।

প্রভাতে পুরুলিয়ায় ট্রেণ বদলের পর যখন পথের দৃশ্যের পরিবর্ত্তন সুরু হইল, তখন কিশোর বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাঁচি প্লেটোতে পৌছিবার জন্য যখন সেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গাড়ী পাহাড়ের গায়ের আঁকা-বাঁকা পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়া দুই পার্শ্বে শালের গভীর জঙ্গল রাখিয়া

গম্ভীর খদের মধ্যস্থিত বাঁধের মত সংকীর্ণ পথে ছুটিতে লাগিল তখন পরম বিস্ময়ে কিশোর বিনয়ের অনেকখানি নিকটস্থ হইয়া জানালায় একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল। পথের এক একটা বাঁকে যখন গাড়ীর দুই প্রান্ত এবং দুইদিকের পথই দেখা যাইতেছিল, তখন কিশোর তাহার এই কয় বৎসরের অত্যন্ত সংযত মৃদুস্বর ভুলিয়া গিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেছিল, "দেখুন, দেখুন, এবার আর গাড়ী কোন দিকে যাবে? এইতো পথ বন্ধ হয়ে গেল। বাঃ—বাঃ, কেমন মজা দেখ্‌লেন? পথ লুকুনো ছিল বাঁকের মধ্যে? উঃ, কি প্রকাণ্ড গর্ত্ত দুধারে—যদি গাড়ী পড়ে যায়! খদের মধ্যে আর চারিদিকে ঐ ছোট ছোট ঝোপের মত যে সব গাছ, ঐগুলোই শাল গাছ? ওরা বড় গাছ অথচ অতটুকু দেখাচ্চে! বাবা! ঐ জঙ্গলগুলোর নাম কি?"

"জোন্‌হা!"

"ঐ সব শাল গাছের মধ্যে দিয়ে কেমন সরু সরু খালের মত জল বয়ে চল্‌ছে! সুবর্ণরেখা কোন্‌টার নাম? সবগুলোই তার ধারা? সেই যে প্রপাতের কথা বল্‌ছিলেন,—এই 'জোন্‌হা' ষ্টেশনেই নাম্‌তে হয়? চলুন না কেন, তবে আমরা নামি! ডাক্‌-বাংলা আছ যেবললেন, তাতেই মা না হয় থাকবেন,—আমরা দেখে আস্‌ব।—এখান থেকে দেখতে কষ্ট কি আর এমন হবে? পুস্‌ পুস্‌ কি রিক্‌স তো পাওয়া যায় বল্‌ছেন। মোটরে করে সে কবে কতদিনে আসবেন! অনেকদূর হলোই বা—" ইত্যাদি প্রশ্নে ও অনুরোধের আবদারে সে বিনয়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল; জানালা দিয়া সে বেশী না ঝোঁকে সেদিকে সতর্ক থাকিয়া বিনয় সানন্দে তাহার সহিত সমস্ত পথটা বকিয়া চলিয়াছিল।

তাহাদের বাসা হইতে মোরাবাদী পাহাড় খুব বেশী দূর ছিল না। প্রত্যহ বৈকালে পিতা ও মাষ্টারের সহিত কিশোর সেখানে বেড়াইতে যাইত। রাঁচি হিলেও দুই চারিদিন তাহারা গিয়াছিল কিন্তু হিলের নীচের

ছোট-খাট লেকটার জন্ম রাজেশ্বরী সেদিকে তাহাদের বেড়াইতে যাওয়া পছন্দ করিতেন না, জলকে তাঁহার বড় ভয়। ছেলে যদি জল দেখিয়া সাঁতার কাটিতে চাহিয়া বসে! মোটরে করিয়া এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর ট্রিপগুলাও ক্রমে আরম্ভ হইল। বিনয়ের ইচ্ছা ছিল, রাজেশ্বরী আর একটু সারিলে তবে এসব জায়গায় বেড়ানো আরম্ভ করিবে, কিন্তু কিশোরের ধৈর্য্য ধরিতেছিল না, তাহার আনন্দে রাজেশ্বরী দেবীও বাধা দিতে চাহিতেন না। সে যে এতদিন পর্য্যন্ত এমন করিয়া কোন কিছু চাহে নাই, কোন আবদার ধরে নাই! তিনি নিজে অনেক জায়গায় গাড়ীতেই বসিয়া থাকিতেন—বিনয়ের সঙ্গে কিশোর নামিয়া যাইত। সহর সমস্ত ঘুরিয়া দেখা শেষ হইয়া গেল। ডুরাণ্ডার বাঙ্গালী গৃহস্থ-পল্লীর মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে কতবার তাহাদের ইচ্ছা করিতেছিল, কাহাদের সহিত তাহাদের পরিচয় হয়, যেস্থলে তাহাদের বাসা, সেখানে প্রতিবাসী কেহ ছিল না বলিলেই চলে, কিন্তু গাড়ী হইতে নামিয়া অদ্ভুতভাবে গায়ে পড়িয়া কাহারো সহিত আলাপ করা তো চলে না, কাজেই মনের ইচ্ছা মনে চাপিয়া তাহাদের ফিরিতে হইত! সে দেশের আদিম অধিবাসী কতকগুলি মুণ্ডার সহিত কিশোর কিন্তু ভাব করিয়া লইয়া "চুটু প লু, ইচাদাগ ইচাদাগ হুণ্ডুঘাগ্" প্রভৃতি বচনে ছোটখাটো দু-একটা পাহাড়-পর্ব্বত এবং সে দেশের প্রকাণ্ড প্রপাতটির নাম শিখিয়া লইয়া মাতা ও বিনয়কে শুনাইয়া হাসিয়া অস্থির করিত। হুণ্ডু প্রপাত দেখা ও চক্রধরপুর যাওয়া এই দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা দূরান্তরের এবং রাজেশ্বরীর পক্ষে শ্রমসাধ্য বিষয় সব শেষের জন্ম রাখিয়া তাহারা এদিক ওদিকই দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেদিন সূর্য্যাস্তের সময় জগন্নাথপুরের অনতি-উচ্চ পর্ব্বতের বহু প্রাচীন এবং জগন্নাথ দেব মন্দির দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কিশোরের একটী সঙ্গী জুটিয়া গেল। সঙ্গীটি কিন্তু একটি বালিকা, বয়সে তাহার চেয়ে বছর

দুইয়ের ছোট হইবে। তাহার মামা এবং মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে মোটরে করিয়া তাহারাও মন্দির দেখিতে আসিয়াছিল। তাহার দুর্দান্ত সাহস এবং অত্যন্ত অবাধ্যতাই তাহাকে সহসা কিশোরের ভাল লাগিবার একমাত্র কারণ। অভিভাবক এবং সঙ্গীদের কাহারো সাবধানতা সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেছিল না—উঁচু প্রস্তরখণ্ড হইতে খণ্ডান্তরে সে নির্ঝরিণী প্রবাহের মতই ঝাঁপাইয়া ঝাঁপাইয়া চলিতেছিল, কখনো প্রাচীন বট বৃক্ষের ঝুরি ধরিয়া ঝুল খাইতেছিল। তাহার কৃতিত্বে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আকৃষ্ট হইয়া কিশোর তাহার নিকটে গিয়া একটা সূক্ষ্মরকম ঝুরি ধরিয়া ঝোঁক দিতেই সেই দুঃসাহসিনী বালিকা তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "ওটায় ঝুলো না—বড্ড সরু—আমি পারিনি। ভয় করবে।"

অত্যন্ত আনন্দে এবং উত্তেজনার সহিত একটু চেষ্টা দ্বারা কিশোর সেটাতে নিজের দেহভার সম্পূর্ণ ঝুলাইয়া দিয়া যেন ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর দিল, "না—এই তো বেশ পারা যাচ্চে।"

"তুমি তো খুব ওস্তাদ। তোমার নাম কি ভাই?"

"কিশোর। আর তোমার নাম?"

"নির্ঝরিণী!—আমায় সবাই ঝরণা বলে ডাকে।"

"বাঃ বেশ নাম তো!" বালিকার আনন্দ-চঞ্চল দেহ এবং স্বচ্ছ শুভ্র সৌন্দর্য্যভরা মুখের পানে চাহিয়া বালক ভাবিল, নামটা কি সার্থক! বলিল, "তোমাদের বাড়ী কোথায় ভাই?"

"এই খানেই বাড়ী?—শামলংয়ে আমার মামার বাড়ী, যার সঙ্গে আমি মামার বাড়ী বেড়াতে এসেছি। আমার বাবা আমাদের দেশের বাড়ীতে আছেন। আমাদের বাড়ী কল্‌কাতায়। তুমি কোনদিন শামলংয়ের মাঠের ধারে সুবর্ণরেখার ওপরে যে পুলটা আছে, সেইখানের নদীটাকে দেখ্‌তে যাওনি?"

"না।"

"আঃ—সে যে কি মজা! পাথরের ওপর দিয়ে নীচে দিয়ে তোড়ে জল চলেছে। সেই জল কোথাও টপ্‌কে কোথাও হেঁটে পার হও—সে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত টান্—কালো কালো পাথরের বড় বড় চাপের মধ্যে সে জল—দেখ্‌তে যাবে একদিন? কালই চল না—কাল আমাদের সেই নদীর পাহাড়গুলোর ওপরে চড়ি ভাতি হবে—যাবে?"

বালিকার চেয়ে কিশোর একটু বড় বলিয়া তাহার কাণ্ড-জ্ঞানও জন্মিয়াছিল। সে এই সাদর নিমন্ত্রণে একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার মা আসেন নি?"

"না—মামা এসেছেন আর ভাই-বোনেরা এসেছে। ওরা ভারী ভীতু, —দেখছ না, ভয়ে ভয়ে পা বাড়াচ্ছে, যেন এখনি প'ড়ে ম'রে যাবে। তোমার কিন্তু বেশ সাহস!" তার পর দূরে মোটরখানার দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে কে কে এসেছেন? তোমার মা এসেছেন?"

"হ্যাঁ—তাঁর অসুখ, তিনি মোটরের মধ্যে বসে আছেন, বেশী উঁচুতে উঠ্‌তে পারেন না। তুমি পড় না?—কি পড?"

মাথা হেলাইয়া বালিকা টপ্‌ টপ্‌ করিয়া যে বই কয়খানার নাম করিল —কিশোর বুঝিল, বিদ্যাতেও তাহারই সমপাঠী। অথচ বয়সে ছোট।

"তোমার বয়েস কত ভাই?"

বালিকা গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, "ন বছর। তোমার? দশ হবে, না? এগারো? ইস্ কক্‌খোনো নয়। নিশ্চয় মিথ্যে কথা—চল, তোমার মাকে জিজ্ঞাস ক'রে আসি।"

কিশোর হাসিতে হাসিতে বলিল, "চল।" ইতিমধ্যে বিনয় দূর হইতে ডাকিল, "কিশোর—সন্ধ্যা হলো। বাড়ী যাবেনা এবার?"

"উনি কে ভাই তোমার?"

একটু থামিয়া বাধ' বাধ' স্বরে কিশোর বলিল, "বাবা।"

মন্দির দেখার পর কিশোরকে যথেচ্ছ বেড়াইতে দিয়া বিনয় একটু একান্তে একখানা পাথরের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সেইদিকে চাহিয়া ঝর্ণা বলিল, "তাহ'লে ভালই হল—চল তো ওঁর কাছে।"

বালিকাকে কিশোরের হাত ধরিয়া অন্য দিকে ছুটিতে দেখিয়া তাহার এক ভগিনী ডাকিল, "এই ঝর্ণা, দস্যি মেয়ে—এদিকে আয়—বাড়ী যেতে হবে না?" মুহূর্ত্তে ঘাড় উঁচাইয়া দস্যি মেয়ে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "ফের্ গাল্ দেওয়া! এখুনি মামাকে বলে দেবো।"

এইবার তাহার মাতুলই সাদরে ডাকিলেন, "এসো মা, বাড়ী যাই।"

"দাঁড়ান্, যাচ্চি।" তখন তাহারা বিনয়ের নিকটস্থ হইয়াছে। অপরাধীকে যেমন টানিয়া লইয়া যায় তেমনি কিশোরের হাত ধরিয়া বিনয়ের সুমুখে দাঁড় করাইয়া দিয়া ঝর্ণা বলিল, "দেখুন তো আপনার ছেলে বল্‌চে, তার এগারো বছর বয়েস সত্যি? আমার চেয়ে দু'বছরের বড় হবেন উনি? কখ্‌খনো না। বলুন তো আপনি, ক'বছর এর বয়েস?"

বিস্মিত মুগ্ধ বিনয় বালিকার কুঞ্চিত আলুলায়িত চঞ্চল কেশগুচ্ছের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা এগারো বছরই বটে। তোমার বুঝি নয়? নাম কি মা তোমার?"

"ঝর্ণা! দেখুন, শামলংয়ে আমার মামার বাড়ী, কাল আমরা শামলংয়ের মাঠে নদীর যে পুল আছে, তারই নীচে চড়িভাতি করবো। আপনার আর আপনার ছেলের নেমন্তন্ন রইলো, বুঝেছেন? কাল বেলা নটা দশটার মধ্যেই যাবেন, সবাই মিলে আমোদ করে রাঁধ্‌তে হবে তো! তার পরে বিকেলে খুব খানিক মাঠে মাঠে বেড়িয়ে আমাদের বাড়ী গিয়ে তার পরে চলে আসবেন। বুঝলেন? নিশ্চয় যাবেন—ভুলবেন না।"

আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে বালিকা ছুটিয়া গিয়া নিজ দলের মধ্যে ভিড়িয়া গেল

মোটরে উঠিতে উঠিতেও হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে তাহাদের অনুরোধ জানাইল।

মুগ্ধ বিনয় এতক্ষণে যেন সম্বিত পাইয়া বলিল, "চল কিশোর, মামীর কষ্ট হচ্ছে একা ব'সে—আমরাও এইবার যাই।"

১২

পরদিন দ্বিপ্রহর হইতেই বিনয় প্রতীক্ষা করিতেছিল যে কিশোর এইবার হয়তো শামলংয়ের দিকে বেড়াইতে যাইতে চাহিবে তখন তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তখন যাওয়া উচিত নয়, অন্ততঃ ঝরণাদের চড়িভাতি পর্ব্ব শেষ হইয়া যাওয়াটা আন্দাজ করিয়া বৈকালের দিকে গেলেই চলিবে। কিন্তু সমস্ত দ্বিপ্রহর কিশোর যে একবারও এসম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিল না, ইহাতে বিনয় একটু বিস্মিত হইল। যে দিন ঐরূপ কোন দর্শনীয় স্থানে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব হইত, সেদিন কিশোর যে উৎসাহের আধিক্যে দ্বিপ্রহরে বিশ্রামই করিতে পারিত না। নিদ্রিতা রাজেশ্বরী দেবীর নিকট হইতে সে নিঃশব্দে বিনয়ের ঘরে পলাইয়া আসিয়া এটা ওটা নাড়িয়া চাড়িয়া সময় কাটাইত এবং বোধ হয় মনে মনে প্রতীক্ষা করিত, কখন্ বিনয় উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ করিবে। তাহার অধীরতায় সেদিন আর বিনয়ের দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম-সুখটুকু উপভোগ করা ঘটিয়া উঠিত না। দু-একবার এপাশ ওপাশ করিয়া বিনয় উঠিয়া বসিতেই কিশোর সাগ্রহে তাহাকে যাত্রাপথ সম্বন্ধে নানা প্রশ্নে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। সেস্থানটা তাহাদের বাসা হইতে কত মাইল, যাইতে কতক্ষণ লাগিবে, দিনের অবশিষ্ট সময়টুকুর মধ্যে সেস্থানের সমস্তটা ভাল করিয়া দেখা সম্ভব হইবে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নে তাহার

অধীরতার সীমা দেখা যাইত না। বিনয় সস্নেহে হাসিয়া একে একে তাহার সমস্ত ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিত যে এত আগে যাইবার কোনই প্রয়োজন নাই, যথাকালে যাত্রা করিলেও সমস্ত দেখা শোনার যথেষ্ট সময় থাকিবে। এই অসময়ে রাজেশ্বরী দেবীর বিশ্রাম-সুখ ভঙ্গ করিয়া টানাটানি করিলে তাঁহাকে অসুস্থ করিয়া তোলা হইবে মাত্র, —তখন কিশোর আর কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ দিকে যাইতে হইবে, সে দিকে দর্শন-যোগ্য আর কোন্ কোন্ স্থান আছে তাহাদেরও সবিশেষ তথ্য জানিতে চাহিত। তাহার অধীর আগ্রহের মাত্রা ক্রমেই অধিক হইতেছে বুঝিয়া বিনয় মাতুলানীকে খবর পাঠাইত—তিনি যেন একটু শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া লন্। একটু বেলা থাকিতেই ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে। কিশোর তখন লাফাইয়া উঠিয়া ভৃত্যদের ট্যাক্সি আনিতে আদেশ করিত এবং নিজের সাজসজ্জা ও রাজেশ্বরী দেবীকে তাগিদ দিবার জন্য বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া চলিয়া যাইত। তার পরে বেশ একটু রৌদ্র থাকিতেই তাহাদের ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িতে হইত।

সেই কিশোর আজ এমন লোভনীয় বিষয়েও যে ঔৎসুক্যের আভাষ মাত্র প্রকাশ করিতেছে না, ইহাতে বিনয় ক্রমেই একটু বেশী রকম বিস্মিত হইতেছিল। নিজের মনের এই অস্বস্তিটুকুতে তাহার দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামটা আজ ভালরূপে হইল না। বারে বারে চোখ খুলিয়া দেখিতে হইতেছিল কিশোর তাহাকে তাগিদ দিতে আসিতেছে কিনা—কিন্তু তাহার চিহ্নমাত্র না দেখিয়া চিত্ত নিশ্চিন্ত হইল না। বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া অগত্যা বিনয় উঠিয়া মুখ ধুইয়া [illegible] কিশোর বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসে নাই। ভৃত্যকে ট্যাক্সি আনিতে পাঠাইয়া কিশোরকে শামলং বেড়াইতে যাইবার [illegible] ডাকিয়া উত্তর পাইল—সে আজ বেড়াইতে যাইবে না। কোন অসুখ করিয়াছে

মোটরে উঠিতে উঠিতেও হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে তাহাদের অনুরোধ জানাইল।

মুগ্ধ বিনয় এতক্ষণে যেন সম্বিত পাইয়া বলিল, "চল কিশোর, মামীর কষ্ট হচ্ছে একা ব'সে—আমরাও এইবার যাই।"

১২

পরদিন দ্বিপ্রহর হইতেই বিনয় প্রতীক্ষা করিতেছিল যে কিশোর এইবার হয়তো শামলংয়ের দিকে বেড়াইতে যাইতে চাহিবে তখন তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তখন যাওয়া উচিত নয়, অন্ততঃ ঝরণাদের চড়িভাতি পর্ব্ব শেষ হইয়া যাওয়াটা আন্দাজ করিয়া বৈকালের দিকে গেলেই চলিবে। কিন্তু সমস্ত দ্বিপ্রহর কিশোর যে একবারও এসম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিল না, ইহাতে বিনয় একটু বিস্মিত হইল। যে দিন ঐরূপ কোন দর্শনীয় স্থানে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব হইত, সেদিন কিশোর যে উৎসাহের আধিক্যে দ্বিপ্রহরে বিশ্রামই করিতে পারিত না। নিদ্রিতা রাজেশ্বরী দেবীর নিকট হইতে সে নিঃশব্দে বিনয়ের ঘরে পলাইয়া আসিয়া এটা ওটা নাড়িয়া চাড়িয়া সময় কাটাইত এবং বোধ হয় মনে মনে প্রতীক্ষা করিত, কখন্ বিনয় উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ করিবে। তাহার অধীরতায় সেদিন আর বিনয়ের দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম-সুখটুকু উপভোগ করা ঘটিয়া উঠিত না। দু-একবার এপাশ ওপাশ করিয়া বিনয় উঠিয়া বসিতেই কিশোর সাগ্রহে তাহাকে যাত্রাপথ সম্বন্ধে নানা প্রশ্নে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। সেস্থানটা তাহাদের বাসা হইতে কত মাইল, যাইতে কতক্ষণ লাগিবে, দিনের অবশিষ্ট সময়টুকুর মধ্যে সেস্থানের সমস্তটা ভাল করিয়া দেখা সম্ভব হইবে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নে তাহার

অধীরতার সীমা দেখা যাইত না। বিনয় সস্নেহে হাসিয়া একে একে তাহার সমস্ত ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিত যে এত আগে যাইবার কোনই প্রয়োজন নাই, যথাকালে যাত্রা করিলেও সমস্ত দেখা শোনার যথেষ্ট সময় থাকিবে। এই অসময়ে রাজেশ্বরী দেবীর বিশ্রাম-সুখ ভঙ্গ করিয়া টানাটানি করিলে তাঁহাকে অসুস্থ করিয়া তোলা হইবে মাত্র, —তখন কিশোর আর কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ দিকে যাইতে হইবে, সে দিকে দর্শন-যোগ্য আর কোন্ কোন্ স্থান আছে তাহাদেরও সবিশেষ তথ্য জানিতে চাহিত। তাহার অধীর আগ্রহের মাত্রা ক্রমেই অধিক হইতেছে বুঝিয়া বিনয় মাতুলানীকে খবর পাঠাইত—তিনি যেন একটু শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া লন্। একটু বেলা থাকিতেই ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে। কিশোর তখন লাফাইয়া উঠিয়া ভৃত্যদের ট্যাক্সি আনিতে আদেশ করিত এবং নিজের সাজসজ্জা ও রাজেশ্বরী দেবীকে তাগিদ দিবার জন্য বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া চলিয়া যাইত। তার পরে বেশ একটু রৌদ্র থাকিতেই তাহাদের ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িতে হইত।

সেই কিশোর আজ এমন লোভনীয় বিষয়েও যে ঔৎসুক্যের আভাষ মাত্র প্রকাশ করিতেছে না, ইহাতে বিনয় ক্রমেই একটু বেশী রকম বিস্মিত হইতেছিল। নিজের মনের এই অস্বস্তিটুকুতে তাহার দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামটা আজ ভালরূপে হইল না। বারে বারে চোখ খুলিয়া দেখিতে হইতেছিল কিশোর তাহাকে তাগিদ দিতে আসিতেছে কিনা—কিন্তু তাহার চিহ্নমাত্র না দেখিয়া চিত্ত নিশ্চিন্ত হইল না। বেলা [illegible] পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া অগত্যা বিনয় উঠিয়া মুখ ধুইয়া লইয়া [illegible]নো কিশোর বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসে নাই। [illegible] ট্যাক্সি আনিতে পাঠাইয়া কিশোরকে শামলং বেড়াইতে যাইবার [illegible]ডাকিয়া উত্তর পাইল—সে আজ বেড়াইতে যাইবে না। কোন অসুখ [illegible]

কিনা জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া বিনয় রাজেশ্বরীর নিকট গিয়া শুনিল, স্বাস্থ্যের সঙ্গে একটু আগে সে রাঁচি হিলের দিকে আজ হাঁটিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। বালকের মনের বা ইচ্ছার গতি এইরূপ চঞ্চল হওয়াই স্বাভাবিক, এই তথ্য ক্রমে বিনয়ের মাথায় আসিয়া তাহার সে বিস্মিত ভাবটা শেষে কাটিয়া গেল বটে—কিন্তু ক্ষুণ্ণতাটুকু ঘুচিল না। সেই নির্ঝরিণীর মত অবাধ-গতি স্বচ্ছ সরল-হৃদয়—বুঝি তাহারই মত মধুর দর্শনা মনোহারিণী বালিকাটিকে আর একবার দেখিতে, তাহার সঙ্গে আর একটু আলাপ করিতে বিনয়েরই মনের ভিতর যে একটা আগ্রহ আসিয়াছিল, তাহা এইবার বিনয় বুঝিতে পারিল। এই সুযোগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া তাহাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার উপায়টিও যে হারাইয়া গেল! আর কি তাহার সঙ্গে কোথাও দেখা হইবে? সম্ভব নয়! মাত্র সেই কয় মুহূর্ত্তের সেই কয়টি কথা—ইহাতেই মেয়েটিকে কেন যে বিনয়ের এত ভাল লাগিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

পরদিনই বিনয় রাজেশ্বরী দেবীর নিকট হইতে হুকুম পাইল যে সে-অঞ্চলের যাহা কিছু দর্শন-যোগ্য এবং ভ্রমণযোগ্য স্থান আছে, তাহা এইবার বেড়াইয়া দেখিয়া লইতে হইবে। আর কতদিন বাড়ীঘর দেশ-ভূঁই ছাড়িয়া বিদেশে পড়িয়া থাকা চলে? বিষয়-আশয়ের কি হইতেছে তার ঠিক নাই—শরীর শরীর বলিয়া তো সর্ব্বস্ব ঘুচাইতে পারা [illegible]

[illegible] মধ্যে দুই-একদিন করিয়া বিশ্রাম লইয়া ক্ষিপ্রগতি যানে তাহারা [illegible] ও হাজারিবাগ প্রদেশের প্রসিদ্ধ জঙ্গল ও গিরিদরী [illegible] অতিবাহন করিবার আনন্দ ও বিস্ময় পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া [illegible] লইতে লাগিল। বহু পর্ব্বতশিখরমালা পার হইয়া গভীর

শালবনের ভিতর দিয়া ঘাটের পর ঘাট অতিক্রম করিয়া চক্রধরপুরে তাহারা বেড়াইয়া আসিল। রামগড় দেখার জন্য হাজারিবাগ রোড ধরিয়া দামোদর নদের জন্মস্থান হইতে সে অঞ্চলের দ্বিতীয় সুউচ্চ পর্ব্বত "ইচাদাগের" উপরিস্থ সূর্য্য কিরণ প্রবেশ-শূন্য সুগভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া মুণ্ডা গাইডের প্রদর্শিত পথে তাহারা সেই দুরারোহ পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়া তবে সন্তুষ্ট হইল। রাঁচি প্লেটোর যেখানে শেষ হইয়াছে, সেই দু-হাজার ফুট নিম্নভূমি প্লেনের অনবদ্য শোভা দেখিতে দেখিতে চুটুপালুর উপর দিয়া বায়ুগতি যানে তাহারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আবার রাঁচিতে ফিরিয়া আসিল। এসব স্থানে রাজেশ্বরী দেবী গাড়ীতে যতদূর যাইতে পারা যায় গিয়া তাহার সাধ্যমত ততদূর দেখিয়াই অগত্যা সন্তুষ্ট হইতেন—কেবল কিশোরের উৎসাহে এবং দৃঢ়তায় বিনয়কে অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াই বেড়াইতে হইত। দেশে ফিরিবার দিন স্থির করিয়া তাহারা তখন দীর্ঘ ভ্রমণের শেষ যাত্রা স্বরূপ হুণ্ডু-প্রপাত দেখিতে গেল। মোটরের গতি যেখানে স্থগিত হইয়াছে, সেখান হইতে সে যাত্রার দর্শনীয় ব্যাপারকে তো কিছুমাত্র অনুভব করিবার উপায় নাই। সেই সমতল ক্ষেত্রবাহিনী অনতিগভীরা অনতিসলিলশালিনী সুবর্ণরেখা যে কিছুদূর গিয়া—একটা বিরাট অচিন্ত্য ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে,তাহা সেই ক্রম-নিম্নপথে রাঁচি প্লেটো হইতে প্রায় অর্দ্ধেক নামিয়া আসিয়াও বুঝিবার কিছুমাত্র পথ পাওয়া যায় না। কাজেই রাজেশ্বরীকে বিনয় ও কিশোরের সঙ্গে এবার যান ছাড়িয়া মাইল দুই হাঁটিয়া কয়েকটা মুণ্ডাগাইডের প্রদর্শিত পথে যেখানে সুবর্ণরেখা হঠাৎ পা পিছলাইয়া বিচ্ছিন্ন ক্রমনিম্নপথে স্তরে স্তরে পড়িতে পড়িতে শেষে একস্থানে মিলিত হইয়া শত শত ফুট নিম্নে মহাবেগে ঘোর রোলে পড়িয়া যাইতেছে, তাহারই অদূরে গিয়া উপস্থিত হইতে হইল। এইটুকু পরিশ্রমেই অবসন্ন হইয়া রাজেশ্বরী পাহাড়ের

ধারের কাছে একটু ছায়াযুক্ত স্থানে বসিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন, "আমি বাপু আর চল্‌তে পার্‌ব না, এইখানেই আমার শেষ!" কিশোর ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "বাঃ—এইখানেই? এ তো দিব্যি ফল্‌সের কাছেই পৌঁছুতে পারা যাবে। ঐ দেখুন, কারা সব ওপরের জলের ধারাগুলো টপ্‌কে কেবল ফল্‌সের ওধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার কারা ঐ নীচে নেমে যাচ্চে। আমরাও যাব, চলুন।"

বিনয় বাধা দিয়া বলিল, "যেখানে যাবে আমার সঙ্গে চল, উনি কি পারেন! উনি এই ছায়াটুকুতেই বস্থন।" তারপর সেইখানেই একখানা কম্বল পুরু করিয়া পাতিয়া মাতুলানীকে বসাইয়া দিয়া বলিল, "এখান থেকে প্রপাতটার মোটামুটি চেহারা বেশ বোঝা যাচ্ছে। যেন নীচেটা দেখবার জন্য ধারের দিকে বেশী ঝুঁকোনো—দেখ্‌ছো তো, পাহাড়টা একেবারে খাড়া। মতির মা আর-একটা লোক রইলো তোমার কাছে, আমি কিশোরকে থামিয়ে আনি।"

তারপরে কিশোরের অনুসরণ করিয়া সেই অসমতল পর্ব্বত গাত্রে বিনয়কে প্রায় ছুটিয়াই চলিতে হইল। দুইটা গাইড্‌কে অগ্রে ও পার্শ্বে লইয়া কিশোর হরিণের মত ক্ষিপ্র গতিতে মহা বেগবান মূল ধারায় এত নিকটে উপস্থিত হইল যেখানে একটা পাথরের উপরে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে প্রায় স্পর্শই করিতে পারা যায়। সেখানে একটা সুকৃষ্ণ প্রস্তর শত শত ফুট নিম্ন হইতে প্রাচীরের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া সেই পতনশীল প্রচণ্ড জলধারাকে নিজের তমোময় গভীর গহ্বরে প্রথমটা সংগুপ্ত করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু সে জলরাশিকে সেখানে লুকাইবার সাধ্য কি! সেই কূপ হইতে মহাবেগে তাহারা বাহির হইয়া বিস্তৃত ধারায় আবার শত শত ফুট নিম্নে একেবারে পুকলিয়ার সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইতেছিল। কিশোর সেই কৃষ্ণ প্রাচীরের অত্যুচ্চ

ঈষৎ উচ্চ অপর একটা প্রস্তর-শীর্ষে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া প্রপাতটাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় তাহার জল-কণায় সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া ফেলিতেছিল দেখিয়া বিনয় তাহার হাত ধরিয়া সেখান হইতে টানিয়া তিরস্কার করিল, “কি কর্‌ছ কিশোর—পায়ের তলায় পাথরটা নড়ছে তা কি বুঝতে পার্‌চো না? অমন যায়গায় কি যায়!”

কিশোর মহা-উৎসাহে উত্তর করিল, “পড়ে তো যেতুম না, লোকটার হাত ধরে ছিলুম যে এক হাতে। চলুন না, আমরা জলটা পার হ’য়ে ওপাশের ঐ পাহাড়ে যাই! এই লোকটা আমায় পার্ ক’রে নিয়ে যেতে পার্‌বে, বল্‌লে। ঐ ধারে একটু স’রে সেই জায়গা দেখে এলেন না—যেখান থেকে এক লাফ্ দিয়ে জলটার ওপারে যাওয়া যায়, চলুন না!

“ও পাহাড়ে গিয়ে কি হবে,—দেখ্‌চ না—ওটা আরও উঁচু! মিছি-মিছি শ্রান্ত হয়ো না চল, এইবার ওদিকে ফিরে গিয়ে নীচে নেমে ফল্‌সের আসল রূপটা দেখে আসি। এই নামা আর ওঠায় বড় কম কষ্ট হবে না! একবার জলটা পার হ’তে চাও হ’য়ে নাও—তার পরে ফির্‌তে হবে।”

অগত্যা কিশোরকে তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। সেখান হইতে ফিরিয়া রাজেশ্বরীর নিকটে কিছু অনুযোগ এবং খাবার খাইয়া লইয়া তাহারা আবার নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিল।

কতদূর নামিয়া কিশোর বলিল, “দেখ্‌ছেন—কতকগুলো লোক নীচে নেমেছে। খুব নীচে একদল এইদিকে আবার উঠেও আস্‌ছে—বোধ হচ্চে না?”

বিনয়ও এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেইদিকেই চাহিতে চাহিতে নামিতে-ছিল। আরও খানিকটা অবতরণ করিয়া সহসা বিনয় বলিয়া উঠিল, “ওর মধ্যে ছোট ছেলে কি মেয়ে আছে, একটি তোমার মত—দেখ্‌ছ?

একটি [illegible] যে—সকলের আগে ছুটে ছুটে উঠ্‌ছে—ও কে, চিনতে পারছ কি?

কিশোর সচকিতে চাহিয়া বলিল, "কে—কে ও?"

বিনয় মৃদুস্বরে বলিল, "ঝরণা!"

তাহারা আরও খানিক পথ অতিবাহন করিলে বিনয় দেখিল, কিশোর সেই আরোহণ ও অবরোহণের জন্য নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথটুকু ছাড়িয়া বিপথে যাইতেই যেন চেষ্টা করিতেছে। সে ডাকিল, "অমন এলোমেলো ভাবে চলো না—এমন জায়গায় গিয়ে পড়্‌বে যেখান থেকে আর নামা চল্‌বে না। গাইডটার পথ ধ'রে চল।"

সহসা কিশোর ঘাড় ফিরাইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া বলিল, "নীচে যাব না, ওপরে ফিরে চলুন?"

অত্যুগ্র বিস্ময়ে বিনয় বলিল, "সে কি। আর তো এসে পড়েছি। আর কষ্ট কিসের! এইটুকু নেমে চল—"

"না—" বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কিশোর দৃঢ় পদে সত্যসত্যই আবার উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া বিনয় ও গাইড অত্যুগ্র বিস্ময়ে সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

ঝরণাই বটে। সেই হাস্ত-কুশলা স্বচ্ছন্দগতিশালিনী লীলাময়ী বালিকা দুই হাতে একেবারে বিনয়ের দুই হাত ধরিয়া ফেলিল। নির্ঝরের মতই স্নিগ্ধ তরল স্বরে বলিল, "আপনি! আপনার ছেলে কই? একা এসেছেন না কি? বাঃ!"

বিনয়ের তখনো বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। নিঃশব্দ সঙ্কেতে কেবল ঊর্দ্ধগতিশীল কিশোরের দিকে চাহিল মাত্র।

"ও কি! এতখানি নেমে এসে আবার পালাচ্ছে না কি! বারে ছেলে, আচ্ছা বোকা ত! দাঁড়ান আমি ধরি।"

বালিকা হরিণীর মত চঞ্চল গতিতে ঊর্দ্ধপানে ছুটিল, নিম্নে হইতে তাহার অভিভাবকদের দল হাঁকিল, "ঝরণা আস্তে, এইবার মার খাবি।"

সে কথা ঝরণা কেয়ারও করে না দেখিয়া কর্ত্তব্যবোধে বিনয়ও তখন তাহার পশ্চাতে এইবার ঊর্দ্ধগতি ধরিল। বালিকাকে পুনঃ পুনঃ থামিতে অনুরোধ করিতে করিতে অন্ততঃ একটু আস্তে চলিবার জন্য মিনতি জানাইতে জানাইতে বিনয় পর্ব্বতের তলদেশে পৌছিবার ইচ্ছা এতক্ষণে একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়া উপরে ফিরিয়া চলিল, তাহার পথ-প্রদর্শকও ফিরিল। ঝরণার সঙ্গীরা বালিকাকে সহজেই এতক্ষণ দলের সঙ্গে হাঁটাইতে পারেন নাই। এখন তাহার বিষয়ে নবাগত ব্যক্তিরা খবরদারি লইল দেখিয়া তাঁহারা বোধ হয় কতকটা নিশ্চিন্তভাবেই যেমন ধীরগতিতে ঊর্দ্ধপথে উঠিতেছিলেন তেমনই উঠিতে লাগিলেন।

ঝরণার এই ডাক-হাঁকে ঈষৎ যেন লজ্জিত হইয়াই কিশোর গতির বেগ কমাইয়া দিল! বালিকা কলহাস্য বনদেবীর সঙ্গীতের মত পর্ব্বতের গাত্রে যেন বাজিতে লাগিল। "ফিরলেন কেন? আর পেরে উঠলেন না

বুঝি! কিন্তু যেমন নামছিলে অমনি সেই মুখেই উল্টো পায়ে ফিরলে, তার চেয়েও বুঝি কষ্ট হচ্চে না? আচ্ছা বুদ্ধিমান ছেলে তো!"

আরক্তিম মুখে চলিতে চলিতে কিশোর বলিল, "ভারি ত, এতে আর কষ্ট কিসের! ইচ্ছে হ'ল না—দেখলুম না।"

"তবে এতক্ষণ ধরে নাম্‌লে কেন গো এতখানি পর্য্যন্ত? আচ্ছা মানুষ!"

কিশোর আর উত্তর দিল না, তখন বালক বালিকা দুটি প্রায় পাশা-পাশিই চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ঝরণা যেন দুঃখিতভাবে বলিল, "আহা, কেন এটুকু নেমে গেলে না ভাই? নীচে থেকে সব-চেয়ে সুন্দর লাগছে দেখতে। কত উঁচু থেকে কতটা চওড়া হয়ে জল কি শব্দ ক'রেই পড়ছে; চারদিকে যেন ধোঁয়ার রাশ! কি ঠাণ্ডা জলো হাওয়া ওখানে! আর কেমন জল ঘুরে ঘুরে তোড়ে নদী হয়ে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে যাচ্ছে।"

"আর ওপরেই বুঝি কম সুন্দর? সব্বার ওপর থেকে প্রথমে যে থাক্-টায় জল পড়ছে সেটায় নয়, তার পরের থাক্-টায় যেখানটায় সব চেয়ে মোটা ধারায় বেশী জল নীচে প'ড়ে ছোট্ট একটি পুকুরের মত হয়েছে সেইখানে পৌঁছুবার আগে পাহাড়ের ফাঁকের মধ্যে প'ড়ে তোড়ের চোটে চাকার মত ঘুরে তুলো ধোনার মত হ'য়ে যাচ্ছে, সেখানটা?"

বালিকা অবজ্ঞার হাস্যে বলিল, "ওঃ, কি যে বল! নীচে গিয়ে দেখ গে এখনো। আমরা তো এখন ওপরে গিয়ে সেই সব ছোট ধারায় নাইব, খাব, জিরুবো, তার পর বাড়ী যাব, ততক্ষণ তোমাদের কোন্‌কালে দেখা হয়ে যাবে।"

কিশোর দ্বিধায় পড়িয়া একবার দাঁড়াইল। কিন্তু কাহারো অনুরোধে

বাঁ ইচ্ছায় কার্য্য করা তাহার স্বভাব নয়। তাই তখন আবার চলিতে চলিতে বলিল, "নাঃ—ওপরেই যাব।"

"বেশ—নিজেই ঠক্‌লে, তাতে কার কি!" বালিকা ঠোঁট দুটি একটু ফুলাইয়া একটু নীরবে চলিল, তার পর আবার কলকণ্ঠে স-উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্যি ভাই! এত বড় পাহাড়টা,—অথচ ওদিক থেকে কিচ্ছু কি বুঝতে পারা গিয়েছিল! বরং ক্রমশঃ যেন নীচেই নেমে এসেছিলুম। নীচে থেকে বোঝা যায় ঠিক যে কত উঁচু থেকে জলটা পড়ছে।"

কিশোর বিজ্ঞভাবে বলিল, "রাঁচিটা কত উঁচু আমাদের দেশ থেকে, জানো? সেই জন্যেই না—"

তাহাকে অর্দ্ধপথে বাধা দিয়া বালিকা বলিল, "তা আবার কে না জানে। তোমরা তো ভারি কত দিনই বা এসেছ। আমরা আজ চার পাঁচ মাস এখানে আছি। মা আর বাবার সঙ্গে আর একবার এখানে আমি এসেছিলাম, তা জান? তাই আমার এ-সব এত জানা হয়ে গেছে। এবারে মামার বন্ধুরা এসেছেন, তাই মামার সঙ্গে আমিও এসেছি।"

কিশোর অন্য মনে বলিল, "তোমাদের সেদিন চড়িভাতি হয়েছিল?"

"হবে না আবার? খুব ধুমধাম ক'রে হয়েছিল। তোমরা কেন সেদিন গেলে না? আমি আর মামা কত খুঁজেছি। কেন গেলে না?"

কিশোর মাত্র একটু হাসিল। উত্তর দিল না।

ঝরণা আপনিই বলিল, "তোমার বাবা যেতে দেন নি, না? তাঁকে যে আমি কত ক'রে নেমন্তন্ন করলাম, তবুও তিনি গেলেন না, বেশ লোক তো তিনি। দাঁড়াও, বলছি তাঁকে।" তার পরে চারিদিকে চাহিয়া তখনি

প্রশ্নান্তর আনিয়া ফেলিয়া বালিকা বলিল, "কেবল তোমরাই দুজনে এসেছ?" তোমার মা আসেন নি?"

"এসেছেন।"

"কই তিনি? ওপরে বসে আছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"তোমাদের দেশ কোথায় ভাই? সেদিন তোমরা শামলং গেলে না দেখে আমি মোরাবাদি বেড়াতে আসতে চাইলাম—তা মামা বল্লেন—তারা কারা? কাদের সঙ্গে তোর ভাব হয়েছে? সে ছেলেটির বাবার নাম কি—কোন্ বাড়ীতে তাঁরা থাকেন, সে সব জেনেছিস্ না, শুধু কিশোর ব'লে আমাদের ঝরণার মতই বুদ্ধিমান ছেলেটি কোন্ বাড়ীতে আছে গো ব'লে বাড়ী বাড়ী খুঁজে বেড়াতে হবে?—এই সব বলে খুব হাস্ছিলেন! তোমরা কোন্ বাড়ীতে থাক আর তোমার বাবার নাম কি, বল ত ভাই। শীগ্‌গিরই আমরা আবার একদিন মোরাবাদি পাহাড়ে বেড়াতে যাব। কি ভাই তোমার বাবার নাম?

কিশোরের উত্তরের প্রতীক্ষায় ক্ষণেক থাকিয়া বালিকা আবার ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "বল্‌বে না বুঝি? আচ্ছা গুমুরে ছেলে ত! আচ্ছা ওকেই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, দাঁড়াও। আমার বাবার নাম আগে শুন্‌বে, তবে বল্‌বে বুঝি? আমার বাবার নাম মোহিনীমোহন মজুমদার। মামার নাম বল্‌ব? কিন্তু আগে তুমি বল এইবার—"

কিশোর তাহার পাংশুবর্ণ মুখ নামাইয়া জড়িত স্বরে বলিল, "নাম নন্দকিশোর রায়—"

"কার? তোমার বাবার? আর তোমাদের বাড়ীর ঠিকানা?"

কিশোর তাদের বর্ত্তমান ঠিকানা এবং দেশের নাম-ধাম সমস্তই ধীরে ধীরে ঝরণাকে বলিতে বলিতে চলিল। ক্রমে তাহারা পর্ব্বতের উপরে

উঠিয়া দাঁড়াইলে ঝরণা নিয়স্থ তাহার সঙ্গীদের একবার হাতছানি দিয়া কিল্ দেখাইয়া আদরের সহিত আহ্বান করিতে করিতে দেখিল, বিনয় তাহার মামার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে।

বালিকা প্রফুল্ল মুখে দূর বন-রেখা-নিবদ্ধ-দৃষ্টি কিশোরকে বলিল, "চল, এইবার তোমার মার কাছে যাই।" বালিকা অগ্রসর হইল; কিশোরের পা যেন ক্রমশঃ অচল হইয়া যাইতেছিল।

"ঐ যে যিনি বসে আছেন, তোমায় ডাকৃছেন, উনি কে ভাই?"

কিশোর নির্ব্বাক।

"কে উনি তোমার? তোমার বাবার কে হন উনি?"

"মামীমা।"

"বাবার মামীমা? তুমি ওকে কি বলে ডাক?"

"মা।"

"মা?" অত্যুগ্র বিস্ময়ে বালিকা বলিল,"কেন? তোমার মা কই? উনি তো বিধবা মানুষ—সাদা কাপড় যে! তুমি যার পেটে হয়েছ, তিনি কই?"

"তিনি নেই।"

"নেই?" বালিকার মুখ ক্রমে যেন সাদা হইয়া উঠিল, "মা নেই ভাই তোমার? মরে গেছেন কি?"

কিশোর দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ!"

দুই হাতে তাঁহার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া ঝরণা করুণভাবে কিশোরের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ভাই।" বালিকা হইলেও ঝরণা বুঝিতে পারিল, তাহার হাতের মধ্যে কিশোরের হাতখানি যেন ক্রমে বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া উঠিয়াছে।

"তোমার হয়তো ক্ষিদে পেয়েছে, নয়তো শীত লেগেছে। চল, ওর কাছে যাই, উনি ডাকছেন আমাদের।"

মুণ্ড দেখিয়া আবার রাত্রেই রাজেশ্বরী নিজের শরীরের অবস্থায় ব্যতিক্রম অনুভব করিলেন। সকালে বিনয়কে ডাকাইলে সে আসিয়া তাঁহার হাত দেখিয়া বলিল, "এ যে স্পষ্ট জ্বর হয়েছে মামীমা—আর তাও নিতান্ত কম বোধ হচ্ছে না।" মামীর শরীরে তাপমান যন্ত্র লাগাইয়া চিন্তিত মুখে বিনয় বলিল, "ঝরণার জলে আপনার স্নান করাটা খুবই অন্যায় হয়েছে।"

"চুপ কর তো বাছা। তোমরা স্নান করলে, কিশোর করলে; আর আমার এমনি সোনার শরীর যে তাতে গ'লে যাবে! তা যদি হয় তো এমন শরীরের একেবারে গলে যাওয়াই উচিত।"

"ওদের দলের সবাই স্নান করছে দেখে আমারও ইচ্ছা গেল বটে, তবে আপনাকে আর কিশোরকে স্নান করতে দিতে তত আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নির্ঝরিণী মেয়েটির দায়ে বাধ্য হয়ে মত দিতেই হল যে।"

রাজেশ্বরী চোখ বুজিয়া বলিলেন, "কি সুন্দর মেয়েটি! ঝরণা তো ঝরণাই বটে! তার কথা যে আমিই ঠেলতে পারলাম না। যাক্, আমার একটু জ্বর হয়েছে, সে আর এমন কি। দু-দিনেই সেরে যাবে। কিশোরকে এই বেলা কুইনিন্ টুইনিন্ যা দেবে, দিয়ে রাখো।"

কিন্তু রাজেশ্বরী দেবীর নিজের জ্বর সম্বন্ধে অগ্রাহ্য ভাবের মতটা বিফল করিয়া বৈকালে তাঁহার জ্বর এতখানি বাড়িয়া গেল যে বিনয়কে তখন ডাক্তার আনাইতে হইল। সুস্থ শরীরে সকলেই সেই শীতল সলিলে স্নানটা সহ্য করিয়া লইল; কেবল রাজেশ্বরীই পারিলেন না। বুকের কষ্টটাও আবার অনুভব করিতে লাগিলেন এবং ডাক্তারের কাছে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে একটা অতি সামান্য সূক্ষ্ম জলধারার নীচে মাথা

পাত্তিলেও তাহার পতন বেগে মাথায় ও বুকের মধ্যে সহসা বজ্রপাতের মতই একটা ধাক্কা পাইয়াছিলেন এবং সেই হইতেই বুকটা আবার ধড়ফড় করিতে সুরু হইয়াছে। যদিও ডাক্তার কোন ভয় নাই বলিল, তথাপি এই ঘটনায় মামীর এই দুই তিন মাস কালের উপকার যে আবার পিছাইয়া গেল ইহা বুঝিয়া বিনয় অত্যন্ত অনুতাপিত হইল।

এক দিন পরেই ঝরণা আসিয়া হাজির হইল। তাহার মামার বন্ধুরা সেদিন মোরাবাদি দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের পথে দাঁড় করাইয়া ঝরণা কিশোরের সন্ধানে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া রাজেশ্বরীকে শয্যাগত দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার জ্বরটা তখন একটু বেশীই হইয়াছে। বিনয় ও কিশোর তখন রাজেশ্বরীর উভয় পার্শ্বে বসিয়া ছিল। বালিকার ম্লান মুখ দেখিয়া রাজেশ্বরী কিশোরকে কাপড় জামা পরিয়া লইতে আদেশ দিলেন। কিশোর তবু সম্মত হয় না, শেষে বিনয় ও রাজেশ্বরীর নির্ব্বন্ধা-তিশয্যে অগত্যা প্রস্তুত হইতে গেলে, রাজেশ্বরী ঝরণাকে কাছে ডাকিয়া মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আমার জ্বরটা বন্ধ হলেই তোমার মার আর মামীর সঙ্গে আলাপ করতে যাব ঝরণা।"

ঝরণা ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "আর তো আমরা বেশী দিন থাকব না, বাবা শীগ্‌গিরই আমাদের নিতে আসবেন। তার মধ্যে ভাল হন তবে তো।"

"তা নিশ্চয়ই হব। নিতান্ত না হই তোমার মাকে ব'লো তাঁরা যদি দয়া করে একবার আসেন। মামী ত থাকবেনই, তাঁর সঙ্গে যত দিনে হোক্ দেখা হবে,—তোমরা যে চ'লে যাবে সেই ভাবনা হচ্ছে।"

"আচ্ছা, বলব।" সজ্জিত কিশোর ও ঝরণাকে বিনয় তাহাদের অভিভাবকদের নিকটে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। একটা হুঁসিয়ার চাকরকেও কিশোরের তত্ত্বাবধানের জন্য পাঠাইয়া দিল।

সন্ধ্যার পর কিশোর মাতার নিকটে বসিয়া ঝরণার গল্প অত্যন্ত উৎসাহের সহিত করিতে লাগিল। তাহারা দুইজনে কেমন হাত ধরাধরি করিয়া সকলের আগে পাহাড়ের উপর উঠিয়াছে, কত বেড়াইয়াছে, ঠাকুর মহাশয়দের ব্রহ্ম মন্দিরে এবং বাড়ীতেও অবাধে তাহারা বেড়াইতে পাইয়াছে। ঝরণা কেমন মহা অভিভাবিকার পদ লইয়া প্রতিপদে তাহার খবরদারি করিয়া ফিরিয়াছে—হাসিতে হাসিতে সে সব কাহিনীও উৎস-ধারার ন্যায় কিশোর মাতার নিকটে বলিয়া যাইতে লাগিল। আর রাজেশ্বরী অত্যন্ত তৃপ্ত মনে সে সব শুনিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, কিশোর যেন এমনভাবে কখনো তাঁহার সঙ্গে এত গল্প করে নাই, কোন বিষয় স্বেচ্ছায় এত আলোচনা তাঁহার নিকটে করে নাই। ছেলে এত দিনে যেন ঠিক্ ছেলের পদ লইতেছে, ইহা অনুভব করিয়া অসুস্থতার মধ্যেও তিনি পরম সুখ বোধ করিতে লাগিলেন। নিকটে বসিয়া বিনয়ও হাস্যমুখে কিশোরের বর্ণনা শুনিতেছিল। তাহাকে অনুরোধ করিলেন, কল্য বৈকালে বিনয় যেন তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া কিশোরকে লইয়া শ্যামলংয়ে ঝরণাদের বাড়ী বেড়াইয়া আসে।

পরদিন কিন্তু কিশোরের সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়া বিনয় একটু খুসিই হইল; কেন না, রোগশয্যায় রাজেশ্বরীকে ঘণ্টা কতকের মত একা রাখিয়া তাহারা দুইজনেই বাহির হইবে, এটা ইচ্ছা হইতেছিল না। বৈকালে মাতুলানী তাহাদের বেড়াইবার কথা বলিতেই সে এই আপত্তিই উত্থাপন করিল। রাজেশ্বরী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তবে মাষ্টারকে নিয়ে কিশোর যাক্ না হয়।" বিনয় ইহাতেও অসম্মতি জানাইবার পূর্ব্বেই বিস্মিত হইয়া দেখিল, কিশোর একেবারে যেন লাফাইয়া উঠিয়া তখনি "মাষ্টার মশায়, মাষ্টার মশায়" বলিতে বলিতে বাহিরে ছুটিয়া গেল, এবং কিছু পরেই সজ্জিত বেশে মাষ্টারের সঙ্গেই ট্যাক্সিতে বাহির হইয়া গেল।

রাজেশ্বরী সস্নেহ হাস্তে বলিলেন, "দুটিতে বড্ড ভাব হয়েছে কি না।"

তাহা বিনয়ও বুঝিতে পারিতেছিল ; কিন্তু তবুও যেন কোথায় আবার একটা আঘাত বাজিতেছিল। অনেক দিন—রাঁচি আসিয়া পর্য্যন্ত এ ব্যথার অনুভব যেন এক দিনও জাগে নাই, তাই নূতন করিয়া বেদনাটা একটু বেশীই বাজিল।

সেদিনও সন্ধ্যার পরে কিশোর, রাজেশ্বরীর নিকটে বসিয়া শামলংয়ের মাঠ হইতে ট্রেণ যাইতে দেখা, সুবর্ণ রেখার তীরে খেলা করা—ঝরণার কথা, তাহার বিদ্যা বুদ্ধি পরিমাণের গল্প, ঝরণা যে তাহার চেয়ে দুই বছরের ছোট হইয়াও বিদ্যায় তাহারই সমান—একটু সলজ্জ ভাবে অথচ গর্ব্ব মিশাইয়া তাহাও কিশোর মাতার নিকটে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া ফেলিল। সব শুনিয়া রাজেশ্বরী স্নেহ-হাস্তে বলিলেন, "তাহলে ঝরণাকে বৌমা করে ফেল্‌ছি, দাঁড়াও, তবে তুমি জব্দ হয়ে পড়ায় মন দেবে।"

"যাও"—বলিয়া কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইয়া তখনি আবার বসিয়া পড়িয়া বলিল, "জান মা, ঝরণার দাদাদের চেয়েও যে বড় দিদি আছে, সে একেবারে এণ্টেন্স পড়ে। এণ্টেন্স পাশ হলে সে এফ্‌-এ পড়বে, পড়ে বি-এ—"

"সে কি রে! তবে কি ওরা ব্রাহ্ম না কি? ডাক্ তো বিনয়কে, ভাল করে সব জিজ্ঞাসা করি। মেয়েদের দেখ্‌লে ঠিক বুঝতে পারতাম, আমার যে এ-ছাই জর কবে ছাড়বে, তা জানি না।"

তাঁহার এই অকারণ অধীরতার অর্থ বিনয়ও বুঝিতে পারিল না। কিন্তু জরটা তার পর দুই এক দিনের মধ্যেই অবশ্য ছাড়িয়া গেল। তবুও বিনয়কে রাজেশ্বরী সাহস করিয়া শীঘ্র বেড়াইতে যাইবার কথা বলিতে পারিলেন না, শরীরও ততখানি সবল বোধ হইতেছিল না। ইতিমধ্যে

ঝরণার মা এবং মামীই দলবলে এক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

মহা উৎসাহে আদর আপ্যায়ন চলিতে লাগিল। রাজেশ্বরী দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে ব্রাহ্মদের বিষয়ে তাঁহার যে ধারণা ছিল, ইহাদের সহিত তাহার কিছু মেলে না। তবু মনে করিলেন, আলাপ-পরিচয়ে ক্রমে সঠিক খবর পাইবেন। অভদ্রের মত মুখ ফুটিয়া তো এটা জিজ্ঞাসা করা চলে না।

ঝরণা মনের স্ফূর্ত্তিতে কিশোরের হাত ধরিয়া তাহার অন্যান্য ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিজের গর্ব্ব দেখাইতেই যেন এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল, আর তাহারাও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া এই নিছক পরের বাড়ীতে ভগ্নীটির আধিপত্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে লাগিল। কিশোরের এ্যাল্‌বমখানা টানিয়া লইয়া তাহার সংগৃহীত নানাস্থানের সুন্দর সুন্দর চিত্র সকল দেখাইতে দেখাইতে ঝরণা বলিতেছিল, "জানিস্‌, কিশোর খুব ছেলেবেলাতেই দার্জ্জিলিং গিয়েছিল। এই ছবি-কটি সেখানেরই। এ-সব জায়গা ওর ঠিক মনে না পড়লেও ও নিশ্চয় এ-সব জায়গাতেই গিয়েছে, বুঝছিস্‌?" সকলকেই এ যুক্তি মানিয়া লইতে হইল। তখন কিশোরের উপরেই ঝরণার প্রশ্নবর্ষণ সুরু হইল, "আচ্ছা ভাই, তুমি আর তোমার বাবা মাত্র দুজনে সেখানে গিয়েছিলে? তোমার এই মাও কেন যান্‌নি? অতটুকু ছোট তুমি একা বাবার কাছে থাকতে পার্‌তে?" ইতিমধ্যে তাহার এক বড় দাদা প্রশ্ন করিল, "কিশোরের অন্য মা তবে কে?" তাহাকে চোখ টিপিয়া থামাইয়া সহানুভূতিতে মুখ করুণ করিয়া স্নেহ-ভরা সুরে ঝরণা বলিল, "আহা ভাই, তখন তুমি কত রোগা ছিলে, উঃ! এই তো তোমার আর তোমার বাবার চেহারা?" তার পরে হঠাৎ যেন কি মনে পড়ায় ব্যস্তভাবে ঝরণা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, ওঁর নাম তো নন্দ-

কিশোর বাবু আর তোমার নাম ব্রজকিশোর, না ? আর মামা বল্‌ছিলেন ওঁর নাম বিনয় বাবু। ওঁর কি ভাই দুটো নাম ?" ইতিমধ্যে রাজেশ্বরী কোন পরিচারিকাকে "বিনয়কে এই কথা ব'লে আয়" এইরূপ কি একটা বলিতেছিলেন—শুনিতে পাইয়া হরিণীর মত সেইদিকে কাণ খাড়া করিয়া বালিকা বলিল, "ঐ তো উনিও তাই বল্‌ছেন। ওঁর বুঝি ডাক্‌ নাম ওটা—না ভাই ? এই যেমন আমার নাম নির্ঝরিণী,—কিন্তু সবাই বলে, ঝরণা ! দাদার নাম অজিত সবাই ডাকে জিজু, খোকার নাম মোহিত সবাই ডাকে বুলু।" আপন মনেই বকিয়া ঝরণা পাতার পর পাতা উল্‌টাইয়া চলিল, শিশু-বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিল না যে কিশোর তাহার প্রশ্নে ক্রমে যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

দলের একজন প্রস্তাব করিল, "চল, আমরা বাইরে একটু ছুটোছুটি খেলিগে।" কিশোর সাগ্রহে এ প্রশ্নের সমর্থন করিয়া ঝরণার হাত ধরিয়া টানিল—"যাই যাই, আচ্ছা ইনি কে ভাই ? বইটার সব্বার ভাল পাতায় খুব ভাল লোকের মত চেহারা, এটা কার ?"

"বাইরে যাবে তো এস" বলিয়া কিশোর তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে দলও তাহার অনুসরণ করিতেছে দেখিয়া অগত্যা ঝরণা এই ছবি দেখা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইল।

সেদিনকার আনন্দ-সম্মিলনের শেষে সকলে যখন বিদায় লইতেছেন, রাজেশ্বরী ঝরণাকে কোলের কাছে লইয়া আদর করিতেছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার শয্যার নিকটে একখানা ফটো টাঙ্গানো দেখিয়া ঝরণা সহসা কিশোরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "এইটী, এই ছবিটিই তোমার এ্যাল্‌বামের ভাল পাতাটায় আছে, না ?" তার পর রাজেশ্বরীকেই একেবারে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "ইনি কে, বলুন না ?" রাজেশ্বরী বালিকার এই অনুসন্ধিৎসু স্বভাবে হাসিয়া কিশোরের মুখপানে চাহিলেন। ভাবটা,

কিশোরই ইহার উত্তর দিবে, কিন্তু কিশোর তাহা দিতে পারিল না; নির্ব্বাকভাবে ভূমির পানে চাহিয়া বসিয়াই রহিল। ঝরণা তাহার দিকে হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাজেশ্বরীকে বলিল, "ও গুমরে ছেলে কিছুতে যদি সেই থেকে বলবে। বলুন না কার ছবি?"

এইবার রাজেশ্বরী দেবীরও মুখ ঈষৎ যেন গম্ভীর হইয়া উঠিল। গম্ভীর মুখে তিনি কিশোরের পানে কয়েকবার চাহিতেছেন দেখিয়া ঝরণার মামী এ সমস্যার সমাধান করিলেন, "কর্ত্তারই ফটো বোধ হয়, না দিদি?" তার পরে সকলেই যেন শুনাইয়া বলিলেন, "কিশোরের বাপের ছবি ওটা।"

"বাপের ছবি? না তো। ঐ তো বাইরেই তিনি রয়েছেন, ওঁর ছবি কেন হবে? তুমি তো ভারী জানো!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, যা, তোরা খেলতে যা, এইটুকু মেয়ে অথচ যেন পাকা বুড়ি। সব খোঁজ চাই ওর।" মায়ের নিকট হইতে ধমক খাইয়াও ঝরণার কৌতূহলের নিবৃত্তি হইল না। আবার ও-প্রশ্ন করিতে গিয়া বেশী-রকম তাড়া খাইয়া অগত্যা তাহাকে সেখান হইতে উঠিয়া পড়িতে হইল। দূরে সরিয়া গিয়া ইঙ্গিতে কিশোরকে সে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিল, কিশোর কিন্তু নড়িল না; বিবর্ণ শ্বেত প্রস্তর-পুত্তলির মত সেইখানেই স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। ঝরণার মা ও মামীর কথাবার্ত্তায় কিশোর তখন বুঝিল, ইহারা রাজেশ্বরীর নিকট হইতে সকল সংবাদই সংগ্রহ করিয়াছেন।

যখন সকলে বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিতেছেন, তখন খোঁজ পড়িল, ঝরণা কই? ডাকাডাকিতে বিনয়ের ঘর হইতে সে বাহির হইয়া আসিয়া যখন গাড়ীতে উঠিতেছে, তখন কিশোর তাহার পড়িবার ঘরের জানালার অন্তরাল হইতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, সে মুখ যেন বিস্ময়ে হতবাক্! যেন কেমন বিবর্ণ ঔজ্জ্বল্য-হীন! সে বুঝিল, এইবার ঝরণাও তাহার ইতিহাস সমস্ত শুনিয়াছে! যাইবার সময়ও যে ঝরণা তাহাকে

একবার খুঁজিল না, ইহাতে কিশোরের মনে হইল যে পিতা-মাতার স্নেহ-পালিতা সে, তাহার এ ব্যাপারে ঘৃণা আসাই তো স্বাভাবিক। সকলের বিদায়ের পর রাজেশ্বরীও ক্লান্তভাবে শয্যায় শুইয়া রহিলেন, কাহাকেও তখনি নিকটে আহ্বান করিতে তাঁহার ভাল লাগিল না। বিনয়ও নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল না, আর কিশোরও নিঃশব্দে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে অর্থহীনভাবে পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাষ্টারের আহ্বানে শেষে বই লইয়া বসিল।

১৫

পরদিনই রাজেশ্বরী গম্ভীর মুখে বিনয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "বিকেলে আমায় একবার শামলং যেতেই হবে। ওরা কালই এখান থেকে যাবে বোধ হচ্চে! ভদ্রলোকরা যখন এতটুকু আলাপেই আমার সঙ্গে নিজে থেকে দেখা করতে এল, তখন আমি কোন্ লজ্জায় একবার না যাই?" বিনয় একবার আপত্তি করিল, "এই সবে পথ্য করেছেন, আজই—"

রাজেশ্বরী সবেগে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমার এই সব হাড়-জ্বালান কথা রেখে দাও তো! ভারি তো অমূল্য জীবন, তার জন্যে আবার এই সব মানামানি! আর দিন-দশ পরে বাড়ীই যেতে হবে, তা জানত। তখন!"

"আরও কিছুদিন আমাদের এখানে থাকতে হবে মামীমা, নৈলে এতদিনের উদ্দেশ্য সবই বৃথা হবে। তোমার আর একটু—"

মুখ দ্বিগুণ গম্ভীর করিয়া মামীমা বলিলেন, "আমার জন্যে আর তোমাদের ভেবে কাজ নেই বাবু; আমার এর চেয়ে ভাল হওয়া ভগবান্

অদৃষ্টে লেখেন নি। মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্ব বজায় রেখে আমি এখন মানে মানে সর্‌তে পার্‌লেই বাঁচি।"

বৈকালে ট্যাক্‌সি আনিতে আদেশ দিয়া রাজেশ্বরী একবার খোঁজ লইলেন, কিশোর কোথায়। দাসী আসিয়া বলিল, "খোকাবাবু এখনো পড়্‌ছেন। মাষ্টার মশাইয়ের কথা শুনলেন না। তিনি বেড়াতে যাচ্চেন, খোকাবাবু উঠ্‌লেন না।"

"তুই চল্‌ আমার সঙ্গে।" দাসী সোৎসাহে তাহার বথ্‌শিষের তসরখানি পরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। রাজেশ্বরী বলিলেন, "কিশোর এখনো উঠ্‌লো না?" "না।" "থাক্‌।" রাজেশ্বরী গাড়ীতে উঠিতে গিয়া দেখিলেন, মাষ্টার সুসজ্জিত হইয়া সোফারের নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। বিনয় কোথায়, প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, সে কিছু পূর্ব্বে বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। এইবার তাঁহার সহ্যের অতীত অবস্থা আসিল। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া দাসীর দ্বারা মাষ্টারকে আদেশ করিলেন, কিশোরকে যেমন করিয়া হোক্‌ আনিয়া তিনি গাড়ীতে বসাইয়া দেন। এতটুকু ছেলেকে যিনি শাসন করিতে পারেন না তিনি কিসের মাষ্টার!

মনীবের আদেশটি দ্বিগুণ কর্ত্তৃত্বের সুরে যথোচিত মুখ হাত ঘুরাইয়া সচীৎকারে দাসী জাহির করিল। লজ্জিত অপদস্থ মাষ্টার বেচারী "না যাইলে রাজা বধে যাইলে ভুজঙ্গ" ভাবে অনিচ্ছুক পদেই অগত্যা কিশোরের পাঠ-গৃহের উন্মুক্ত জানালার পানে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইল। বেচারি বোধ হয় এইবার ছাত্রের দ্বারা তাঁহার শিক্ষকত্বের বাকী সম্মানটুকুও নষ্ট হইবার আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

ভগবান বোধ হয় বেচারাকে আর লাঞ্ছনা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মাষ্টার কক্ষদ্বারে পৌঁছিবার আগেই দেখিল কিশোর ধীরপদে বাহির

হইয়া গাড়ীর দিকে যাইতেছে। সকলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে দাসী আপত্তি করিল, "ওমা এই হাতে কালি মুখে কালি সাজে? না হাত মুখ ধোওয়া—না সাজ-পোষাক পরা?" কিশোর নিঃশব্দে মাতার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। কর্ত্রী আবার কিছু হুকুম করেন কি না তাহার জন্য দুচার মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া, শেষে তাঁহার কোনই আদেশ আসিল না দেখিয়া, অগত্যা মাষ্টার সোফারের নিকটে উঠিয়া বসিল এবং তাঁহাকে মৃদুস্বরে বলিল, "শামলং।"

গন্তব্য স্থানে পৌছিলে ঝরণার মা ও মাসী অত্যন্ত সমাদরের সহিত রাজেশ্বরীকে অভ্যর্থনা করিলেন। উভয় পক্ষেই সানন্দে সাগ্রহে ঘনিষ্ট আত্মীয়ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রাজেশ্বরী দেবী যে অসুস্থ শরীর লইয়াও তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ভাবে, ভবিষ্যতেও যাহাতে দুই পরিবারের মধ্যে এই দুই দিনের বন্ধুত্বও স্থায়ী হইতে পারে, এই আভাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আলাপ আপ্যায়নের মধ্যে রাজেশ্বরী সহসা এক সময় লক্ষ্য করিলেন, ঝরণা কই আগের মত তাঁহার কাছে ঘেঁসিয়া তো বসে নাই। শুধু সেই নয়—সব ছেলেমেয়েগুলিই যেন কেমন আজ তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে রহিয়াছে। কিশোর তাঁহার নিকটে নত মুখে নিঃশব্দে বসিয়া আছে, ছেলে মেয়ের দল তো কই কেহ তাহারও কাছে আসিয়া বসে নাই। তিনি এটুকু লক্ষ্য করিতেই সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ত্রীদেরও বোধ হয় সেদিকে নজর পড়িল। ঝরণার মামী ডাক দিলেন, "ঝরণা কোথায় গেলি! বন্ধু এসেছে তা বুঝি আজ মেয়ের বাড়ী যাবার আহ্লাদে বাপের সঙ্গে যাবার স্ফূর্ত্তিতে নজর হচ্চে না? কইরে জিতু, তোরা আজ কি করছিস? কিশোরকে খেলা কর্‌তে নিয়ে যা।" তার পরে কিশোরের

দিকে চাহিয়া একটু হাসির সহিত বলিলেন, "ছেলের বুঝি পড়্তে পড়্তেই উঠে আসা হয়েছে? পড়ায় খুব মন তো! বন্ধুর সঙ্গে সব তাতেই মিল্ না হলে কি বন্ধুত্ব হয়?" তার পর স্নেহের সঙ্গে তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, "আজ এত চুপ্ চাপ কেন গো? এত শান্ত-শিষ্ট হওয়া তো ভাল নয়। সেদিন এসে যে কত ছুটোছুটি দেখেছিলাম—"

রাজেশ্বরী গম্ভীর মুখে বলিলেন, "শরীরটে ওরও ভাল নেই। আন্ব নাই ভেবেছিলাম, শেষে গাড়ীতে উঠে একা আস্তে ভাল লাগ্লনা, পড়া থেকে ওকে আপনি উঠিয়ে নিয়ে এলাম। এইবার তাহলে আমরা উঠি।"

"তাও কি হয় দিদি, একটু জল না খেয়ে কি যেতে পারেন?" এই-বারে ঝরণার মাতা ও মাতুলানী নিজেদের পুত্র-কন্যাদের ধমক্ দিয়াই ডাকিলেন, "তোদের সব আজ হয়েছে কি? কিশোরকে খেলতে নিয়ে যা। ঝরণা আজ দেখছি যাওয়ার উয্যুগেই মত্ত হয়েছে, বন্ধুর দিকে আজ খেয়ালই নেই। মেয়ের যখন যে ঝোঁক ওঠে।"

এটুকু রাজেশ্বরীর কিন্তু নজর এড়ায় নাই যে, সে ঘরের দরজার বাহিরে যেখানে বালক বালিকার দল এক একবার আসিয়া তাঁহাদের উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিয়া দেখিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া আপনাদের মধ্যেই কথাবার্ত্তা করিতে করিতে অন্তরালে সরিয়া যাইতেছিল, তাহার মধ্যে ঝরণার ফুল্ল সুন্দর মুখও দুই তিনবার দেখা গিয়াছিল। ইচ্ছা করিয়াই ঝরণা যে তাঁহাদের কাছে আসিতেছে না, কিংবা আসিতে ইচ্ছা করিয়াও কোন সঙ্কোচে আসিতে পারিতেছে না, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। জিতু ও তাহাদের মামাতো ভাইবোনেরা এইবার কিশোরের নিকটে আসিয়া তাহাকে খেলার জন্য আহ্বান করিলে,

কিশোর অসম্মতি জানাইবার পূর্ব্বেই রাজেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আর কতটুকুর জন্য খেলতে যাবে, আসি ভাই আমরা তবে ?"

"সে কি, একটু মিষ্টি মুখ না ক'রে ? আমাদের সেদিন যে খাওয়ানোর চোটে গাড়ীতে বসে বাড়ীটুকু ফিরে আসাই মুস্কিল করে দিয়েছিলেন, আর আজ কিশোর এই জল খাবার সময়েই না খেয়ে চলে যাবে ? ত্যাখ তো জিতু, চা হ'ল কি না, আর তোর মামীমাকে বল্ খাবার আন্‌তে ! আপনি চলুন হাত মুখ ধোবেন, কাপড় ছাড়্‌বেন।"

গৃহকর্ত্রীর হাত নিজের হাতে লইয়া সবিনয় অনুরোধের সহিত রাজেশ্বরী বলিলেন,"আমায় ও-সব বলো না ভাই, পাড়াগাঁয়ের বিধবা মানুষ আমরা, আমাদের অনেক লেঠা জানই তো ! আর এ সময়ে আমি কখনো খাইও না, দেখ্‌ছই তো ভুগে মর্‌ছি এখনো। কিশোরকে একটু চা আর মিষ্টি দাও হাতে, আর দেরী কর্‌তে পারছি না ভাই ! শরীরটা বড় খারাপ করছে, ওষুধ খাবারও সময় ব'য়ে যাচ্ছে।"

ইহার পর আর কেহ কোন অনুরোধ করিতে সাহস করিল না। ঝরণার মাতার হস্ত হইতে চায়ের পেয়ালা এবং আহারের সজ্জিত স্থান হইতে একটা মিষ্টান্ন তুলিয়া লইয়া রাজেশ্বরী কিশোরের হস্তে দিয়া শীঘ্র খাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। সকলের সঙ্গে বিদায়ের সম্ভাষণ সারিতে সারিতে তিনি লক্ষ্য করিলেন, কিশোরের সেটুকু গলাধঃকরণ করিতেও যেন কষ্ট হইতেছে, দুই তিনবার সে বিষম খাইল। ঝরণার মাতা ও মাতুলানী কিশোরের যে ভাল করিয়া খাওয়া হইল না, সেজন্য আপ্‌শোষ করিতে লাগিলেন। মিষ্ট বাক্যে তাঁহাদের ক্ষুণ্নতা দূর করিয়া রাজেশ্বরী কিশোরের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। দুই ধারে বালক বালিকার দল চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিশোরকে আর কেহ একটু সম্ভাষণ করিবারও সুযোগ বা সাহস পাইল না।

বারান্দা হইতে নামিয়া ট্যাক্সির নিকটে পৌছিবার পূর্ব্বেই কিশোর দেখিল, বারান্দার একটা থামের গায়ে ঠেস্ দিয়া ঝরণা দাঁড়াইয়া আছে। কেমন এক রকম মুখ, উন্মনা অন্যমনস্ক, অথচ যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া। ব্যাকুলতা এবং বেদনার একটা নিগূঢ় ছায়া বালিকার স্বচ্ছ মুখের উপর স্পষ্টই ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

রাজেশ্বরীও তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু যেই ঝরণার তরল চক্ষু দুইটির দৃষ্টি আজ হৃদয়ের ভারে গভীর হইয়া তাঁহাদের দিকে নিবদ্ধ হইল, অমনি রাজেশ্বরী দেবীও যেন কি একটা নিগূঢ় অভিমানে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কিশোরের হস্ত ধরিয়া দৃঢ়পদে গাড়ীতে উঠিলেন।

সোফার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া উঠিয়া বসিতে যাইতেছে, এইবার কিশোররা দু-এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই দৃষ্টি পথের অতীত হইবে! সহসা তাহারা দেখিল, ঝরণা গাড়ীর নিকটে ছুটিয়া আসিয়া ত্বরিত ব্যগ্র কণ্ঠে বলিতেছে, "বিনয়বাবু? তিনি কবে আসবেন? কাল যে আমরা চলে যাব, তাঁর সঙ্গে তো দেখা হ'ল না?"

রাজেশ্বরী গম্ভীর মুখে চাহিয়া দেখিলেন, কিশোরও অপলক দৃষ্টিতে ঝরণার সেই ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া আছে, কিন্তু কোন উত্তর দিতেছে না। রাজেশ্বরী কিছু বলিলেন না! তাহাদের বাক্‌নিষ্পত্তি করিতে না দেখিয়া সোফার তখন গাড়ীর হ্যাণ্ডেলে হাত দিয়া ফিরাইলে, মুহূর্ত্তে ঝরণা তাহাদের দৃষ্টি পথের অতীত হইল, কিন্তু পিছন হইতে আবার সেই স্বর ভাসিয়া আসিল, "বিনয়বাবুকে বল্‌বেন—"

আর কিছু শোনা গেল না। কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া রাজেশ্বরী মনে মনে এইবার বলিলেন, "অকৃতজ্ঞ মেয়ে। আর আমরা যে তোকে এত ভালবেসেছিলাম, সে কথা তোর একবারও আজ মনে হ'ল না! মবৃতে আমি কিশোরকে এই অহঙ্কারী মেয়ের কাছে আজ নিয়ে এসেছিলাম।

কিশোর তো আস্‌তে চায় নি, ছেলে আমার মেয়েটির স্বভাব বোধ হয় বুঝেছিল।"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই অহঙ্কারী মেয়ের অন্যান্য দিনের চরিত্রটা মনে পড়িয়া তাঁহার এই মানসিক সমালোচনাটা আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র দৃষ্ট সেই ব্যাকুল-বেদনা-ভরা মুখের ছবি, সেটাও রাজেশ্বরীর মনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বালিকার এই আকস্মিক স্বভাব পরিবর্ত্তনের কারণ মনে মনে অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি এমন জায়গায় গিয়া পৌঁছিলেন, যেখানে আর তাঁহার মন নিজেই অগ্রসর হইতে চাহিল না। ঈষৎ অপমান জ্ঞানের সঙ্গে একটা নিগূঢ় বেদনাও যেন বাজিয়া উঠিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দল তারা, তারা কি এই খবরেই এত সঙ্কুচিত, এত অবাক্ হইয়া তাঁহাদের সহিত এমন নূতন ভাবে চলিতেছিল? অসম্ভব!

কিন্তু এইটাই যে সম্ভব, তাহা তিনি শিশু-চরিত্রে অনভিজ্ঞতাবশতঃ বুঝিতে পারিলেন না। যাহাদের সংসারের সকল হালই ওয়াকিব আছে, সেই বয়স্ক ব্যক্তিরাই এ ব্যাপারেও অবিকৃত মনে থাকিতে পারে; কিন্তু যাহারা এখনো সংসারের কিছুই জানে না, তাহারা যে এ সংবাদে কতখানি আশ্চর্য্য এবং আপনাদের ভিতরেই স্তম্ভিত হইয়া যায়, তাহা তাহারাই জানে। বাপে মায়ে নিজের ছেলেকে অন্যকে দিতে পারে? সে ছেলে আর তখন একেবারেই তাদের থাকে না। সেই ছেলেও তখন পরের ছেলে হ'য়ে যায়, পরকে বাপ মা বলে ডাকে? নিজের বাপ মা তখন আর তার বাপ মাই থাকে না? এই যে তাহাদের হৃদয়-ক্রিয়া-স্তম্ভনকারী চরম আশ্চর্য্য সংবাদ, এ সংবাদের আঘাতে তাহারা যে জড় হইয়া যাইতে পারে!

এতটা বুঝিতে না পারিলেও রাজেশ্বরীর অন্তরে অজ্ঞাতে একটা এমন

আঘাত আসিল যে, তিনি আর ঝরণাদের সমালোচনাটা মনে মনেও চালাইতে পারিলেন না। ছেলের পানে চাহিয়া দেখিলেন, সে যেন ঈষৎ শীতার্ত্তভাবে গুড়িসুড়ি হইয়া বসিয়াছে। নিঃশব্দে তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিজের অঙ্গাবরণের মধ্যে ঢাকিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

১৬

আরও প্রায় মাসখানেক রাঁচিতে থাকিয়া মাতুলানীর অর্জ্জিত স্বাস্থ্যের ত্রুটীটুকুর পুনঃ সংস্কার করিয়া লইয়া তবে বিনয় দেশে ফিরিতে সম্মত হইল।

ঘরে ফিরিয়া রাজেশ্বরী দিন-কতক ঘরকন্না ও বিষয়-আশয়ের দিকে এমনি ভাবে মনঃসংযোগ করিলেন, যেন এত দিনের না দেখার শোধটা তিনি সেই দিন-কয়েকের মধ্যেই পোষাইয়া লইতে চান। বিনয়কে সেজন্য সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ও ব্যস্ত থাকিতে হইতেছিল। এতদিন তো বিনয় এ-সব ব্যাপার হইতে প্রাণপণে দূরেই থাকিত, মাতুলানীর শত সাধ্য সাধনা এবং অনুযোগ কিছুতেই তো তাহাকে টলাইতে পারে নাই। কিন্তু গৃহে তাহার যে দার্ঢ্যতা এতদিন অটল ছিল, এই প্রবাস-যাত্রায় তাহার মূল পর্য্যন্ত যে নড়িয়া গিয়াছে, বিনয় এইবার গৃহে ফিরিয়া নিজেই বেশ বুঝিতে পারিল। এই প্রবাস-যাত্রার উদ্যোগ হইতে সেখানের যত যা কিছু সকলেরই যে বিনয়ই একমাত্র কর্ত্তা হইয়াছিল। মাতুলানী বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই বিনয়ের আদেশ বা ইঙ্গিতমত ফিরিয়া ঘুরিয়া একরকম অজ্ঞাতেই ধীরে ধীরে তাহাকে নিজেদের অভিভাবক পদে বসাইয়া লইয়াছিল। এখন ঘরে ফিরিয়াও বিনয়, যাহা সে কখনো হইবে না ভাবিয়াছিল, নিজের অজ্ঞাতে কখন যে সে তাহাই হইয়া বসিয়াছে, এ কথা বুঝিতে পারিয়াও নিজের

সেই প্রসারিত হস্ত-পদকে আর তো কূর্ম্মের মত পূর্ব্বস্থানে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। বরং তাহার মাণিকের সম্পত্তির কোথায় কোন্ ক্ষতি হইয়াছে বা এতদিনের তত্ত্বাবধানের অভাবে হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার ত্রুটী সংশোধনের জন্য রাজেশ্বরীর সঙ্গেই একযোগে লাগিয়া পড়িল। গৃহে এতদিন যে উদাসী হইয়াই দিন কাটাইয়াছে, দিনকতক গৃহের বাহিরে গিয়া সে পূর্ণমাত্রায় সংসারী হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাহার মাণিকের সংসার বলিয়া এ সংসারকে এখন আর তেমন বিশ্রী তো লাগিতেছিলই না, বরং ইহার শুভাশুভের উপর একটা তীক্ষ্ণ লক্ষ্য এবং ইহার উপরে একটা আসক্তি ধীরে ধীরে বিনয়ের মনে স্থায়ী ভাবে আসন পাতিতেছিল।

ধীরে ধীরে সকলেরই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল, কিন্তু পরিবর্ত্তন হইল না সেই বালকের। রাঁচির হাসি খেলা অবাধ ভ্রমণ একদিনে সমস্ত বন্ধ করিয়া আবার সেই কয়মাস পূর্ব্বের কিশোরই তাহার পাঠ-গৃহে প্রবেশ করিল। এক বৎসর পূর্ব্বে সেই যে এখানের খেলাধূলা সে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এখনো তাহার সেই স্বভাবই বজায় রাখিল। বালকের দল তাহাকে বাটী হইতে বাহির হইতে না দেখিয়া এবং কোন খেলায় সঙ্গীভাবে না পাইয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসাই ত্যাগ করিল। তাহারা বাড়ী না থাকায় বিনয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বালকদিগের ক্রীড়ার স্থান আগাছায় ভরিয়া উঠিয়াছিল এবং সেখানে তাহারা আর খেলিতেও আসিত না।

মাসখানেক পরে সহসা একদিন রাজেশ্বরীর চমক হইল, সত্য তো,—কিশোর যে রোগা হইয়া যাইতেছে, পাতের খাবার বাটির দুধ তাহার অর্দ্ধেকের বেশীই যে পড়িয়া থাকে। বিনয় যে তাহার এক্‌সারসাইজের

বন্দোবস্ত করিয়াছে, কই, তাহাতে তো কোন সুফল পাওয়া গেল না! রাঁচী হইতে মোটে একমাস তাঁহারা আসিয়াছেন—নিজে তো তিনি ক্রমশঃ মোটাই হইতেছেন—বিনয়ও এখন বেশটি হইয়াছে, কিন্তু ছেলে কেন এর মধ্যে রোগা হইল? বিনয়কে তিনি বিষয় দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাইতেছেন এবং সর্ব্বদা ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন; এদিকে আসল দিকেই যে নজর পড়ে নাই। তখনি সেকালের রাজা-রাণীর মত হুকুম ছুটিল, "ডাক বিনয়কে!"

সেকালের 'রাজার পাত্র' (মন্ত্রী) না হইয়াও বিনয়ের কপালে মাতুলানীর সমস্ত অসঙ্গত ও সঙ্গত হুকুমগুলি পালন করিতে না পারিলেও এক চোট আসিয়া ঠিকই পড়িত।

বিনয় তাঁহার অভিযোগ শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "ছেলেটিকে তো দেখছই, নিজের জেদ্ আবার দেশে পা দিয়েই মাথায় ঢুকেছে। ব্যস্ত হয়ো না—আপনিই আবার সাম্‌লে যাবে।"

"তুমি তো তাই বল্‌ছ—এদিকে রোগা হয়ে যাচ্চে যে।"

"যাক্ না, ওটুকুতে কোন ক্ষতি কর্‌বে না, একসার্‌সাইজ তো দুবেলাই করে,—নাই বা বেড়ালে!"

"তুমি বল কি? মোটে খেতে পারে না। না বেড়ালে ও ভাল থাকে না, এ আমি বেশ দেখ্‌ছি। যাও, তোমায় অন্য কিছু কর্‌তে হবে না—কিশোরকে নিয়ে বেড়িয়ে এস খানিক। বিকেলে সকালে ওকে বাড়ী থেকে খানিক বার করতেই হবে তোমায়, যেমন ক'রে পার।"

বিনয় একটু চিন্তিত মুখে বলিল, "মামীমা জান তো ওকে—"

"বেশ জানি বাছা, আর তোমাকেও বলিহারী যাই, যে, ঐটুকু ছেলেকে এত সমীহ ক'রে চল,—ওরে কে আছিস্, ডাক ত কিশোরকে।"

কিশোর ঘটনাক্রমে সেই দিকেই আসিতেছিল—মাতার রুষ্ট স্বর

শুনিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই, রাজেশ্বরী আদেশের স্বরে বলিলেন, "কিশোর, আজ থেকে তোমায় রোজ সকালে বিকেলে বিনয়ের সঙ্গে রাঁচিতে যেমন বেড়াতে তেমনি বেড়াতে যেতে হবে। এখনি বেরোও তোমরা দুজনে।"

কিশোর একটু থমকিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া বিনয় যেন অপ্রস্তুত হইয়া কৈফিয়ৎ দাখিল করার ভাবে মৃদুস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি না কি খেতে পার না—রোগা হয়ে যাচ্চ—"

বাধা দিয়া যেন বিরক্তির স্বরে কিশোর বলিয়া উঠিল, "কে বল্লে খেতে পারিনে?"

"আমি বল্‌ছি আবার কে বল্‌বে?" মাতার উত্তর শুনিয়া কিশোর আর প্রতিবাদ করিল না। বিনয় বলিতে লাগিল,—"আর মাষ্টারও বলে রোজ তুমি—"

পিতার দিক হইতে একেবারে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজেশ্বরীর পানে চাহিয়া ত্বরিত কণ্ঠে কিশোর "আচ্ছা বেড়াতে যাচ্চি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে" বলিয়া দৃঢ়পদে অন্যদিকে চলিয়া গেল। রাজেশ্বরীরও আর এমন সাহস আসিল না যে, তাহাকে এ বিষয়ে অন্য কোন আদেশ করেন, কেবল বিনয়ের সাক্ষাতে একটা গূঢ় লজ্জায় ও সঙ্কোচে তিনি একটু স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বিনয়ও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিঃশব্দে সেখান হইতে নিজ কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল।

সেই কণ্টক! না—কোথায় এ নিবৃত্তি,—এই তো সে আবার বুক জুড়িয়া খচ্‌ খচ্‌ করিতেছে। রাঁচিতে মাত্র প্রথম কয়েক মাস এ ব্যথার কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই, তার পর শেষের দিকে সে তো আবার তাহার অস্তিত্ব জানাইয়াছিল। সেই যে অমল বালিকাটি, সে তাহার অদৃষ্টের কথা শুনিয়া ব্যথায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া সমবেদনার রংয়ে বিনয়ের

অন্তরে তাহার সেই করুণ মুখখানির স্মৃতি উজ্জল করিয়া আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে শেষ দেখাটাও যে বিনয় এই ব্যথায় কাতর হইয়াই করিতে পারে নাই। কিশোর বুঝি তাহার সঙ্গও ভালবাসে না,—কিশোর বুঝি সত্যই তাহাকে—না, চিন্তা আর যে অগ্রসর হইতে পারে না!

কিসের এ সংসার, এখানের এ আধিপত্য,—কার সম্বন্ধে? একদিন ভবিষ্যতে নিজের হইবে বলিয়া এই ধনজন সম্পত্তিকে বিনয় যে চোখে দেখিয়াছিল—আজকাল যে তাহার মাণিকের বলিয়া তদপেক্ষা শতগুণ অধিক আসক্তির চোখে দেখিতেছে। ইহার এক কড়াও অপচয় সে সহিতে পারে না! নিজের চিরাভ্যস্ত জীবন ত্যাগ করিয়া এখন সে যে মাণিকের বিষয় সম্পত্তি রক্ষণে একেবারে মাতিয়াই উঠিয়াছে। বেহালা-খানাকে রাঁচি হইতে ফিরিয়া এতদিন একবার স্পর্শ করিবার কথাও যে তাহার মনে হয় নাই। মাণিক, মাণিক—সত্যই কি সে তাকে—

না না না, এ হইতে পারে না! এ যদি সত্য হয়, তো বিনয় বাঁচিবে কি করিয়া! মাণিক তাহাকে ঘৃণা করে! মাণিক তাহাকে একটুও ভালবাসে না?—এ কি সম্ভব! সে কি জানে না, সে কি শোনে নাই যে কি জন্য তাহাকে বিনয় পরকে দিয়াছে? নিজের জন্য কি! তবে কেন—তবে কেন সে এমন ভাবিবে?

ভিত্তি-গাত্রে লম্বিত পত্নীর সেই মাণিককে কোলে লইয়া উপবিষ্টা মূর্ত্তির পানে চাহিয়া বিনয় আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি বল—তুমি বল এ কি সম্ভব? আমার সেই মাণিক, তোমার সেই মাণিক, সে কি সব জানে না? তুমি তো সব জান,—বল, সে কি জানে না,—বোঝে না?"

আধিগ্রস্ত বিনয়ের মনে হইল তাহার পত্নীর শান্ত স্নিগ্ধ মুখকান্তি যেন তাহাকে সান্ত্বনা দিল—আশ্বাস দিল, যেন বলিল,"এ কি সম্ভব! আমাদের সেই মাণিক,—সে কি জানে না, বোঝে না? ভ্রম, তোমার এ ভ্রম!"

বিনয় চোখের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। হায় অভাগা, এ সান্ত্বনা যে তোমার নিজের অন্তরেরই! যতক্ষণ আশার শেষ সূত্রও না ছিন্ন হইয়া যায়, ততক্ষণ যে মানুষকে সে এমনি করিয়াই ভুলাইয়া রাখে! নহিলে মানুষ যে বহিতে পারে না,—বাঁচিতে পারে না!

উঠিয়া বসিয়া বিনয় ধীরে ধীরে ছবিখানি পাড়িয়া কোলের উপর রাখিল। দেখিতে দেখিতে মনে হইল, নিশ্চয় মাণিক বাপের সঙ্গে বেড়াইতে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য পায় না, তাই সে এমন করে। এখন সে বড় হইতেছে, এ তো স্বাভাবিক। বিশেষ সে যে জেদী আবদারে আদুরে স্বভাবের ছেলে! বিনয়ের সঙ্গে বেড়াইতে হয় তো কুণ্ঠা আসে,—স্বাধীন ভাবে চলিতে পায় না—তাহাকে একটা ভয় বা সমীহ করে বলিয়াই তাহার এ আপত্তি! এটুকুতে বিনয়ের এতখানি মনে করা উচিত নয়।

নিজের চোখ বুজিয়া তখন বিনয় ছবিখানিকে নিজের মুখের কাছে তুলিয়া, কাচের আবরণের সেই শীতল স্পর্শের উপর মুখটাকে চাপিয়া ধরিয়া, অস্ফুটভাষায় এমন কতকগুলা শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল, যাহা তাহার নিজের কাণেও পৌছিতে পারিল না। তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে কেবল 'আমার' এই শব্দটুকুই মাত্র সে নিজেও বুঝিতে পারিতেছিল।

১৭

কয় দিন হইতে রায় ষ্টেটের কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা মহা-উত্তেজনা পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদের সদর কাছারির মধ্যেই কালেক্টর সাহেব বাহাদুর শিকারের ব্যপদেশে আসিয়া ডাক্ বাঙ্গলায় আস্তানা গাড়িয়াছেন এবং গ্রামের উত্তরে যে প্রকাণ্ড বিল্ আছে, তাহাতে পক্ষী শিকার করিতেছেন। একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রয়ী শক্তির বিকাশ স্বয়ং

তাহাদের সান্নিধ্য স্বীকার করায়, তাহারা সালোক্য হইতে সাযুজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্বে কি উপায়ে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে, তাহার শত শত উপায় উদ্ভাবনে তাহাদের প্রধানদিগের মস্তিষ্ককে নিযুক্ত রাখিয়াছে; এবং অপ্রধানরা গ্রামের মধ্যে নিজেদের অধিকারের মধ্যে যে যে বস্তু সর্ব্বোত্তম, তাহাই আহরণ করিয়া প্রভুর সেবার্থে ডালি পাঠাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। কেহ-বা তাঁহার শিকারের সর্ব্বপ্রকার সুবিধার উপায়ে এবং সে সময় তাঁহার শ্রমাপনোদনের বন্দোবস্তের তদ্বিরে ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে। স্বয়ং ভগবান যদি রায় ষ্টেটে অতিথি হইতেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সমাদর বেশী পাইতেন কি কম পাইতেন, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল।

ম্যানেজার বাবু কর্ত্রীর নিকটে সাহেব সম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের এই পরিচর্য্যায় সাহেব যে বিষম সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার এই সন্তোষ শীঘ্রই যে কোন বা কোন মূর্ত্তিতে তাহাদের বালক-প্রভুর উপর বর্ষিত হইবে, সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া রাজেশ্বরীর তৃপ্তি সাধন করিতেছিলেন, অবান্তরভাবে কথাচ্ছলে বিনয়ের একটু নিন্দা করিয়া নিজের মনের ক্ষোভটাও নিবারণ করিতেছিলেন। বিনয়বাবু অন্যান্য বিষয়ে বুদ্ধিমান হইলেও এগুলি মোটেই বোঝেন না, তাই ষ্টেটের এমন একটা শুভযোগের সন্ধিস্থলেও অমন উদাসীনভাবে নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজেই নিযুক্ত আছেন। আমাদের এই ব্যস্ততাকে বরং তিনি একটু ঠাট্টাই করিতেছেন। উনিই এখন বাহ্যতঃ কিশোরবাবুর একজন অভিভাবক। স্বর্গগত কর্ত্তা এবং বর্ত্তমান কর্ত্রী দুজনেই বিনয়বাবুকে সাদরে যখন এই পদেই বরণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার উচিত নয় কি যে কিশোরের যাহাতে মঙ্গল হয় সে বিষয়ে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখেন ?—এই যে সাহেব আমার মুখে নিঃসন্তান কর্ত্তা মহাশয়ের

এই সন্তান লওয়ার খবরে খুব সন্তোষ প্রকাশ করে' কিশোরবাবু কত বড় ও কেমনটি হয়েছেন একবার দেখতে চেয়েছেন, বিকেলে তাকে নিয়ে গিয়ে সাহেবকে সেলাম করিয়ে আন্‌তে হবে তো! তা বিনয়বাবুকে বল্‌লে তিনি কি যাবেন? সেই আমাকেই হয়তো যেতে হবে, কিন্তু—

বাধা দিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "সে কি? আমি বল্‌লে আর কিশোরের দ্বারা যেটা করানো অবশ্য-কর্ত্তব্য ব'লে বুঝবে সে কাজ বিনয় নিশ্চয়ই কর্‌বে। আপনি মিথ্যা ভাবচেন। আমি বললেই বিনয় নিশ্চয় যাবে। আমি তাকে এখনি এ কথা বুঝিয়ে ব'ল্‌ছি।"

বৈকালে বিনয় নিজ কক্ষে বসিয়া তাহার বেহালাখানিকে বুকে লইয়াছিল। কিছুদিন হইতেই আবার তাহার জীবনের সঙ্গীকে মনে পড়িয়াছিল। কাজের অবসরে এই রকমে এখন সে নিজের অন্তরের অব্যক্ত ক্রন্দনকে স্বরে ঝরাইয়া ফেলিয়া আবার তাহাকে কিশোরের কার্য্যে নিযুক্ত করিত। নিজের আর তাহার, কিসের সংসার, কিসের কাজ!

সেই ইমন গাহিতেছিল, সেই উদাস গান্‌টি—

"ঘাটে বসে আছি আন্‌মনা"

* * *

দিন যায় ওগো দিন যায় দিনমণি যায় অস্তে,

নাহি হেরি বাট দূর তীর মাঠ ধূসর গোধূলি ধুলিময়।"

যখন ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার আর্ত্ত উদাস স্বরে বাজিতেছিল,

"ঘরের ঠিকানা হল না গো মন করে তবু যাই যাই—"সেই সময়ে রাজেশ্বরীর অনুরোধ আসিয়া তাহাকে মনে করাইয়া দিল, গাড়ী তৈয়ারী। এখনি কিশোরকে লইয়া তাহাকে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে।

ধীরে ধীরে বিনয় বেহালাখানিকে নামাইয়া রাখিল। গানের ভাবার ঢেউ অন্তরে তখনো উলটি পালটি করিয়া তাহার মনকে দুকূল-হারা করিয়া দিতেছিল—

"তীর হ'তে হের শত ডোরে বাঁধা আছে মোর তরীখান
রসি খুলে দেবে কবে মোরে ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।"

শত ডোর নয়—একটিমাত্র, কিন্তু তাহারই এমন সুদৃঢ় বন্ধন যে "রসি খুলে দেবে কবে মোরে" এ কথাটুকু মাত্র উচ্চারণ করিবারও ক্ষমতা তাহার কোথায়! "ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ!" মিথ্যা, মিথ্যা এ গান গাওয়া তাহার!

"ছোটবাবু পোষাক পর্‌তে গেছেন, আপনি ঠিক্ হ'য়ে নিন্—গিন্নিমা বল্‌লেন।" পুনর্ব্বার পরিচারকের দ্বারা এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বিনয় তখন উঠিয়া দাঁড়াইল।

হাঁ, যাইতে হইবে বৈ কি! কিশোরের প্রয়োজনে তাহাকে কি না করিতে হইতেছে, এখনো কি না করিতে হইবে! তাহার আর কিসের লজ্জা, কিসের ব্যথা? লোকে দেখিয়া না হয় মনে করিবে, এই একটা নির্লজ্জ হৃদয়হীন ব্যক্তি! স্বচ্ছন্দে আপনার একমাত্র ধনকে পরকে দিয়া কেমন অম্লান মুখে লোক-সমাজে আসিয়া দাঁড়ায়! এই সেই বাপ যে মজুর খাটিয়াও আপনার একটিমাত্র সন্তানকে প্রতিপালন করিতে পারে নাই, পরকে বিলাইয়া দিয়াছে। সাহেবটা হয় তো মনে করিবে, পয়সার লোভে ক্ষমতা-প্রতিপত্তির লোভেই বুঝি এ লোকটা এ কাজ করিয়াছে! নিজের একটি ছেলেকে পালন করিতে পারে না, এমন অকর্ম্মণ্য জগতে আছে, এ কথা ঐ পশ্চিমের লোকটা কখনই বিশ্বাস করিবে না। ঠিক্ বুঝিবে, এই এষ্টেটের মালিক হইবার জন্যই এই হেয় লোকটা এ কাজ

করিতেছে এবং সেই ছেলের সঙ্গে তাহার অভিভাবক সাজিয়া আসিতে ইহার লজ্জাও করে নাই!

কাপড়-জামা পরিতে পরিতে বিনয় মনে মনে হিসাব করিতেছিল, আজ কয়দিন মাণিক তাহার সহিত একটা মুখের কথাও কহে নাই। বুঝি আজ দুই দিন হইতে দিনান্তে তাহার সহিত একবার চোখোচোখিও হয় নাই! যে দু-একবার বিনয় কোন-কিছুর অছিলা করিয়া তাহার পড়ার ঘরে গিয়াছে, তখন মাণিক যেন ইচ্ছা করিয়াই মুখখানা বইয়ের মধ্যে একেবারে গুঁজিয়া রাখিয়াছে। তাহার সহিত একসঙ্গে কোথাও যাওয়া সেই রাঁচির পর এই তিন-চারমাস বাদে আজ রাজেশ্বরীর অনুরোধ ও জোর আদেশেই যে সংঘটিত হইতেছে, তাহা বিনয় বেশ বুঝিতে পারিতেছিল!

সত্যই কি তবে মাণিক তাহাকে—কি ভাবে?—কি মনে করিয়া সেগুলা করে? উভয়ের সম্বন্ধ স্মরণে আসে অথচ উভয়েই এইরূপ পর হইয়া যাওয়ার জন্য এক অব্যক্ত কষ্ট যাহা লজ্জার আকারেই আত্ম-প্রকাশ করে, তাহারই প্রভাবে কি মাণিক তাহার নিকটে আসিতে চায় না? সুমুখে পড়িলে মুখ ফেরায়? বসিয়া থাকিলে মুখ লুকায়? অথবা এ কি মাণিকের ঘৃণা—তাচ্ছিল্য—দেখিতেই না পারা? কি এ!

বিনয়ের মনে হইতেছিল, তাহার হৃদয়কে যেন একটা লৌহমুঠিতে কে সজোরে চাপিয়া ধরিতেছে! নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, শরীর দুলিয়া উঠিতেছে! ধপ্ করিয়া বিনয় একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই আদেশ,—"দেরী করবেন না বাবু, চলুন, খোকাবাবু গাড়ীতে উঠেছেন, সাহেবের সঙ্গে দেখা করার সময় নষ্ট হয়ে যাবে।"

ঠিক্! নূতন করিয়া কেন আর এ-সব চিন্তা। এ-সব সমস্যার কি সেই

একদিনেই মীমাংসা হইয়া যায় নাই—যেদিন মাণিককে সুস্থ করিতে না পারিয়া বিনয় মামীর নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়াছিল।

এক রকম টলিতে টলিতেই বিনয় সেই অর্দ্ধ-সমাপ্ত বেশে সদরে গিয়া গাড়ীর পা-দানে পা দিল। তাহার বেশ ও ভাব দেখিয়া সকলেই একটু বিস্মিত ভাবে তাহার পানে চাহিতেছিল। গাড়ীর নিকটে ম্যানেজার দাঁড়াইয়া সাহেবের সঙ্গে কিরূপভাবে কথা কহিতে হইবে, কি করিতে হইবে, সে বিষয়ে তখনো বালককে তালিম্ দিতেছিলেন। সহসা কিশোর পিতাকে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "এ কি। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না ম্যানেজারবাবু। উনি কেন ?"

ম্যানেজার কি বলিল, তাহা আর বিনয়ের কাণে গেল না, শুধু তীক্ষ্ণ বাণের মত, ছোট একটু বাজের মত, মাণিকের তীব্র কণ্ঠস্বর আবার তাহার কাণে আসিল, "মা বলুন। বিনয়বাবু গেলে আমি যাব না।"

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী হইতে ছিট্‌কাইয়া কিশোর বাহির হইয়া পড়িতেই যে একটা অস্ফুট কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল এবং খানিকক্ষণ গণ্ডগোলের পর ম্যানেজার এবং মাষ্টার উভয়ে যে কিশোরকে লইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গিয়াছে, এ-সব ঘটনা গেটের কাছে প্রস্তর মূর্ত্তির মত দণ্ডায়মান বিনয়ের যেন একটা স্বপ্নের মতই অস্পষ্টভাবে মনে আসিতেছিল। কেবল কাণে বাজিতেছিল সেই স্বর—সেই কথা কয়টি। "উনি কেন ?···বিনয়বাবু গেলে আমি যাব না।"

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই রাজেশ্বরীর মনে পড়িল, বিনয়ের কথা, সে কি করিতেছে! রাত্রে কয়েকবার খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলেন সে নিজ-কক্ষেই আছে। আহার করে নাই বোধ হয়। তবে সেজন্য তাহাকে কেহ যেন পীড়াপীড়িও না করে, সে বিষয়ে রাজেশ্বরী সকলে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। পাচক গিয়া নিঃশব্দে তাহার শয়ন-কক্ষে খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া আসিয়াছে! এরূপ মাঝে মাঝে তাহাদের করিতে হইত। কথাটা সকলে জানিলেও বিনয়ের আচরণে কোন-কিছু প্রকাশ পায় নাই। তথাপি রাজেশ্বরী কি এক অজ্ঞাত ভয়ে কেমন যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছিলেন।

খবর পাইয়া জানিলেন, বিনয় নিজের ঘরেই আছে। তখন তিনি একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া স্নান পূজা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। অন্যান্য দিনের মতই দিনের অর্দ্ধেকটা কাটিয়া গেলে, হঠাৎ তাহার কাছে তাঁহার দাসী রোহিণী আসিয়া জানাইল, বিনয়বাবু এখনো বাড়ী আসেন নাই বা স্নানাহার করেন নাই।

চমকিত হইয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "সে কি! এই যে সকালে বল্‌লি, সে নিজের ঘরে আছে!"

"তাই তো ছিলেন,—তার পর কখন বেরিয়ে গেছেন কে জানে!" ব্যাপার কি? বাহির হইতে এইটুকুমাত্র খবর পাওয়া গেল, বিনয়বাবু সকালে বেড়াইতে বাহির হন্, এখনো পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসেন নাই।

রাজেশ্বরী নিঃশব্দে অভুক্ত অবস্থায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকার

সংবাদ ক্রমশঃ ম্যানেজার প্রভৃতির কর্ণগোচর হওয়ায়, তখনি চারিদিকে লোক ছুটিল। ঘণ্টা-কয়েকর মধ্যে চারিদিকের গ্রাম ওলট-পালট করিয়া আসিয়া তাহারা সংবাদ দিল, বিনয় বাবুর সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি কোথায় গিয়াছেন কেহই তাহা বলিতে পারে না।

রাজেশ্বরী তেমনি অভুক্ত অবস্থাতেই সমস্ত দিন কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার বাক্য-রহিত অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রিয়-দাসী রোহিণীও তাঁহাকে খাইবার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিতে সাহস পাইল না; কেবল মাঝে মাঝে বলিল, "মন খারাপ হয়েছে—তাই দু-দশ দিনের জন্যে হয়ত কোন দিকে বেড়াতে গিয়েছেন, মনটা ভাল হলেই আবার ফিরে আসবেন।"

এ সম্ভাবনার কণামাত্র কিন্তু রাজেশ্বরীর মনে উদয় হইল না। যদি সে ফিরিয়াই আসিবে, তাহা হইলে এমন ভাবে কখনই যাইত না। তিনি বিনয়ের ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত ঘর হাতড়াইতে লাগিলেন, যদি সে তাঁহাকে লিখিয়া গিয়া থাকে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, তাঁহাকে বিনয় পত্র লিখিয়া যাইবে, এ কি সম্ভব! আজ বিনয়ের এ অবস্থার মূল কারণ কে? এখন তিনি বিনয়কে যতই স্নেহ দেখান, সে কি সে কথা ভুলিতে পারে? কাহার অসংযত লোভেরই এই ফল!

বিনয়ের ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া রাজেশ্বরী ভাবিতেছিলেন, আজ যদি কর্ত্তা থাকিতেন! তখনি মনে হইল, তিনি থাকিলে এ কাণ্ডের সূত্রেরও সৃষ্টি হইতে পাইত কি? এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বাপর ঘোর অনিচ্ছার কথা এবং সর্ব্বশেষ তাহার পত্নীকে শপথ গ্রহণ করানো, সমস্তই জল্ জল্ করিয়া তাঁহার মনে আগুনের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। মৃতের যদি এই মর্ত্ত্য-ভূমির সঙ্গে জীবনান্তে কোন সম্বন্ধ থাকে—ইহার সুখ-দুঃখে যদি তাহারও কোন যোগসূত্র থাকে, তাহা হইলে আজ স্বর্গবাসী স্বামী তাঁহার উত্তরাধি-

কারীর এই অবস্থা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন? রাজেশ্বরীর তো অবিদিত নাই, তিনি কাহাকে নিজ সম্পত্তির মালিক করিয়া গিয়াছেন! যদি বিনয়ের দৃঢ়তাটুকু ভগবান মাণিকের রোগ দিয়া না ভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে রাজেশ্বরীর অন্য দত্তক-গ্রহণ ক্ষমতায় কুলাইত কি! বিনয়কে ভয় দেখাইবার জন্য যে ষড়যন্ত্রই তিনি করুন, অন্য কাহারো পুত্রকে গ্রহণ করিবার শক্তি তো তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত হইত না। তাহা হইলে আজ বিনয় যে সর্ব্বস্বের মালিক হইয়া থাকিত! আজ তাহা হইলে কি তাহাকে তাহার মাণিকেরই তাচ্ছিল্যে এমন করিয়া দেশত্যাগী গৃহত্যাগী হইতে হইত!

কিন্তু কেন বিনয় এমন কাজ করিল? যাহা হইবার তা তো হইয়া গিয়াছিল, সেও তো শেষে শান্ত হইয়া তাহার শুভর্থী হইয়াই এ সংসারে আসন গ্রহণ করিয়াছিল! আজ সেই মাণিক তাহাকে অবহেলা করিলেও বিনয়ের মাতুল-দত্ত সম্পত্তির তো অভাব ছিল না! সে কেন এমন করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া চলিয়া গেল?

কেন গেল, তাহাও রাজেশ্বরীর অবিদিত ছিল না। তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ কাঠের মত হইয়া তিনি কেবল বসিয়া বিনয়ের ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন! কিছুই কি সে লইয়া যায় নাই? তাহার সাধের বেহালাখানি—সেখানিও তো ঐ পড়িয়া রহিয়াছে! মাতুল-দত্ত দ্বিতীয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত যে সে স্পর্শ করে নাই, তবে আর অন্য কিছু কি লইবে? সে যে সজোরে নিজের প্রাপ্য সম্পত্তিই দখল করিতে পারিত। তাহা যখন সে তুচ্ছ তৃণের মত ত্যাগ করিয়া গেল, তখন নিজের জীবনোপায়ের কথা কি ভাবিয়া গিয়াছে? জীবনের কথা সে আজ একেবারেই হয় তো ভাবে নাই।

গভীর রাত্রে রোহিণী দাসী আসিয়া যখন তাঁহাকে একবার "মা, খোকা-

বাবু ছট্‌ফট্ করচেন, একা বোধ হয় ঘুমুতে পাচ্চেন না, আপনি আসুন।” বলিয়া ডাকিয়াছিল, তখন অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রাজেশ্বরী উত্তর দিয়াছিলেন, “আমার যেতে দেরী হবে। তুই ঘরের মেঝের শো গিয়া।” এখন আবার প্রভাতে আসিয়া সে তাঁহাকে সেইভাবেই বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, “মা আপনার অসুখ করবে যে!”

রাজেশ্বরী অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার যেন কাহাকেও মুখ দেখাইতেও লজ্জা করিতেছিল।

দাসী আবার বলিল,“খোকাবাবু খাচ্চেন না—আপনাকে ডাকছেন যে, উঠুন।”

রাজেশ্বরী এইবার তাহার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, “আমায় ডাক্‌ছে কি ?”

দাসী এইবার আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, “মুখ ফুটে ডাকেন নি, তবে মুখ ধুলেন না—খেলেন না, উঠেই পড়ার ঘরে চলে গেলেন—বারণ কর্‌লেও শুন্‌লেন না, তাই—”

সে যে মুখ ফুটিয়া এখন তাঁহাকে ডাকিয়া বা এ সম্বন্ধে কাহারো কাছে কোন একটু কিছু দন্তস্ফুট করিবে, এমন স্বভাবই যে তাহার নয়, তাহা এই কয় বৎসরে রাজেশ্বরী বেশই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহা করিবার সে করিবে, কিন্তু সে সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার মুখে শুনিতে পায় নাই। এইটুকু-ছেলের এই দৃঢ় স্বভাবের কথা ভাবিতে রাজে-শ্বরীর অন্তর আজ ভয়ে যেন শিহরিয়া উঠিল। এত দিন এই সব ধাক্কা, এই সব আঘাত সহিবার বুঝি তাঁহার একজন দোসর ছিল! বিনয়ের অভাবে আজ তাঁহার নিজের একজন সমব্যথী গেল বলিয়া নিজেকে সংসারে একেবারে একা বলিয়া তাহার মনে হইল! এখন হইতে যাহা কিছু সে

করিবে, সব একা তাঁহাকেই বুক পাতিয়া বহন করিতে হইবে! তাঁহার কোন ব্যথার যে কিশোর কখনো অংশ গ্রহণ করিবে, এমন আশা ক্রমশঃই তাঁহার লোপ পাইতেছিল। পরের ছেলে আপন করিতে চাওয়ার এই ফল! এই যে সমস্ত রাত্রি তিনি এইভাবে এখানে পড়িয়া আছেন—সে কি কিছু জানে নাই, না, বোঝে নাই? তাহার তীক্ষবুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ অনুভব-শক্তির পরিচয় তো পদে পদেই পাওয়া যায়; তবে রাজেশ্বরীর সুখ দুঃখ আঘাত বা বেদনার প্রতি সে এত উদাসীন কেন? সে কি একবার "মা এস" বলিয়া আজ দ্বারের কাছে দাঁড়াইতে পারিত না? আর এই যে কাণ্ডটি হইল—অতখানি স্নেহময় বাপ যে তাহার ব্যবহারে এমন করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া গেল, সেজন্যও কি তাহার একবার অনুতাপ বা কষ্ট বোধ হইতেছে না? দাসদাসী লোকজনগুলা পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার কি একটু ক্ষোভও হয় নাই? তা যদি হইত তো নিশ্চয় সে রাজেশ্বরীর নিকটে আসিত! বিনয়ের যে কতখানি স্নেহ তাহার উপর ছিল, সে-ই যে বিনয়ের সর্ব্বস্ব ছিল, তাহা তো সে জানিত! যখন সেই স্নেহের কিশোর এই প্রতিদান দিল, তখন রাজেশ্বরী নিজের ভবিষ্যতের মূর্ত্তি দেখিয়া যেন দ্বিগুণ স্তব্ধ হইয়া গেলেন! এই হৃদয়হীন ছেলে কি তাঁহাকেই মানিবে? তাঁহার এই শতব্যথা শতঝঞ্ঝা-সহনকারী চিরদিনের আকুল স্নেহের আনুগত্য মানিবে?—কখনই নয়! তাহা হইলে, বিনয়ের প্রতি তাহার এ ভাব হইত না!

এবারে যখন দাসী ফিরিয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "মা, খোকাবাবুর যে জ্বর হয়েছে,—মাষ্টার মশায় নিয়ে এসে বিছানায় তাঁকে শুইয়ে দিয়ে গেলেন, তখন রাজেশ্বরী ধীরে ধীরে উঠিয়া কিশোরের শয়ন-কক্ষের দিকে চলিলেন। অন্ততঃ এমনি যা হোক একটা কিছু সংবাদ নহিলে তাঁহার পা যেন এতক্ষণ পর্য্যন্ত উঠিতে পারিতেছিল না! ছেলের জ্বর

হইয়াছে,—হউক, এই একেবারে 'কিছুই-নয়ে'র চেয়ে এও যেন প্রার্থনীয়! শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্ত বা কাল খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকার জন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়াই হয় তো কিশোরের এ জর-ভাব,—তবুও রাজেশ্বরী ইহাতে যেন একটু পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার বস্তু পাইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

৯

যেদিন বিনয়-অভাবে কিশোরের স্বভাব এবং নির্দ্দয় স্নেহহীন অন্তরের আভাস পাইয়া ভবিষ্যৎ-চিন্তায় রাজেশ্বরী দেবী চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার পরে কয়েক বৎসরই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেই যে বিনয় চলিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার আর কোন সন্ধানই মেলে নাই। অনুসন্ধানের ত্রুটি হয় নাই—অসংখ্য উপায়ও দেখা হইয়াছিল, সংবাদ-পত্রে দুই-এক বৎসর ধরিয়া "তোমার মামী" স্বাক্ষরে বিনয়ের উদ্দেশে কয়েকখানি ব্যথা-মিশ্রিত আহ্বান প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার পরে তাহার আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া পুরস্কার ঘোষণাও কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

চিরদিনের মত এখনো রাজেশ্বরী দেবীই কিশোরের এষ্টেট ও তাহার বিদ্যা-শিক্ষা এবং সর্ব্বপ্রকারের অভিভাবকত্বের ভার বহন করিয়া চলিয়াছেন। বলিতে গেলে তিনি কিশোরকে সন্তানত্বে গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত একাই এ সমস্ত করিয়া আসিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণই ছিল। চির-উদাসীন বিনয়ের সেই কয় দিন সংসারী সাজার স্মৃতি তাঁহার মনে এখনো দাগ কাটিয়া বসিয়া আছে বটে, কিন্তু তবুও তাহার অভাবে এ বিষয়ে কিছুই আটকায় নাই।

আর যে বিষয়ে তিনি সব-চেয়ে বেশী ভাবিয়াছিলেন, সেই কিশোরের সম্বন্ধে চিন্তা—এই হৃদয়হীন বালক বুঝি তাঁহারও বশীভূত হইবে না, না জানি এ কিরূপ স্বেচ্ছাচারী কি উদ্ধত প্রকৃতিরই হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে আরো কত অনুতপ্তই করাইবে—তাঁহার এই যে বিষম চিন্তা,—বিনয়ের যাওয়ার পর হইতে যাহার দংশনে তিনি মাঝে মাঝে অধীর হইয়া

উঠিতেন, সে চিন্তাও তাঁহার এখন সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনয়ের সঙ্গে সেই ব্যবহারের পর কিশোর আর এ-পর্য্যন্ত কাহারো সহিত ঔদ্ধত্যই প্রকাশ করে নাই। এমন কি দাসী-চাকরকে কখনো কটু কথা বলিয়া বেদনা দেয় নাই। রাজেশ্বরীর তো সে একান্তই বশ। বিনয় থাকিতে মাঝে মাঝে অনেক একরোখা একগুঁয়েমি প্রকাশ করিয়াছে বটে, কিন্তু বিনয়ের সেই গৃহ-ত্যাগের পর হইতে সে যেন অন্য কিশোর বনিয়া গিয়াছে। একান্ত শান্ত বিনয়ী ধীর প্রকৃতির বালকটিকে এখন যে দেখিত সেই প্রশংসা করিত। ইহাতেও কিন্তু রাজেশ্বরী মাঝে মাঝে মনে বেদনা বোধ করিতেন। হায়, তবে সেইই কি কিশোরের এত বিদ্বেষের পাত্র ছিল? তাহার সংসর্গের জন্যই কি কিশোর সর্ব্বদা এত রোষভাবাপন্ন থাকিত? সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ্বরীর মনে অনেক কথাই জমিয়া উঠিত। সেই বিনয় আর তার সেই মাণিক। কিসে এমন হইল? সেই তাহার চক্ষের মণি বক্ষের মাণিক তাহার কোন্ অপরাধে বাপকে চক্ষুশূল বোধ করিল যে তাহাকে তাড়াইয়া তবে ছেলে নিশ্চিন্ত হইল? এতদিনেও সেই নিরুদ্দিষ্ট পিতার সম্বন্ধে একটা কথা, একটু বেদনা বা একটু অনুসন্ধানের ইচ্ছাও সে কাহারো কাছে ব্যক্ত করে নাই।

এক দিন ভুলিয়াও কি সে-বাপের নাম বা তাহার বিষয়ে কোন কথা মুখে আনিতে নাই! এইটুকু বালকের এতখানি নির্দ্দয়তা—এ যেন অনন্যসাধারণ! শোনা যায় বটে যে পোষ্যপুত্রগুলা প্রায় এমনিই হয়, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও তো কত জায়গায় দেখা গিয়া থাকে। সেই কোমল শিশু কি করিয়া এমন কুলিশ-কঠোর হইয়া উঠিল!

এই তো এখনো সেই কিশোর, কিন্তু কে বলিবে যে সেই? এখন সে আঠারো বছরের যুবা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই নয়, যেদিন হইতে বিনয় গিয়াছে সেই দিন হইতেই তো তাহার চরিত্র আশ্চর্য্য রকম

বদলাইয়া গিয়াছে! কি অপরাধে বিনয়েরই উপর তাহার এত দ্বেষ জন্মিয়াছিল? অপরাধের মধ্যে তো কাঙাল বাপ্ তাহাকে রাজেশ্বর করিয়া দিয়া নিজেই কাঙাল বনিয়াছিল! অকৃতজ্ঞ সন্তানের ইহাতেই কি এমন পিতৃদ্রোহ!

কিন্তু অলক্ষ্যে তাঁহার অনুভবশীল অন্তর নিঃশব্দে আরও যেন কি তাঁহাকে শুনাইত,—তাই তিনি সমস্ত কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষে হঠাৎ এক সময় একটু শিহরিয়া নতশিরে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার মনে হইত, এমন যেন জগতে আরও অনেক ঘটিয়া গিয়াছে! এ কথা নূতন নয়। এরূপ কাণ্ডের পর সন্তানের এইরূপ পূর্ব্ব-পিতৃ-বিদ্বেষ যেন বহু স্থানেই দেখা গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কি যে একটা হয়, তাহা তাহারাই জানে; কিন্তু পূর্ব্ব পিতা-মাতাকে যে সহ্য করিতে পারে না, ইহা একটা বহু-পরীক্ষিত সত্য। এ কথা তিনি কি কখনো শোনেনেই নাই? শুনিয়াছিলেন বৈ কি, কিন্তু কিশোরকে পাইবার জন্য তাঁহার সেই উন্মত্ততার সময়ে এ তথ্য চোখ মেলিয়া দেখিবার শক্তি তাঁহার ছিল না! স্বামী দেখিয়াছিলেন, তাই শত প্রকারে বাধা দিয়াও পত্নীকে এই সাংঘাতিক বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা তখন বিনয়ের জন্যও স্বতন্ত্র সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন যে রাজেশ্বরী যাহা ভাবিতেছেন তাহা হইবে না! বিনয়ের অদৃষ্টে অনেক কষ্টই আছে!

কিন্তু এতটা বোধ হয় তিনিও ভাবিতে পারেন নাই। বিনয় যে মাণিকের বিনিময়ে জগতের কিছুই গ্রহণ করিবে না, এতখানি বোধ হয় তিনিও জানিতেন না। জানিলে হয় তো পত্নীকে শেষ অনুমতিটুকুও দিয়া যাইতেন না। কিশোর হয় তো জানে না, রাজেশ্বরী তো জানেন, মাণিকের ব্যারামে বিধাতা যদি বিনয়কে বিচলিত না করিতেন, তাহা হইলে

আজ এ সম্পত্তি আর ঐ মাণিক সবই বিনয়ের থাকিত! যাহার এই সর্ব্বস্ব, সে আজ কোথায় ভিখারী হইয়া বেড়াইতেছে! এবং ইহার একমাত্র কারণ রাজেশ্বরী নিজে!

মানুষের বিবেক মানুষকে অনেক সময় এমন অনেক জ্ঞান এবং দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু দুর্ব্বল মানব কতক্ষণ সে কথা কাণ দিয়া শোনে বা সে চোখ দিয়া দেখে? দেখিবার শক্তি যে তাহার নাই! সে সত্যকে সহ্য করিবার শক্তি তাহার কোথায়? তাই তখনি সে মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র সরিয়া যায়! রাজেশ্বরীরও তাহাই হইত। বিবেকের এ কশাঘাতের সম্মুখে তিনি বেশীক্ষণ দাঁড়াইতেই পারিতেন না; তখনি তাঁহার সাজানো সংসারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। এখন তাঁহার সেই সুখের সময় আসিয়াছে, যাহার চিন্তায় তিনি বহুকাল হইতে তৃষিত আছেন। শত ঝঞ্ঝা সহিয়াও ইহার বাসনায় এমন করিয়া জগতের নিকট হইতে সন্তান আদায় করিয়াছেন! ভগবান দেন নাই, উপায় কি—এ নিরুপায় নৈরাশ্যকে চেষ্টার দ্বারা সরাইয়া তিনি পুত্রহীনা নাম ঘুচাইয়াছেন। তাঁহার কিশোর এখন তাঁহার একান্ত-বশ্য সুসন্তান। সর্ব্ব বিষয়েই তাহার সুযশ—বিদ্যা-মন্দিরেও কিশোর দিন দিন নব কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছে। আর তিনি অতৃপ্ত চক্ষে তাঁহার এই ক্রমবর্দ্ধনশীল দিব্য কান্তির দিকে চাহিয়া ভাবিতেছেন যে, এইবার তাঁহার কিশোরের একটি বৌ আনিতে পারিলেই সংসারটি সাজন্ত হইয়া উঠে! সঙ্গে সঙ্গে নাতি নাতিনীর মধুর চিত্রগুলি তাঁহার শেষ বয়সের সমৃদ্ধি সূচনা করিয়া মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হইত। রাজেশ্বরী ইতিমধ্যে দু এক জায়গায় সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যার সন্ধানও লইয়াছেন; কিন্তু তাহাতে পুত্রের এত বেশী নিরুৎসাহী ও অবসাদপূর্ণ ভাব দেখিয়াছেন যে, সেদিকে তাঁহার আর বেশী অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হয় নাই। মনে করিয়াছেন, থাক্, তবে আরও কিছু দিন যাক্। ছেলের অন্তরের

কিশোরত্ব ঘুচিয়া সেখানে যেদিন যৌবনের আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেদিন ছেলে এ বিষয়ে নিজেই আগ্রহশীল হইয়া উঠিবে। এখন সে তবে আরও কিছুদিন বালক কিশোরের বেশে তাঁহার কোলের কাছেই থাকুক।

২

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বাড়ী আসিয়া কিশোর পরীক্ষার উদ্বেগের অবসরে শান্তি-সুখ উপভোগ করিতেছিল। আর রাজেশ্বরী ভাবিতেছিলেন, আর কেন, এইবার মনের মত বৌ আনিয়া সংসার সাজাইয়া ফেলি। ছেলে উনিশ বৎসর অতিক্রম করিল, তিনটা পাশ দিল, ছেলেরও আর কিছু আপত্তি থাকিতে পারে না। পরীক্ষায় এবারও যে সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি তখন তাঁহার দূরস্থিত আত্মীয়-স্বজনকে সুন্দরী এবং সদ্বংশজাতা কন্যার সন্ধান দিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পূর্ব্বে অনেক সম্বন্ধই আসিয়াছিল—এখন হইবে না বলিয়া তাহাদের নিরাশ করিয়াছেন; এখন তাহারা কেহ আশায় আছে কি না এবং তাহাদের বংশ এবং কন্যা কিরূপ—আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তাহার আলোচনাতেও প্রবৃত্ত হইলেন।

বিনয়কে কি আজ তাঁহার মনে পড়িতেছিল না? সর্ব্ব কাযেই পড়িতেছিল; কিন্তু কোন উপায় তো নাই। আজ প্রায় আট বৎসর সে চলিয়া গিয়াছে—কোন উপায়ে তাহার সামান্য খোঁজটুকুও তো পাওয়া যায় নাই। রাজেশ্বরীর মনে অলক্ষ্যে একটা আশা জাগিতেছিল যে, কিশোরের বিবাহের কন্যা ও দিন স্থির করিয়া একবার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া দেখিবেন, যদি সেই উপলক্ষে বিনয় তাহার মাণিককে ও তাহার

বধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসে। কিন্তু সব চেয়ে প্রধান কথা—সে বাঁচিয়া আছে তো! কপর্দ্দক-হীন অবস্থায় পথে বাহির হইয়া সেই চিরসুখ-লালিত বিনয় কিরূপে আপনার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, না জানি। নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছে ত? অথবা অনাহারে নিরাশ্রয়ে কিই না জানি তাহার হইয়াছে।

গ্রীষ্মের তখন মধ্যভাগ। দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম সুখ একেবারে যেন অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে। দরজা জানালার খস্‌খসের পরদায় মাঝে মাঝে জল ছিটাইয়া এবং ঘরের মধ্যে অনবরত টানা পাখার হাওয়া বসাইয়াও সে বাতাস স্নিগ্ধ হইতেছিল না। রাজেশ্বরীর মনের মধ্যেও উত্তেজনার একটা প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিতেছিল, যাহার প্রভাবে তিনি বেশীক্ষণ আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। ঘুম সেদিন এক রকম আসেই নাই। বহু কন্যাপক্ষদিগকে অনর্থক দুরাশা হইতে ক্রমে নিরাশায় ফেলিয়া এতদিনে তাঁহার মন একটি কন্যাকে তাঁহার তরুণ অরুণের মত সুন্দর কিশোরের উপযুক্ত বলিয়া মনে ধরিয়াছে। এই ধারণা জন্মিবামাত্র তিনি ধৈর্য্য ধারণে অক্ষম হইয়া পড়িতেছিলেন। সেদিন দ্বিপ্রহরের নিদ্রাটুকুও আর তাঁহার ঘটিয়া উঠিল না। কিশোরের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষায় এতক্ষণ কষ্টে শয্যায় পড়িয়া ছিলেন,—তিনটা বাজিতেই উঠিয়া কিশোরের ঘরের দিকে চাহিলেন।

পাখা চলিতেছে। ঘর নিস্তব্ধ দেখিয়া ভাবিলেন, তবে কিশোর বুঝি এখনো ওঠে নাই! ফিরিয়া যাইতে যাইতে ফাঁক দিয়া গৃহের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন, ঘরের কোন জানালা খোলা আছে—কিশোর জাগিয়া হয় তো কিছু পড়িতেছে। আঃ, ছেলের কোন কাণ্ড-জ্ঞান নাই, এই রৌদ্রেও জানালা খোলে! তাহা হইলে ঘর কিসে ঠাণ্ডা হইবে! ধীরে ধীরে আল্‌গা দরজা খুলিয়া রাজেশ্বরী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া

দেখিলেন, খাটের নিকটেরই জানালাটা খুলিয়া দিয়া কিশোর উপুড় হইয়া পড়িয়া নিবিষ্ট মনে একটা কাগজ দেখিতেছে। দূর হইতেই তিনি বুঝিলেন, ওটা খবরের কাগজ। কিশোর এতই নিবিষ্ট চিত্তে সেদিকে চাহিয়া আছে যে, তাঁহার গৃহে প্রবেশ বা পালঙ্কের নিকটে উপস্থিত হওয়া কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। রাজেশ্বরী যখন একেবারে পুত্রের পার্শ্বে পালঙ্কের উপরে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "কি দেখ্‌ছিস ?" কিশোর তখন চমকিত হইয়া মুখ তুলিল। রাজেশ্বরী কতকটা শিক্ষিতা ছিলেন। বাংলা লেখা-পড়া বেশ ভালই জানিতেন, এবং ইংরাজিরও অক্ষর-পরিচয়, যথা—চিঠির শিরোনামা বা ছাপার কাগজের মোটামুটি বিষয়গুলা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন; তাই কাগজখানার দিকে নজর পড়িতেই তিনি তখন একটু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কিরে তোর বি-এর খবর বেরিয়েছে না কি ?"

কিশোর তখন মাথা নামাইয়া উত্তর দিল, "না মা।"

"না কি রে,—এই তো! ও, বি-এর খবর নয়, ইণ্টার-মিডিয়েট, তোদের আই-এ বুঝি, না? তোর কোন বন্ধু আই-এ দিয়েছে বুঝি ? ঐ যে খুব মোটা লাল দাগ দিয়েছিস্‌! প্রথম দিকেই নাম যে। তোর মতই খুব ভাল পাশ হয়েছে, দেখ্‌ছি—না? নামটা—"নির্ঝরিণী মজুমদার, বেথুন কলেজ।"—একরাশ বিস্ময় লইয়া রাজেশ্বরী পুত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে একভাবেই মাথা নামাইয়া কাগজখানার দিকে চাহিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে নিজের সেই প্রভূত বিস্ময় সবলে দমন করিয়া সহজ কণ্ঠে রাজেশ্বরী কিশোরকে প্রশ্ন করিলেন, "কে রে মেয়েটা ? তোর কি জানা-শোনা ?"

"হ্যাঁ, আর তোমারো ?"

"আমারো ? আমিও তাকে জানি ? কে রে ?"

"রাঁচির সেই ঝরণা।"

"ঝাঁচির ঝরণা ? সেই পরীর মত মেয়েটুকুন্,—তারই এত সাধ্যি ? বলিস্ কি ?"

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া রাজেশ্বরী আবার সহজ স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "সেই ঝরণা, তুই কি করে জান্‌লি ?"

মাথা নামাইয়া মৃদু হাসিয়া কিশোর বলিল, "আমি জানি।" ছেলের সেই মৃদু হাস্য-রঞ্জিত তরুণ সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে রাজেশ্বরী বলিলেন, "তাহলে তোর সঙ্গে তার আলাপ আছে—জানাশোনা আছে ?"

"না।"

"না ? তোর সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাশোনা আলাপ নাই থাক্, পরোক্ষে জানাশোনা একটুও তো আছে ! নইলে কি করে বুঝ্‌লি, সেই ঝরণা ?"

ধীর মৃদুকণ্ঠে কিশোর বলিতে লাগিল, "আমি যখন আই-এ পাশ করি, তখনো এই নামে একজন বেথুনের মেয়ে ম্যাট্রিকে ইউনিভারসিটিতে সেকেণ্ড্ হয়ে পাশ হয়েছে দেখেছি,—আবার এবার এই দেখ্‌তেই পাচ্চ !"

বিস্ময়ের আবার একটা ধাক্কা কাটাইয়া সহসা সবেগে রাজেশ্বরী বলিয়া উঠিলেন, "তাতেই তুই মনে করেছিস্ সেই ঝরণা ? পাগ্‌লা কোথাকার ! নির্ঝরিণী মজুমদার কি আর কোন মেয়ের নাম থাকৃতে পারে না ?"

"পারে, কিন্তু এ নির্ঝরিণী সেই ঝরণা। তারাও মজুমদার ছিল। তাদের বাড়ীর মেয়েদের এই রকমেই শিক্ষিতা করা হয়। তার বড় বোন বেথুনে পড়ে পাশ দিয়েছে, তখনি তো শুনেছিলে। আর বছর-খানেক হল একদিন আমি তাকে দেখেছি। বেথুনের বোর্ডিংয়ের দুয়োরে একটা ঘরের গাড়ী দাঁড়ালো আর সেই ঝরণারই মত দেখ্‌তে একটি বড় মেয়ে, সঙ্গে আরও ছোট-বড় কজন মেয়ে নাম্‌লেন। কে-একজন যেন ঝরণা নামটাও বল্লেন।"

পুত্রের আরক্তিম আনত মুখের পানে চাহিয়া রাজেশ্বরী গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আট বছরের কথা—কতটুকু তখন তোমরা। এ বাপু তোমার মনের একটা ভুলও হতে পারে তো!"

"পারত যদি না আমি আর একটু বেশী জান্‌তে পারতাম। সেদিন আমি নিজের দরকারে তখনি চলে যাই। আবার একদিন সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেইখানে সেই গাড়ীখানাকে খালি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করি, সেখানা মোহিনী বাবুর গাড়ী কি না? সহিস বল্লে—হ্যাঁ, তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা বোর্ডিংয়ে বেড়াতে এসেছেন।"

"ঝরণার বাপের নাম কি মোহিনীবাবু? মজুমদার?"

"হ্যাঁ—তুমিও তো শুনেছিলে। ভুলে গেছ?"

রাজেশ্বরী মনে মনে একটু হাসিয়া ভাবিলেন, বাপু তোমাদের মত এ-সব বিষয়ে স্মৃতিশক্তির জৌলুস্ কি আমাদের হইতে পারে! তার পর কি ভাবে কথাটাকে আরও অগ্রসর করিতে পারেন, তাই একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "তা যদি সেই ঝরণাই ঠিক্ বুঝেছিলি, তাদের বাড়ী গিয়ে একটু আলাপ-পরিচয় করিস্‌নে কেন এ পর্য্যন্ত?"

মাতার পানে এইবার মুখ তুলিয়া সহজভাবে কিশোর উত্তর দিল, "কি যে তুমি বল মা! তা কি করে সম্ভব হবে। বলা নেই, কওয়া নেই, অমনি একদিন হুড়মুড় ক'রে তাঁদের বাড়ী গিয়ে, আমি সেই রাঁচির কিশোর গো—বল্‌লেই কি হল? পাগল ভাববেন নাকি তাঁরা?"

"এর আবার পাগল কি? পুরোনো জানাশোনা থাকলে বহুকাল পরেও কি এমন লোকে যায় না?"

"কিই বা এমন বেশী জানাশোনা ছিল? তাঁদের হয়তো মনেও পড়্‌বে না। আর যদিই বা পড়ে—দরকার কি তাতে?"

"তাই বল্। নইলে তোর যখন মনে আছে, তখন তারই বা থাক্‌বে

মা কেন! বিশেষ যে অসাধারণ মেয়ে দেখ্‌ছি—নিশ্চয় সেও আমাদের ভোলেনি। তুই গিয়ে দেখ্‌লিনে কেন?

কিশোরের শুভ্র সুন্দর মুখ আবার আরক্ত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ যেন ঈষৎ স্ফুরিত হইল—মাতাকে কি যেন একটা বলিবে। রাজেশ্বরী প্রতীক্ষাপূর্ণ নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে কিশোরের এমন একটা ভাবান্তর আসিয়া গেল যে, দেখিয়া আবার তিনি বিস্মিত হইলেন। মুখ যেন একেবারে রক্তলেশহীন,—কাগজের মত সাদা, ঠোঁটদুটি নীল। যে চক্ষু কিসের একটা আলোক-পাতে হীরার মত জল্ জল্ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছিল, সে চক্ষু তখনি নিষ্প্রভভাবে অবনত হইয়া গিয়াছে। রাজেশ্বরী তাঁহার বিস্ময় এবার দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি রে, তারা কি অজাত্? ব্রাহ্ম না আর কিছু?"

বহুদূর হইতে যেন কিশোর উত্তর দিল, "তা তো আমি জানিনে মা, আর জেনেই বা কি হবে? তাঁরা যাই হোন্, আমি যা তাই তো। অন্যের পরিচয়ে আমার কি দরকার? আমার পরিচয়—" বলিতে বলিতে সহসা নিস্তব্ধ হইয়া কিশোর অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

"তোর আবার পরিচয় কি! তোকে যদি তাদেরও মনে থাকে তোর পরিচয়ও তাঁদের মনে পড়বে। না পড়ে, আবার আলাপ করলেই জান্‌তে পারবেন। আমি তো একবার কালীঘাটে পূজো দিতে যাবই,—তোর যেতে লজ্জা হয়, আমায় একবার তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিস্। আমি জানি, এখন শিক্ষিত হিন্দু সমাজেও মেয়েদের এরকম লেখা-পড়া শেখায়—তাদেরও তখন আমার সেই রকমই বোধ হয়েছিল, কিন্তু দেখতে হবে বাপু, অজাত্ না হয়।"

"মা তুমি কি বল্‌ছ! আলাপ করতে চাও, কর—মোহিনীবাবু

আলিপুরের জজ। তাঁর বাড়ী খুঁজে বার করা এত বেশী শক্ত হবে না! কিন্তু জাত্-অজাত্—ও-সব কথা কেন আন্‌ছ? তাঁরা ব্রাহ্ম কি শিক্ষিত হিন্দু, সে খবরে আমাদের দরকার?"

মৃদু হাসিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "দরকার আছে কি না সে পরে দেখা যাবে। এখন এম-এ পড়তে তুই কল্‌কাতায় কবে যাবি, বল্?"

"দাঁড়াও মা, আগে পাশই হই।"

"ঝরণা এমন পাশ হয়েছে, আর তুই ফেল্ হবি—এ কথা ভাব্‌তে লজ্জা করে না তোর?"

কিশোর সহাস্যে বলিল, "কি জানি, বলা তো যায় না।"

৩

রাজেশ্বরীর ভবিষ্যৎবাণীই সফল হইল। ইহার দিন কয়েক পরেই গেজেট বাহির হইলে সকলে দেখিল, কিশোর সম্মানের সহিত বি-এস্‌সি পাশ করিয়াছে। রাজেশ্বরী হাসিয়া পুত্রকে বলিলেন, "কেমন?" কিশোর মৃদু হাসিয়া মুখ নামাইল। তিনি বলিয়া চলিলেন, "যাক্, আমারো বুক থেকে একটা পাহাড় নাম্‌লো। তোকে মুখে ভরসা দিয়েছি, কিন্তু আমারো মনে এবারে ভয় জেগেছিল, কি জানি কি হয়। তোর বিষয়ে এমন ভয় কখনো কিন্তু আমার হয়নি।"

কিশোর সকৌতুকে মাতার পানে চাহিয়া বলিল, "এবার যে হলো মা?"

"কি জানি! হয় তো ঐ দস্যি মেয়ের কাণ্ড দেখে। ও অনার নিয়ে স্কলারশিপ নিয়ে অমন ক'রে পাশ হচ্চে—আর তুই পাছে ওর কাছে হেরে যাস, এই আমার বড় ভয় হয়েছিল। তোর সে কথাও নিশ্চয় মনে আছে,

দু'বছরের ছোট হয়েও ঝরণা তোর সঙ্গে সমানে টক্কর দিত, বরং এক এক জায়গায় উঁচিয়ে যেত! মনে পড়ে?"

কিশোর মাথা হেঁট করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "পড়ে বৈ কি মা।"

"তাই বুঝি, সেই রাঁচি থেকে ফেরার পর অত বদ্‌লে গিয়েছিলি। ছেলের কি পড়ায় মন! ক' বছর ইস্কুলে ডবল প্রোমোশন পেয়ে তাই বাপু তুমি ঝরণাকে এ দু'বছর এগিয়েছ! নৈলে তোমার ওর সঙ্গেই আজ আই-এ পাশ কর্‌তে হতো, নয় কি?"

"সেই ভয়েই তো আরও অস্থির হয়ে থাকতাম। এই ক' বছর থেকে কেবলই পরীক্ষার কাগজ আর গেজেট খুঁজতাম, যদি ওর নাম দেখ্‌তে পাই!"

"আচ্ছা, মনে কর, যদি ও পড়্‌তে না পেতো,—পাশ না কর্‌তো কিংবা বিয়ে হয়ে যেত ওর—তা'হলে ত পদবী বদ্‌লে যেতো! তাহলে কি করে চিন্‌তিস্?"

কিশোর সোৎসাহে বলিল, "সে আমার মনই বলতো যে এমন কখনোই হবে না। ওর দিদিকেও যে এই রকম পড়ানো হয়েছে—শুনেছিলে,—মনে নেই? যে বাড়ীর এ-রকম রীতি, সে বাড়ীতে কি একটি মেয়েকে কৃতবিদ্য ক'রে আর-একটিকে মূর্খ রেখে দ্যায়? বিশেষ ঝরণার মত মেয়েকে! তখনি ওদের কথা-বার্ত্তায় বুঝতাম, ছেলেদের মত ওদের মেয়েদেরও পড়ানোটাই অবশ্য-করণীয়। খেলা-ধূলা, সংসারের অন্য সব—তার পরে।"

"এখন তাহ'লে ঝরণার বয়স সতেরো পূর্ণ হয়েছে। তুই যেমন কুড়ি বছরে পড়্‌লি সেও তেমন আঠারোয় পড়েছে। আমাদের ঘরে এমন কত হয়। যাক্, তুই এখন এম-এ পড়ার ব্যবস্থা কর্‌তে কবে কল্‌কাতা যাবি, বল্ দিকি? আমিও যাব কিন্তু তোর সঙ্গে এবার। তার পরে—"

কিশোর মাতাকে বাধা দিয়া বলিল, "সে না হয় করা যাবে—বাসা তো আমাদের আছেই, তুমি কিছু দিন গেলে তো ভালই হয়। এর আগে কতবার বলেছি, তুমি রাজী হওনি। কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কিরে? এবারে নিজে থেকে বল্‌ছি বলে বুঝি ছেলের গুমোর হচ্ছে!"

"গুমোর নয় মা, কিন্তু তুমি যে ওঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় জুড়ে দেবে বল্‌ছ!"

"সে কি করে হবে, কে তাদের বাড়ী খুঁজ্‌বে—কেই বা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে—এই তো তোর ভাবনা জুটলো? ভয় নেই বাপু, তোমার ভরসায় আমি যাব না। এই এত দিন তাদের জানো—অথচ কোন একটা ছলে এক দিন তাদের সঙ্গে যখন একটু আলাপও করতে পারনি এ পর্য্যন্ত, তখন তোমার যোগ্যতা বোঝা গিয়েছে। আমি ভবতারণকে সঙ্গে নিয়ে যাব,—আলিপুরের মোহিনীবাবু জজের বাড়ীর সন্ধান ক'রে সে আমায় তাদের বাড়ী ঠিকই নিয়ে যেতে পার্‌বে—কিম্বা যা-হয় একটা উপায় কর্‌বে।"

কিশোর ক্ষণেক কি যেন চিন্তা করিয়া বলিল, "দরকারই বা কি এমন মা! এই যে এত দিন জেনে-শুনেও দেখা-শোনা আলাপ-পরিচয় করিনি, তাতে কি দিন যাচ্ছে না? কি ভাব্‌বে এতে তারা! কত লোকের সঙ্গেই তো এমন কত লোকের কোনো কালে হয়তো কোনো সুযোগে একবার জানা-শোনা হয়—কিন্তু তাই বলে কি তাদের পেছনে চিরদিনই ধাওয়া করতে হবে যে আমরা তোমাদের চিনি গো—চিনি?"

রাজেশ্বরী এবার আর একটু বেশী রকম অবাক্ হইয়া পুত্রের যথার্থ অনিচ্ছাপূর্ণ মুখের পানে চাহিলেন; বুঝিলেন, কিশোর যেন সত্যই

অনিচ্ছুক। থতমত খাইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তবে এ মনে রাখা, জানা-শোনার সার্থকতা কি ?"

"সার্থকতার কথা কি বলছ মা ? অসার্থকই বা কিসে ! আমাদের খেলার সঙ্গী সেই ঝরণা—সে এখন এমন হয়েছে, হয় তো এর পরে আরও কত কি হবে ! এ ভাব্‌তে কি বেশ ভালো লাগে না ? সুখ হয় না ? আমার কত দিন মনে হয়েছে, আমি যদি তাদের কলেজের সাম্‌নে মাঝে মাঝে যাই—হয় তো কোন দিন সে আমার সাম্‌নেও পডতে পারে। সেই তো এক দিন পডেও ছিল ! সে হয় তো জানতে পারে না—চিনতেও পারে না, তার হয় তো আমাদের কথা মনেই নেই, কিন্তু আমাদের কি এ কথা ভাব্‌তে বেশ ভাল লাগবে না যে আমরা তোমায় জানি, তোমাকে আমরা চিনি ! তুমি একদিন আমার সঙ্গে খেলা করেছ।"

রাজেশ্বরী অবাক্‌ মুখে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়াই রহিলেন। কিশোরের মুখের চারিদিক দিয়া যেন একটা আলো ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহার সেই আট বৎসর আগেকার রাঁচির কথা মনে পড়িতে-ছিল। এই ঝরণার উপলক্ষেই সেই চির-চাঞ্চল্যহীন বালক কিশোর তাঁহার নিকটে এমনি করিয়া কত কথাই বলিয়াছিল, আবার আজও তাই ! অন্য কোন বিষয়ে কিশোর এমন অন্যমনস্ক তো কোন দিন হয় নাই ! সে যেন কি রকম একটু আবিষ্টভাবে আবার বলিয়া যাইতে লাগিল, "কিন্তু তবুও মা, আমি তো একদিনও যাইনি। প্রথম সেদিন ঐটুকু দেখেছিলাম, যেটা দৈবাৎ ভগবানের ইচ্ছে, আমার তো তাতে হাত ছিল না। দ্বিতীয় দিন গাড়ীখানা দেখাও তাই। তবু আমার আলাপ কর্‌তে তো ইচ্ছে হয়নি। কি দরকার ? তার চেয়ে এইই ভালো !"

রাজেশ্বরী ইতিমধ্যে নিজের বক্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, "তোর যেন দরকার নেই, আমার যে আছে। এই শ্রাবণ মাসে তোর

বিয়ে দেব! তোর পরিচিত লোক, বিশেষ সে তোর খেলার জুড়ি! তাদের যখন এমন ক'রে মনে রেখেছিস্, আমি তাদের এমন সময়ে একবার নিমন্ত্রণও কর্‌বো না?"

কিশোর সহসা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে মাতার পানে চাহিল; বিমূঢ়ের মত বলিল, "বিয়ে?"

"হ্যাঁ, বিয়ে। কুড়ি বছরের হলি, তিনটে পাশ কর্‌লি—এবার বিয়ে দেব না? আমায় কি চিরদিনই এমনি একা একা বুকে হাঁটু গুঁজে কাটাতে হবে? সাধ-আহ্লাদ নেই আর কিছু?"

কিশোর স্তব্ধ হইয়া গেল, দেখিতে দেখিতে মুখের সে অরুণকান্তি ঘুচিয়া তাহার উপরে কে যেন একটা নীল ছাপ মারিয়া দিল। একবার ক্ষীণস্বরে সে যেন কোথা হইতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "একা কেন মা? আমি তো আছি।" কিন্তু রাজেশ্বরী যখন সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাবলে কি আমার বৌ হবে না—নাতিপুতি হবে না? এ-সব নাহলে কিসের সংসার পেতেছি তবে?" তখন তাহার মুখে আর কোন প্রতিবাদই বাহির হইল না। সত্যই তো, সংসারের যাহা যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, তাহা হইতে রাজেশ্বরী কেন বঞ্চিত থাকিবেন? নহিলে তিনি এ কি খেলাঘর পাতিয়াছেন? কিসের জন্য তবে কিশোরকে পুত্রত্বে গ্রহণ করিয়াছেন? ভিখারীর সন্তানকে রাজা করিয়াছেন? এ তো শুধু খেলামাত্র নয় যে, কিশোর যাহা ইচ্ছা করিবে, যেমন ভাবে তাহার সাধ, সেই ভাবে জীবন যাপন করিবে! অন্য লোকের মত তাহার কি স্বাধীন জীবন? তাহার এই হেয় জীবনের মালিক যে তাহাকে এইভাবেই রাজেশ্বরীর নিকটে দান করিয়াছেন। রাজেশ্বরী যে তাহাকে পুত্রের মত স্নেহে লালন-পালন করিতেছেন, সর্ব্ব ক্ষমতার অধীশ্বর করিয়াছেন, ইহা তাঁহার মহত্ত্ব। কিন্তু তিনি যদি বলেন, "এই পর্য্যন্ত! এখন আমি

যাহা বলি, আমার যাহা ইচ্ছা,—তাহাই তোমায় করিতে হইবে,"—তাহা হইলে ইহার সামান্য প্রতিবাদ করিবারও কি কিশোরের ক্ষমতা আছে? তাহার এই বিক্রীত দাসজীবনের সে স্বাধীনতা কোথায়? বলির পশুর মত উৎসর্গিত বস্তুর আবার নিজের ইচ্ছা বলিয়া একটা মিথ্যা বিড়ম্বনা কেন।

রাজেশ্বরী দেখিলেন, কিশোর আর কোন প্রতিবাদ করিল না, শুষ্ক শ্বেতমুখে সে খানিক পরে উঠিয়া গেল। রাজেশ্বরী ভাবিলেন, অন্যত্র বিবাহের নামে ছেলের এই ভাবান্তর! তাঁহার সুবোধ কিশোর তাঁহার মতের উপর প্রতিবাদ তো করিতে জানে না—কিন্তু অনিচ্ছাটা কোথায় যাইবে? মনে মনে হাসিয়া তিনি বলিলেন, তবে না কি আলাপের দরকার নেই? মুখচোরা ছেলে নিজে যা পেরে ওঠেনি, মাকেও তা করতে দিতে ভয় খাখায়। আমি যেমন করেই হোক্ সব ঠিক ক'রে নেব তা ছেলের বুদ্ধিতে আস্‌ছে না? তখন তাঁহার মনে হইল, হয়তো কিশোর তাঁহার মতলবখানা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়াই এরূপ বিষণ্ণ মর্ম্মাহত হইয়া গেল। পুত্রবধূ-সম্বন্ধে রাজেশ্বরীর রুচি ও আদর্শ সাধারণ হিন্দু গ্রাম্য মহিলার চেয়ে যে উঁচু, ইহার প্রমাণ তো সে কখনো পায় নাই। অবশ্য এত দিন রাজেশ্বরীর তাহা ছিলও না; আজ যে কাহার সুখেচ্ছায় তিনি তাঁহার আজন্ম-পোষিত সংস্কারও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন, তাহা দুদিনের বালক কিশোর কি বুঝিবে! আজ যদি বিনয় থাকিত, তবেই এ কথা একজন বুঝিত। যাক্, তিনিও এখন ছেলের নিকট আসল কথাটা ভাঙ্গিবেন না, কতদূর কি হয় আগে দেখাই যাক্, তাদের সঙ্গে পুনরায় আলাপ করিয়া তাহারা কেমন লোক আর-একবার বুঝিয়া লওয়া হউক! কন্যা এখন বয়ঃপ্রাপ্তা ও শিক্ষিতা হইয়াছে, কন্যা ও কন্যা-পক্ষের মতামতটাও তো একবার বুঝিতে হইবে। আগে হইতে ছেলেকে নাচানো ঠিক্ নয়—সে এখন যেমন ভাবে আছে, তেমনি থাকুক।

৪

কিশোর একটু বিস্মিতভাবেই লক্ষ্য করিল, তাহার বিবাহের উদ্যোগ বা সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা তো আর কিছুই হইতেছে না—কেবল কলিকাতা যাইবারই খুব ধূম-ধাম পড়িয়া গিয়াছে। একবার মাত্র সে মাতাকে জানাইল যে তাহার এম-এ পড়া ঘরে বসিয়াই হইতে পারিবে, সেজন্য এখন মাতার কলিকাতা-বাসের কষ্ট-স্বীকারে প্রয়োজন নাই। সে একবার কলিকাতা হইতে বই-টই কিনিয়া আনিতে মাত্র সেখানে যাইবে। কিন্তু মা সে কথা যেন কানেই তুলিলেন না। দেশে এ সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য ইত্যাদি নানা কথা তুলিয়া তিনি যে এখন কলিকাতায় বাস করিতে ইচ্ছুক, তাহা প্রকারান্তরে কিশোরকে বুঝাইয়া দিলেন। কাজেই কিশোরের আর বলিবার কিছুই রহিল না।

রাজেশ্বরী কিশোরকে যাহা যাহা বলিয়া অভয় দিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অক্ষরে অক্ষরেই পালন করিলেন। ঝরণাদের সঙ্গে পুনরায় আলাপ জমাইবার জন্য কিশোরের কিছুমাত্র সাহায্য তিনি লইলেন না। সাহায্য চাহিলেও বিশেষ যে কিছু পাইতেন তা নয়, কিশোরের যেটুকু সম্বল ছিল তাহা সে পূর্ব্বেই মাতার নিকটে নিবেদন করিয়াছে। তাঁহার বৃদ্ধ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ভবতারণকে দিয়াই তিনি সকল ব্যাপার সমাধা করিলেন ; এবং এক দিন বৈকালে বালিগঞ্জের দিকে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলেন। মাতার পার্শ্বে কিশোরও বসিল। ড্রাইভারের নিকট সেদিন ভবতারণ উঠিতেছে দেখিয়া ব্যাপারটা কতক সে আন্দাজ করিয়া লইল। মাতার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কিশোর বলিল, "মা, আমাকেও কেন আর নিয়ে যাচ্ছ ?"

"আমাকে আর ভবতারণকে নামিয়ে দিয়ে তুই বেড়াতে চলে যাস্—

আর ঘণ্টাখানেক পরে নিয়ে আসিস্। তোকে সেখানে নাম্‌তে হবে না। তবে শুধু কর্ম্মচারীর সঙ্গে প্রথমটা কি যাওয়া চলে?"

"তা তো নয়ই, তবে তোমার রোহিণীকে নাও মা সঙ্গে। আস্‌বার সময় ভবতারণবাবু একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আন্‌বেন তোমায়। তাতে এমন কিছু খারাপ দেখাবে না।"

"নারে বাপু—সেও ভাল দেখায় না। রোহিণীকে না হয় নিচ্চি, কিন্তু তোমাকেই গিয়ে আন্‌তে হবে। দুয়োরে গাড়ী নিয়ে দাঁড়াবে মাত্র বই তো না, তোমায় তো নাম্‌তে বল্‌ছি না—তাতে কি ক্ষতি।" বলিয়া রাজেশ্বরী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার দুষ্ট হাস্যটুকু গোপন করিলেন।

গাড়ী রিচি রোডে পৌঁছিলে ভবতারণ ড্রাইভারকে কি একটু বলিয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে একটা সুদৃশ্য বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ী দাঁড়াইয়া পড়িল এবং ভবতারণ নামিয়া গেলেন। কিশোর রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া রাজেশ্বরী আবার একটু বিস্মিত হইলেন। লজ্জায় কি মানুষের মুখ এমনি নীলবর্ণ হইয়া যায়। আর লজ্জার মতই বা ইহাতে এমন কি ব্যাপার আছে। তাই যদি থাকে—তবে আর ও সব কেন? এ ছেলের দেখছি অন্ত পাওয়া ভার। তাঁহার চিন্তা আর অগ্রসর হইতে পাইত না, একজন দাসী ও তাহার সঙ্গে দুই তিনটি কিশোর-কিশোরী তাঁহাদের দিকে আসিতেছে দেখিয়া ড্রাইভার দ্বার খুলিয়া দিতেই তিনি নামিয়া পড়িলেন এবং কিশোরের উদ্দেশে মৃদুস্বরে বলিলেন, "থাক্, তোমাকে আর নিতে আস্‌তে হবে না, আমি ভবতারণের সঙ্গেই আধঘণ্টাটাক পরে যাব।"

কিশোর মাতার কণ্ঠস্বরে মুখ ফিরাইয়া তাহার ক্ষুণ্ণ গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল এবং ততোধিক মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, "না—আমিই ফিরে আস্‌ছি।"

আন্দাজ তিন কোয়ার্টার পরে কিশোর সেই দরজায় আসিয়া ট্যাক্সি দাঁড় করাইবা মাত্র ঘরের ভিতর হইতে তাহারি সমবয়সী একটি সুদর্শন যুবা বাহির হইয়া গাড়ীর নিকটে আসিল এবং তাহাকে নামিতে অনুরোধ করিল। কিশোর আপত্তি জানাইয়া মাতাকে সংবাদ দিতে বলায় যুবক হাসিয়া বলিল, "আমায় বুঝি কিশোরবাবু চিন্‌তে পারছেন না! আমি জিতু! আপনি না নামলে মা খুব রাগ করবেন। খবর দি তাদের যে আপনি নাম্‌ছেন না!"

কিশোর তখন সুবোধ বালকের মত নামিয়া পড়িয়া তাহাদের বাহিরের ঘরে ঢুকিল এবং প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে মাতাকে সংবাদ দিতে মিনতি জানাইল।

"এই যে দিচ্ছি—কিন্তু তাতে যে বেশী সুবিধা হবে, তা মনে করবেন না। আপনি ততক্ষণ বসুন ভাল হয়ে।"

বাড়ীর ভিতরে সংবাদ গেল এবং অপরম্বা কিং ভবিষ্যতির ভাবনায় কিশোর আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল। কেন না, জিতুবাবুর চাপা কণ্ঠস্বরে চা এই শব্দটা তাহার কাণে আসিয়াছিল। এইবার ভদ্রতার যে একটা যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে, তাহা সে মনশ্চক্ষেই দেখিতে পাইতেছিল।

কিন্তু শীঘ্রই মাতার কণ্ঠস্বরে সে আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই "আজ নয়, আর একদিন ভাই, আর একদিন—" বলিতে বলিতে একজন মহিলার হস্ত ধারণ করিয়া রাজেশ্বরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের পশ্চাতে যাহারা আসিতেছিল, তাহারা যেন বাধা পাইয়াই দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইতে তাহাদের বসনের কতকভাগ মাত্র চক্ষে পড়িল। তাহারা আসিয়া পড়িয়া যেন পিছাইতেও লজ্জা পাইতেছে—অগ্রসরও হইতে পারিতেছে না!

রাজেশ্বরীর চক্ষের ইঙ্গিতে মহিলাটির নিকটস্থ হইয়া প্রণামের জন্য কিশোর অবনত হইবামাত্র "এই যে বাবা—এত বড়টি হয়েছ? বেঁচে

থাক—" বলিয়া তিনি তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। তার পরে তাহার মুখের দিকে সহাস্যভাবে চহিয়া বলিলেন, "কেন বাবা, নাম্‌তে চাওনি কেন? জিতুকে চিন্‌তে পারোনি বুঝি? তোমার যে ওরা কত বন্ধু ছিল—কত খেল্‌তে তোমরা। ঝরণারও বুঝি লজ্জা হলো? রাঁচির কথা মনে নেই না কি?" বলিয়া সহাস্যে তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন। কে যেন দ্বারের ভিতর হইতে আগাইয়া আসিতেছে ইহা অনুভব করিবামাত্র সেই যে কিশোর মাথা নামাইল—ইহার পর রাজেশ্বরী কোন কোন ভাষায় কিশোরকে চা বা মিষ্টান্ন যোগের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন এবং শীঘ্রই আবার এক দিন আসিবার প্রতিশ্রুতি ও জিতুকে নিজেদের ঠিকানা দিয়া কিশোরকে সঙ্গে লইয়া যে গাড়ীতে উঠিলেন—কিশোরের সে সব যেন একটা অন্ধতার মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া গেল। গাড়ী যখন রাস্তায় পড়িয়া ছুটিয়া চলিল, তখন তাহার যেন চক্ষের দর্শনশক্তি ও কর্ণের শ্রবণশক্তি আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে, —এমনি মনে হইল।

সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়াই রাজেশ্বরীর অন্তরের উচ্ছ্বাস নানা ভাষায় কিশোরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। "কি চমৎকার অমায়িক মানুষ ওরা। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে কতটুকুই বা আলাপ ছিল—অমন তো কত হয়। তবু আমি নিজে থেকে খোঁজ করে দেখা করতে গিয়েছি ব'লে কতই আনন্দ প্রকাশ করা। ওরাও একদিন আসবে বলেছে,— জিতু তার আগেই এসে দেখা করে যাবে। আমি যা ভয় করেছিলাম, তা তো মোটেই নয়—ঠিক আমাদেরই মত ঘরকন্না। বাইরেটা সাহেবী-সাহেবী দেখালেও ভেতরটা একেবারে আমাদেই মত মেয়েটা কি শান্তই হয়েছে—কে বল্‌বে সেই ঝরণা। আর কি সুন্দর হয়েছে—তখন রোগা রোগা ছিল—এখন যেন ভেঙে চুরে গড়েছে। বড় মেয়ে

কল্যাণীকে দেখলাম—ঝরণার চেয়ে সে অনেকটা বড—একটি খোকা হয়েছে তার। সেটি কিন্তু আমাদের ঝরণার মত অমন সুন্দর নয়—" কিশোর গতিক দেখিয়া সেদিন মার কাছ হইতে একটু দূরে দূরেই সরিয়া থাকিতে চেষ্টা পাইতেছিল।

পরদিনই জিতু বা শ্রীমান্ অজিত তাহাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়া রাঁচির শৈশব-স্মৃতি লইয়া এমন গল্প জুড়িয়া দিল যে কিশোরের বিস্ময় লাগিতেছিল। এগুলা কি তাহার মাতা-ভগ্নীর মুখে শুনিয়া কল্পনার রঞ্জিত কাহিনী অথবা তাহার আলাপ করিবারই একটা ছুতা মাত্র! জিতু বা অন্য কাহারো সঙ্গে সে কি এত খেলা করিয়াছে—এমন কি এই জিতু-শ্রীমান্‌কেই যে তাহাব একেবারে মনে ছিল না! এখন অবশ্য পড়িয়াছে। কিন্তু এতদিন মাত্র একটি স্মৃতি একটি চিত্রই তাহার সেই শৈশবজীবন হইতে যৌবনের জীবন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল! রাঁচির স্মৃতির গৎটা মাত্র সেইটিকে ঘিরিয়াই গাহিয়া ফিরিত। আর অন্য কিছু তো তাহার মনে নাই।

জিতুর সঙ্গে আবার সেদিনও রাজেশ্বরী, "একটু বেড়িয়ে আসি—বসে বসে সময় যেন কাটে না"—বলিয়া তাহাদের বাড়ী চলিয়া গেলেন; কিশোরের গতিক বুঝিয়া তাহাকে আর বেশী উৎপীড়ন করিলেন না।

সেদিন খানিক রাত্রেই অজিত আসিয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া গেল। কিশোর তখন একমনে তাহার বিজ্ঞান-রাজ্যে বিচরণ করিতে-ছিল। একমুখ হাসিয়া লইয়া রাজেশ্বরী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কেমন! যেমন গেলে না, তেমনি নিজেই ঠক্‌লে। শুন্‌তে পেলে না!"

কিশোর একটু বিস্মিত সপ্রশ্ন নয়নে মাতার পানে চাহিয়া থাকিতেই রাজেশ্বরী নিজ হইতে বলিয়া উঠিলেন, "না রে, ভুলই বল্‌ছি! তাদের

যেমন ধরণ-ধারণ—তুই সঙ্গে থাকলে হয়তো আমিই শুনতে পেতাম না। কি সুন্দর গান গায় আর বাজায় দুই বোনে। বিশেষ আমাদের ঝরণা যে কি বেহালা বাজায় এমন আমি ককখোনো—" বলিতে বলিতে রাজেশ্বরী নিজের উচ্ছ্বাসের উপরই যেন একটা কি আঘাত পাইয়া একটু থামিয়া গেলেন—তার পরে সেটুকু যেন সাম্‌লাইয়া লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "অতটুকু মেয়ের এমন বাজানো কখনো শুনিনি। রীতিমত মাষ্টার রেখে মেয়েদের গাইতে বাজাতে শেখানো হয়। তবে তার মধ্যে একটু অসাধারণত্ব আছে। মেয়েদের কে একজন কাকা আছেন, অবিশ্যি তিনি একজন মাষ্টারই, তবু তাঁদের একজন আত্মীয়ের মতই হয়ে থাকেন!"

কিশোর নিঃশব্দে নিজের পুস্তকের পানে চাহিয়াই রহিল, আর রাজেশ্বরী একটা চৌকি টানিয়া জানালার নিকটে বসিয়া পড়িয়া—কে যেন তাঁকে সমস্ত খুঁটিয়া বলিবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিতেছে, এমনি ভাবে বলিয়া চলিলেন, "কাল ঝরণাকে খুব শান্ত আর গম্ভীর লেগেছিল। অনেক দিন পরে দেখা—আর মেয়ে এখন একটা যে সে নেই তো। ওমা, আজ দেখি যে ঝরণা সেই ঝবণা,—কিন্তু ঝরণার চেয়ে গোপ্পে তার দিদিই বেশী—কল্যাণী মেয়েটি। তাদের সেই মাষ্টার কাকার গল্প আর মেয়েদের ফুরাতে চায় না। তাকে তারা পেয়েছে বলেই এতটা শিখেছে, নৈলে বাইরের লোকের কাছে তো তাদের অমন করে শেখা চলতো না। আগে বটে তারা তাদের বাবাব কাছে খানিকটা শিখেছিল। মোহিনীবাবুর নাকি গান-বাজনার ভারি সখ্। নিজে ওস্তাদ রেখে সব শিখেছেন। এক দিন তার বাবা বসে বাজাচ্ছেন আর তারা শুনছে, এমন সময় একটা লোক—বলা নেই কওয়া নেই—রাস্তায় জানালার গোড়া থেকে মুখ বাড়িয়ে বল্‌লে, "ও কি মশায়! মেয়েদের

ভুল শেখাচ্ছেন কেন! আপনি যে-কটা বাজালেন, সবগুলোতেই যে ভুল রয়েছে।" বাপ একটু অবাক হয়ে তখনি তাকে ডেকে এঁনে খাতির ক'রে বসিয়ে তাকে নিজের হাতের বেহালা দিয়ে তার গান শুন্‌লেন। সেই থেকে তাঁর ওপর ওদের বাপের কি যেন মন প'ড়ে গেল, তিনি বাড়ীরই একজন হয়ে গেলেন। বড় বড় লোকেদের নিমন্ত্রণ ক'রে মোহিনীবাবু তাঁর গান শোনান্—লোকটি এমন গুণী। মেয়েদের সঙ্গে গান-বাজনার কথা তুল্‌লেই তাদের এই কাকার গল্প আগে শুন্‌তে হবে—ঝরণার মা মেয়েদের ঠাট্টা ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ছিলেন, আর মেয়েদের তাতে যা রাগ দেখানো!"

কিশোর মা তার এই অবারিত গল্প-স্রোতে এইবার একটু বাধা দিয়া বলিল, "খাবার কি হয়নি মা?"

"তাতো এখনো খবর নিইনি,—রোহিণী, দেখ্ তো ঠাকুরের কতদূর! ন'টা বাজে যে—এখনো কিশোরের খাবার দিলে না? সেদিন তুই চা খেয়ে আসিস্‌নি ব'লে ঝরণার মার আর দিদির যা আমার ওপর অভিমান। এই রবিবারে মোহিনীবাবুর সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্যে তোর নিমন্ত্রণ হবে—"

কিশোর একটু যেন আতঙ্কের স্বরে বলিল, "মা তুমি—"

এইটুকু বলিতেই রাজেশ্বরী সজোর বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে আবার কি কথা! মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের লেনা-দেনা কর্‌তে গেলে এ-সব তো করতেই হয়। এতে আঁত্‌কালে চল্‌বে কেন বাপু? ঝরণার মা আর মেয়েরাও শীগ্‌গির একদিন বেড়াতে আস্‌বে। আমরাও রবিবারের আগেই না হয় তাদের একদিন খাওয়াব। এত লজ্জা কিসের বাপু? তুই যে কচি ছেলের বাড়া দেখছি।" ইতিমধ্যে রোহিণী দাসী আসিয়া "খোকাবাবু, খাবার এসেছে" বলিয়া ডাক দিতেই সে-রাত্রের মত সে আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

সেই শীঘ্র যে তাহার পরদিন আসিয়া পড়িবে তাহা কিশোর আন্দাজ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ সে সময়টা সে বাহিরে কাটাইত। বৈকালে সে পাঠগৃহেই বসিয়া এইবার বেড়াইতে যাইবে এইটুকুমাত্র ভাবিতেছে, এমন সময়ে তাহার মাতা একজন মহিলা ও একটি যুবককে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেই তাঁহাদের চিনিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঝরণার মা অনুযোগের সুরে বলিলেন, "কেন বাবা, তোমার এত লজ্জা কিসের! জিতুর সঙ্গে ঝরণার সঙ্গে কত ভাব ছিল তোমার, কত খেলেছ, তা বুঝি আজ আর মনে নেই? আয়রে কল্যাণ, কিশোরের সঙ্গে আলাপ করবি আয়! তুইও যে কিশোরের মত হলি,—কিশোর তো তোর চেয়ে অনেক ছোট! ঝরণাটা তো এলোই না। কি যে এদের সব লজ্জা!"

একজন সুবেশা যুবতী একটি ক্ষুদ্র বালকের হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলিল, "কি যে বল তুমি মা, খোকা যে জ্বালাতন করছে।"

"পাজীকে জব্দ করি দাঁড়াও তবে আমি!" বলিয়া রাজেশ্বরী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং অভিমানের সঙ্গেই বলিলেন, "ঝরণার আর সময় হলো না আসতে?"

কল্যাণী সলজ্জে সে কথারও কি একটা কৈফিয়ৎ দাখিল করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে কল্যাণীকে প্রণামটা সারিয়া লইয়া কিশোর খোকার সহিত ভাব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঝরণা যে আসে নাই, ইহাতে কিশোর তখন যেন আরামই বোধ করিল। খোকার মামা হইয়া একটু পরেই খোকার মার সঙ্গেও তাহার 'দিদি' ও 'ভাই' সম্বন্ধটিও দিব্য জমিয়া উঠিল।

৫

মাসখানেক না যাইতেই উভয় পরিবারের মধ্যে এই ঘনিষ্টতা গভীর সৌহার্দ্যে পরিণত হইয়া পড়িল। রাজেশ্বরী এই এক মাসে মজুমদার পরিবারের সহিত এতই আন্তরিক আগ্রহে স্নেহের আদান-প্রদান চালাইতেছিলেন যে, বাহিরের কোন লোক হঠাৎ আসিলে তাঁহাকে মোহিনীবাবুদের কোন নিকটতমা আত্মীয়া বলিয়াই মনে করিত। কল্যাণী, ঝরণা, অজিত এবং তাহাদের অন্যান্য শিশু ভ্রাতা-ভগ্নিরা তো তাহাদের মাসীমার স্নেহে ও আদরে একেবারে অভিভূত হইয়াই পড়িয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই এখন মাসীমাকে নইলে চলে না। মাসীমাও তাহাদের ছাড়িয়া নিতান্ত আহার-নিদ্রার সময়টুকু ছাড়া একা তিষ্টিতে পারিতেন না। খাইয়া উঠিয়া হয় তো কেবল মুখে মশলা দিয়া একটু গড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, অমনি বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিতেই বুঝিলেন, হয় তো তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে কেহ আসিতেছে, কোথাও হয় তো তাহাকে এখনি তাহাদের অভিভাবিকা সাজিয়া বাহির হইতে হইবে,—নয় তো তাঁহার ঘর-দ্বার তছ্‌নচ্‌ করিয়া মধুর কলহাস্যে ও সঙ্গীতে গৃহটি পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য দস্যুদলের আবির্ভাব হইতেছে! বলা বাহুল্য যে এই সুমিষ্ট উপদ্রবটুকু ভোগ করিবার জন্য অত্যাচারিত ব্যক্তিটিরও আগ্রহের সীমা থাকিত না। ঝরণার মা যখন-তখন রাজেশ্বরীকে অনুযোগ করিতেন, "দিদিকে একটু যদি পাবার জো আছে। ওদেরই একেবারে এমন একচেটে হয়ে পড়্‌লেন যে আমার দুটো কথা কবারও সাবকাশ মেলে না। দেখুন তো এতে রাগ ধরে না?"

রাজেশ্বরী কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার অনুরক্ত-দলেরাই তখনি মাসীমার স্বত্ব-সাব্যস্তের মকর্দ্দমা আনিয়া মায়ের সঙ্গে এমন কোঁদল জুড়িয়া দিত যে মা বেচারী তখন নীরবে হারিয়া পলাইবার পথ পাইতেন না।

মাতার এই অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতায় কিশোরকেও ক্রমে তাহার স্বভাবজাত সঙ্কোচকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল—কিন্তু এক জায়গায় সেটা সমান অটলই থাকিয়া গেল। সকলের সহিতই তাহার ব্যবহার সহজ হইয়া আসিয়াছিল; কেবল ঝরণার সঙ্গে সে এখনো পর্য্যন্ত কিছুতেই মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিত না! এবং তাহার সঙ্কোচেই বোধ হয় বাধা পাইয়া ঝরণাও তাহাদের মধ্যকার ব্যবধান রাখিয়াই চলিত। উভয় পক্ষেরই অবশ্য এ বিষয়ে যে লক্ষ্য ছিল না তা নয়, কিন্তু তাহারাও এটুকু ভাঙ্গিয়া দিবার কোন উৎসাহ দেখাইত না, এবং এটুকুকে যেন তাহারা পরম উপভোগের বিষয়ই মনে করিত। কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে যদিও স্পষ্টাস্পষ্টি কোন কথা তখনো ওঠে নাই, তবু উভয়পক্ষেরই জানিতে বাকি ছিল না যে, সেদিনের আর বেশী দেরী নাই! সকলকে ভালবাসিয়া রাজেশ্বরী যে ঝরণার দিকে সে স্নেহের একটু বিশিষ্টতা বহন করিতেন, তাহাও বুঝিতে কাহারো বাকি ছিল না; এবং সেজন্য ঝরণার ভাই-বোন্‌দের মধ্যে আনন্দ-হিংসার ধাক্কাও তাঁহার স্কন্ধে বড় কম পড়িত না।

রাজেশ্বরীর জীবনে এ আনন্দের স্বাদ কখনো অনুভবের মধ্যে ছিল না, তাই তিনি ইহাতে একেবারে বিভোর হইয়া যাইতেন। সুন্দর সুন্দর খেলনা ও কাপড়-জামা কিনিবার এবং তাহা দিয়া ছেলে-মেয়েকে সাজাইবার তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। নিজের সন্তান বলিয়া যাহাকে পাইয়াছিলেন তাহাকে দিয়া যথাসাধ্য এ-সব সাধ মিটাইলেও রাজেশ্বরী তাহাতে যেন এমন সুখ পান্ নাই। যাহাকে সাজাইতেন সে তো কখনো এমন আদর-আব্‌দার করিয়া কাহারো সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতি-যোগিতা বাধাইয়া তাঁহার নিকট হইতে যেন জোর করিয়া কাড়িয়া লইত না, তাই সেই পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে তাহার কোনও সাড়াই রাজেশ্বরীর বুকে আসিয়া পৌঁছায় নাই। সে যেন কাঠের পুতুলকেই সাজানো

হইয়াছিল। আর ইহারা এই যে ঝরণার দিকে তাঁহার একটু পক্ষপাত লইয়া সকল বিষয়েই তাঁহাকে খোঁটা দিয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে ডবল আদর আদায় করিতেছে, ইহাতে রাজেশ্বরী যেন তাঁহার মানস-কল্পিত অনাগত জীবনের অপরিসীম সুখেরই অনুভব করিতেছিলেন।

সে দিন কলেজের ফেরৎ বাড়ী যাইবার পথে ঝরণাকে তাঁহার নিকটে নামিতে দেখিয়া রাজেশ্বরী আদর করিয়া কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের কথার পূর্ব্বেই চোখের আদরের উত্তর-স্বরূপে ঝরণাই আগে কথা কহিয়া উঠিল, "কাল্‌কে হবে না মাসীমা—সেই কথাই বলতে এলাম তাড়াতাড়ি।"

"কি হবে না কাল্‌কে? আমার কাছে সকলকে তোমাদের রেঁধে খাওয়ানো?—কেন?"

"কাল্‌কে আমাদের কাকাবাবু আস্‌ছেন মাসীমা, কলেজ আসবার সময় চিঠি পেয়েছি।" বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝরণা একটু ব্যস্তভাবে তাহার হস্তস্থিত ছোট ব্যাগটি ও পুস্তকখানির মধ্যে কি যেন অন্বেষণ করিতে লাগিল। রাজেশ্বরী বলিলেন, "বাঃ, হবে না বল্‌লেই হল আর কি। কল্যাণী, নলি, জিতু ওরা নিজেরা রাঁধবে বলেছে—তুমি না পার নেই পার্‌বে বাপু, তা বলে ওদের ভোজে কেন বাধা দেবে? ওরা যার কত উৎসাহ ক'রে বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে বেড়াচ্ছে, এ কি আর বন্ধ করা যায় পাগ্‌লি?"

"নেমন্তন্ন করা হয়নি মাসীমা—চিঠিটা দিদিকে দেখিয়ে বারণ করে গেছি!"

রাজেশ্বরী একটু ভাবিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "তোমাদের দিক্ না হয় সাফ্ রেখেছ। আমি যে কিশোরকে—যাক্, সে না হয় আমিই তার বন্ধু কটিকে খাইয়ে দেব। আর সে যে ছেলে, হয় তো কাউকে বলেইনি,

তোমাদের কাছে তার যে লজ্জা! কিন্তু বলছিলাম এই যে, এলেনই বা তোমার কাকা! তাঁকে শুদ্ধ কিশোর গিয়ে তখুনি নিমন্ত্রণ ক'রে আসবে, তিনি একটু বেহালা শুনিয়ে দেবেন সকলকে না হয়—"

ঝরণা বাধা দিয়া বলিল, "না মাসীমা, কাল নয়। এর পরে এক দিন করলেই চলবে। তিনি দেড় মাস দু' মাস ঘুরে বাড়ী ফিরছেন, কাল আমরা অন্য কিছুতে ব্যস্ত থাকতে পারব না। তিনি তাতে কি ভাববেন! এই দেখুন তাঁর চিঠি।" বলিয়া ঝরণা একটুকরা চিঠি রাজেশ্বরীর হাতে দিল। ঝরণার আগ্রহাতিশয়ে রাজেশ্বরী অগত্যা কাগজটুকুর ভাঁজ খুলিয়া পড়িলেন—

"মা আমার ঝরণা, তোদের কাকা আবার তোদের কাছে ফিরে যাচ্ছে মা। তোরা জানিস্ না, সে তো বেড়াতে বেরোয়নি! আজ দু' বৎসর তোরা তার গলায় যে ফাঁস আস্তে আস্তে এঁটে দিয়েছিস্ সেইটে একটু আলগা করার চেষ্টাতেই সে এ দুদিন পালিয়ে দেখ্‌ছিলো। কিন্তু হলো না মা, তাই আবার তোদের কাছেই ফিরে সে চলেছে! আমার কলি মা, জিতু, নলি, বুলা তাদেরও এই কথা বলো। আমায় যেন তোরা বকিস্ নে! এই প্রায় দুমাস তোদের হাতের দেওয়া খাবার খেতে না পেয়ে সেই আগের মত রোগা হয়ে গেছি। কলি মা যেন আমার জন্যে ভাপ করে বেঁধে রাখে, আর তুই আমার স্বপ্নের স্নেহ-নির্ঝরিণী—আমার কল্পনা-স্বর্গের মন্দাকিনী, মাগো—তুই জানিস্ না জানিস্ না—

রবিবার পৌঁছুবো। ইতি—তোদের কাকা।"

রাজেশ্বরী পত্রটুকু পড়িয়া ঝরণার পানে চাহিয়া দেখিলেন,—সে আগ্রহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। বোধ হয় তাহার কাকার পত্র সম্বন্ধে তিনি কি মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহারই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাজেশ্বরী একটু হাসিয়া সাদরে ঝরণার চিবুকে হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিলেন,

"তবে যে জিতু কলি ওরা আমাকেই একা দোষ দেয়? এ যে দেখছি সবাই এক দোষে দোষী! তোমার কাকাও যে একটু এক-চোখো দেখ্‌ছি গো। এ মুখখানিকে সব্বাই যে একটু বেশী ভাল না বেসে থাকৃতেই পারে না—" বলিতে বলিতে রাজেশ্বরী অগ্রসর হইয়া সাদরে সেই মুখখানির প্রতিভা-উজ্জ্বল শুভ্র সুন্দর ললাটে একটি স্নেহ-চুম্বন স্পর্শ করাইয়া দিলেন।

ঝরণা লজ্জিত মুখে হাসিয়া বলিল, "কাকাই বুঝি এর থেকে নিস্তার পান? তাঁকেও রাতদিন আমাদের এ ঝগড়া সইতে হয়। এইবার যাই মাসীমা,—নলির এখনো ক্লাশ চল্‌ছে। আমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে 'কার্‌' আবার তাকে আন্‌তে যাবে। আপনাকে এই খপরটা শীগ্‌গির দেওয়া দরকার বলে আমার ক্লাশ হয়ে যেতেই চলে এসেছি আজ।"

রাজেশ্বরী বলিলেন, "আচ্ছা, তিনি কাল কখন্ আসবেন, তাতো কৈ লিখেননি—"

চলিতে চলিতে ঝরণা উত্তর করিল, "তাঁর কি অত হিসেব করা স্বভাব? তাঁকে দেখলে তবে বুঝতে পারবেন তিনি কি রকমের মানুষ। খেতে বসে খেতে ভুলে যান; ঠিক যেন ছোট ছেলে কি পাগলের মতই অন্যমনস্ক! গায়ে একটা গেঞ্জি কি সার্ট দিয়ে কিম্বা কখনো তাও না দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েন, জামার বোতাম দিতে কখনো তাঁকে দেখ্‌তে পাই না।—যখন তিনি প্রথম আমাদের বাড়ী আসেন—তখন যেন তিনি কথা কইতেই পারতেন না—কেবল যখন কোন বাজনার সুর তাঁর কাণে যেত তখনি ঘাড় তুলে বসতেন আর স্বাভাবিক মানুষের মত কথা কইতেন। বেহালা হাতে নিতেন যখন, তখনি তাঁকে ঠিক্ চেনা যেত যে কতখানি ক্ষমতা তাঁর। কিন্তু প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে কথা কইতেন, আমায় ভালবাসতেন। সময় সময় এমন ভাবেন যেন বাহ্যজ্ঞানই থাকে না! যেন খুব দুঃখ পেয়েছেন জগতে, এম্‌নি মনে হয়। তাঁকে আমরা কি করে

যে খেতে শিখিয়ে—কত করে তবে তাঁর শরীর সারিয়ে একটু ভাল করেছি মাসীমা—তাঁকে আমাদের বড্ড ভাল লাগে, সবাই তাঁকে ভালবাসে—"

"তা তোমার কাকার চিঠিতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে গো! মা'টিকে দুমাস ছেড়ে গিয়ে ব্যাচারা ধড়ফড় করছেন। আচ্ছা, আজ এসো তুমি, আমারও তোমার কাকাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে—কাল সন্ধ্যা-আন্দাজ খবর নেব একবার। চল, গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি তোমায়—"

"না না, আমি এটুকু যেতে পারব। বাইরে কেউই নেই, আপনাকে নাম্‌তে হবে না, মিছি-মিছি এতখানি—ঝি আছে ত নীচে, তাকেই না হয় ডেকে নিচ্চি। শুন্ আপনি—"বলিতে বলিতে একটু দ্রুতপদে ঝরণা সোপান-শ্রেণীর কয়েকটা অতিক্রম করিল দেখিয়া রাজেশ্বরী আর তাহার অনুসরণ করিলেন না, শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

ঝরণার কিন্তু একটা কথা মনে ছিল না যে, সেদিন ঐ সময়ে কিশোরও কলেজ ফেরৎ বাড়ী আসিতে পারে। ত্রিতলের সিঁড়িটার নির্জ্জন পথ সে কতকটা সেই বাল্যকালের গতিতেই নিরাপদে পার হইয়া আসিয়া দ্বিতলের সিঁড়িতে পা দিতেই দেখিল, একখানা বই হাতে কিশোরও ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতেছে। উভয়ের সহিত উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র মুহূর্ত্তে ঝরণার সেই নির্ঝরিণী গতি ভঙ্গ হইয়া গেল। সহজেই সে কিশোরের সম্মুখে পড়িতে চাহে না—তাহাতে এই দ্রুত ধাবনের মধ্যে আজ একেবারে সম্পূর্ণ একা সেই কিশোরেরই সম্মুখে পড়িয়া ঝরণা এতটাই চম্‌কাইয়া উঠিল যে, পরক্ষণে নিজেই নিজের এই অস্বাভাবিক লজ্জায় লজ্জিত হইয়া একেবারে আললাট-স্কন্ধ পর্য্যন্ত আরক্তিম হইয়া উঠিয়া সিঁড়ির দেওয়াল ধরিয়া একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং যতক্ষণ না কিশোর সমস্ত সিঁড়িটি অতিক্রম করিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিয়া গেল ততক্ষণ সেখান হইতে এক পাও নড়িতে পারিল না।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে ঝরণা চোরের মত নিঃশব্দ পদে যখন গিয়া তাহাদের 'কারে' উঠিল—তখন তাহার অবনত দৃষ্টি চকিতে একবার উধাও হইয়া উপরের পানে ছুটিতেই মুহূর্ত্তে সেখানেও সে আবার ধরা পড়িয়া গেল। ত্রিতলস্থ পাঠ-গৃহের জানালার সুমুখেই কিশোর 'কারে'র পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঝরণার পাশ দিয়া যখন সে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া যায়, তখন উভয়েব মুখের সেই আরক্তচ্ছটার আলো—কেহ কাহারও প্রতি দৃষ্টি না করিলেও তাহা যে কোথা দিয়া উভয়েরই অন্তর্চক্ষুর সাম্‌নে পড়িয়াছিল, সে কথা বলা দুরূহ! কিন্তু এখন ঝরণার চকিত দৃষ্টি সহসা যেখানে ধরা পড়িয়া আবার নিঃশব্দে নিজস্থানে ফিরিয়া আসিল, সেখানে তো আলোর কোন রেথাব আভাসমাত্র সে আর পাইল না। কেমন একটা বিবর্ণ স্তব্ধতার,—ব্যথাব পাণ্ডুর রাগই সেখানে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে! ঝরণা নত দৃষ্টিতে আসনে বসার পর কার সশব্দে ছুটিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এইখানে বলা আবশ্যক যে রাজেশ্বরী একদিন ঝরণার মার কানে কানে ছেলের অদ্ভুত 'মুখচোরাত্বে'র প্রমাণার্থে গোড়ার কথাটা একটু বলিয়া ফেলিযাছিলেন। ছেলে যে দু'বৎসর আগে হইতেই নামটুকু দেখিয়া ঝরণাকে চিনিতে পারিয়াছিল—তথাপি একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে তাহার ক্ষমতা হয় নাই, এটুকু তিনি হাসিয়া বলিলেও গোপনে ঝরণার মার কানে বলাতেই তাহার সংসারটুকু ঝরণার মার বোধগম্য হইতে বিলম্ব ঘটে নাই। তিনিও এ প্রার্থিত আনন্দের অংশ হইতে স্বামী এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীকে বঞ্চিত করেন নাই। কল্যাণী মেয়েটি মায়ের যথেষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও এ লইয়া ঝরণাকে দু-একটি সুমিষ্ট পরিহাস করার প্রলোভনও যে সংবরণ করিতে পারিয়াছে, ইহা মনে করাই একান্ত অসঙ্গত ব্যাপার। কাজেই ঝরণার এই অসঙ্গত

লজ্জার কিছু কারণও ছিল। দিদি যতটা না বলিয়াছে বা না জানে, সেটুকুও ঝরণার অবিদিত ছিল না। তাই সহসা কিশোরের এই নূতন ভাবান্তরে সে একটু বিমূঢ় হইয়া গেল। তাহারা কেহই কাহারো দিকেই তো চাহেই না,—তবে আজিকার মত দৈবাৎ যদি কখনো এ কাণ্ড ঘটিয়াই থাকে, তাহাতে তো কোন দিন এমন বোধ হয় নাই। আজ এমন কেন লাগিল! ঝরণা এতই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে, কার বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলে সোফারের 'দিদিমণি' আহ্বানে তবে তার সে বিষয়ে হুঁস হইল।

৬

রাজেশ্বরী সেই শনিবারের দ্বিপ্রহর হইতে রবিবারের বৈকাল পর্য্যন্ত একা কাটাইয়া প্রায় হাঁফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিজের মনের মধ্যেও একটা তাগিদ আসিয়াছিল যে আর অনর্থক বিলম্ব না করিয়া এইবার কথাটা পাড়িয়া ফেলা যাক্। কন্যাপক্ষের দিক্ হইতেও যে ইহার প্রতীক্ষা চলিতেছে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন—তবে এ ক্ষেত্রে যে হিন্দু-সমাজের চিরাগত প্রথামত কন্যার মা-বাপই প্রথমে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবেন—সে নিয়মটুকু যে এখানে খাটিবে না, তাহাও তিনি বুঝিতে-ছিলেন। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়েরা চায় যে তোমরাই আগে আমাদের মেয়েকে চাহিবে! আমাদের হাজার প্রার্থনীয় হইলেও সাদর প্রার্থনা না পাইলে আমরা তো সেখানে যাচিয়া গছাইতে পারিব না। তাই রাজেশ্বরী এইবার স্পষ্ট কথা বলিয়া সাম্‌নের অগ্রহায়ণ মাসের জন্য প্রস্তুত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

কোন বিষয়ে সংকল্প স্থির করিবার পর তাঁহার ধৈর্য্য ধারণ করা

কঠিন হইত। বরাবরই তাঁহার স্বভাবে এই অধীরতাটি বর্ত্তমান ছিল। সেদিনও কিশোরকে লইয়া তিনি বৈকালে খানিক বেড়াইয়া শেষে রিচি রোডের দিকে ট্যাক্সি চালাইতে আদেশ করিলে কিশোর একটু হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিল।

ছেলের এই নীরব হাসির পরিহাসটুকু তাঁহার খুবই ভাল লাগিল। এতদিনে এইবার তাঁর ছেলেও যে তার অসঙ্গত লাজুক স্বভাবকে কাটাইয়া সাধারণ ছেলের পদে দাঁড়াইয়াছে,-এবিষয়ে তিনি আজ যেন অনেক নিশ্চিন্ত হইলেন। এইবার সহজেই তিনি তাঁহার প্রস্তাবটা পাড়িতে পারেন বলিয়া মনে হইল। আর কোন বাধাই যেন সম্মুখে নাই! কিশোরের সম্বন্ধে তাহার মন এত'র পরেও সময়ে সময়ে কেমন শঙ্কিত হইয়া উঠিত। যাহা বুঝিয়াছি তাহা ঠিক্ তো?—এ আশঙ্কা অনেকবারই তাঁহার মনে হইয়াছে। ছেলেটি তার চিরদিনই যে অনেকখানি দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু আজ মনে হইল তিনি ঠিকই বুঝিয়াছেন।

ছেলের হাসিতে যেন লজ্জিত হইয়াই অস্বীকারের সুরে রাজেশ্বরী বলিলেন, "ওদের কাকা এসেছেন যে,—নিমন্ত্রণ করতে হবে না তাকে এক দিন? হাস্‌লেই হল আর কি!"

"আমি কি কিছু বলেচি মা তোমায়?"

"হাস্‌লি কেন তবে? কাজ আছে বলেই যাচ্চি আজ, শুধু গল্প করবার জন্যে নয়।"

কিশোর মাতার এই প্রতিবাদে এইবার মনে মনে একটু বেশী পরিমাণে হাসিয়া লইয়া বাহিরে মুখখানা যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া বলিল, "আজকেই কি নিমন্ত্রণ করতে হবে?"

"তাও কি হয়? মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি, কবে সুবিধে হয়।"

মোহিনীবাবুর দ্বারে গাড়ী দাঁড়াইলে রাজেশ্বরী বলিলেন, "বেশী দেরী হবে না আজ,—ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েই থাক্। মোহিনীবাবু এখন তো বাড়ী আছেন, যাবি না তাঁর কাছে ?"

"যাব" বলিয়া মাতার সঙ্গে কিশোর নামিয়া পড়িল। রাজেশ্বরী একটু অন্য পথে এবং কিশোর সম্মুখের প্রথম বড় হলটার পথ ধরিতেই একটি বালিকা মোটরের শব্দে বাহিরে আসিয়া রাজেশ্বরীর সঙ্গে চলিল। রাজেশ্বরী বাড়ীর ভিতরের দিকে চলিয়া গেলে, কিশোর হলের পর্দ্দা সরাইতেই দেখিল, হলে তখন কতকটা পারিবারিক অধিবেশনই বসিয়াছে। মোহিনীবাবু এবং আর একজন অপরিচিত ব্যক্তি সে গৃহে রহিয়াছেন। আজ তাঁহার কন্যা-পুত্রগুলি প্রায় সকলেই সেখানে উপস্থিত আছে। উজ্জল বিদ্যুতালোকে ঝরণা ও কল্যাণীর দীপ্ত কান্তি সর্ব্বপ্রথম কিশোরের চোখে পড়িল। তাহারা একজন একখানা কৌচে বসিয়া আছে এবং একজন একখানা কৌচের পিছন ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া হাসিয়া সানন্দে অবদারের স্বরে যেন কাহাকে কি বলিতেছে। তাহাদের মধ্যে মধ্য-বয়সী শীর্ণকান্তি এক ব্যক্তি একখানা কৌচে বসিয়া আছে। কিশোর পর্দ্দা সরাইয়া একটু অপ্রতিভ ভাবে থমকিয়া দাঁড়াইতেই, যুগপৎ একসঙ্গে অনেকগুলা দৃষ্টিই তাহার উপর পড়িল ; এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সাগ্রহ আহ্লাদের অস্পষ্ট স্বর ও সানন্দ দৃষ্টি কিশোরের দিকে ছুটিয়া আসিল। মোহিনীবাবুর কণ্ঠই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে ভাষা দ্বারা অভিনন্দিত করিল, "এই যে, এস বাবা এস! তোমাদেরই কথা হচ্ছিল এখনি! আমার বিনয় ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দি, এস। বিনয় আজ এই সবে ট্রেণ থেকে নেমেছে ; কিন্তু এখনি আমরা এক দিন একটা ভাল রকম গান-বাজনার বৈঠক বসাবার পরামর্শ আঁটতে আরম্ভ করে দিয়েছি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, কিশোর? এই দিকে এসে বসো।" বলিয়া

মোহিনীবাবু নিজেরই দীর্ঘ আসনখানার একদিক নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আবার মহোৎসাহে কন্যাদের পানে চাহিয়া নিজের অসমাপ্ত কথা পুনরারম্ভ করিলেন, "না বাপু, সেটি তোমরা এখনো পাচ্ছ না। এই ঝাড়া দুটি মাস আমি একা একা মুখটি বুজে আছি—বিনয় আস্‌তেই যে তোমরা তাকে এখনি দখল করে বস্‌বে, সেটি হচ্চে না। আগে আমাদের বুড়োদের দুটো-চারটে বৈঠক আর আড্ডা দেওয়া শেষ হয়ে যাবে—তার পরে তোমাদের দখলে আমি বিনযকে ছেড়ে দেব। কি বল ভায়া?" বলিয়া নিজের উৎসাহে তিনি নিজেই হাস্য করিতে লাগিলেন। কিশোর যে এখনো দ্বারের নিকট হইতে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না, সে বিষয়ে তখনো তাঁহার মনোযোগ আকর্ষিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি সমান উৎসাহে যে স্থানটা কিশোরকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন, নিজের আসনের সেই বাহুল্য স্থানটিকে কিশোরের উদ্দেশে পরম যত্নে হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া পুনঃ পুনঃ চাপ্‌ড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে পুত্র কন্যা এবং কিশোরকে অভয় দিবার জন্য পুনরায় হাসির সহিত বলিলেন, "অবশ্য তাতে তোমাদের ভয়ের বিষয়ও নেই, সেই বুড়োদের আসরেও তোমাদের তো অবারিত দ্বার। কেবল তোমাদের স্পেশাল বৈঠক—অর্থাৎ বন্ধুবান্ধব এনে নিজেদের ঘরের কোণে মজলিস, সেইটি তোমরা এখন দিন কতক পাচ্ছ না, বুঝ্‌লে বাপু? বিনয়ের শরীরও আবার যা হয়েছে! তোমরা তো আমাদের মত অল্পে সন্তুষ্ট হতে জান না,—বেচারাকে এখন তোমাদের হাতে দেওয়াই অবিধি। হয় তো এতই ফরমাস্‌ বাড়্‌বে—"

বাপের অসংযত বাক্য-স্রোতে বাধা দিয়া কল্যাণী সোদ্বেগে বলিয়া উঠিল, "ও কি, কিশোর অমন করে দাঁড়িয়েই রইলে যে! এদিকে এস—এসে বসো।"

কল্যাণীর উচ্চ সম্বোধনে সচকিত হইয়া কিশোর চাহিয়া দেখিল—

আবার অনেকগুলা চক্ষু যুগপৎ তাহার উপর পতিত হইয়াছে। আশ্রয়ের জন্য সে এতক্ষণ পর্দ্দার কাপড়টা এক হাতে মুঠা করিয়া ধরিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার সেটা ছাড়িয়া দিয়া সে দুই-চারি পা পিছু হটিতেই গৃহমধ্য হইতে কয়টা ব্যগ্র আহ্বান ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"ও কি, যাও কোথায়? কিশোর—কিশোর—" সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের যেন বোধ হইল অজিত ও আরও কে কে তাহার দিকে উঠিয়াও আসিতেছে। অমনি ত্রস্তে কিশোর কম্পিত স্বরে "আজ নয় কাল—কাল আস্‌ব—আজ মাকে পৌঁছুতে মাত্র এসেছিলাম—বড্ড দরকার" বলিতে বলিতে দীর্ঘ দীর্ঘ চরণ-ক্ষেপে একটা তীব্র অস্থিরতার সঙ্গেই একেবারে গিয়া ট্যাক্‌সিতে উঠিয়া বসিল। মাতাকে যে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া, চালককে "চলো" বলিয়া আদেশ করিতেই, সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সম্মুখের বারান্দায় বিস্ময়-বিমূঢ় কয়েক-জোড়া চোখই যে জমিয়া গিয়াছিল, সেদিকে কিশোর আর একেবারেই চাহিল না। একবার কাণে গেল, "কিশোরবাবু, বাবা ডাক্‌চেন যে—শুন্‌চেন না?" কিশোর ইহার আর কোন উত্তরই দিল না; অজিতকে অগ্রসর দেখিয়াও চালককে নিবারণ করিল না। মুহূর্ত্তেই ধূলা উড়াইয়া সে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

অজিত হলে ফিরিয়া গিয়া দেখিল, পিতা যেন অবাক্ হইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া আছেন,—কল্যাণী, ঝরণাও যেন রুদ্ধশ্বাসে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অজিতকে একা ফিরিতে দেখিয়া মোহিনীবাবু সাশ্চর্য্যে বলিলেন, "এলো না?"

"না, চলে গেল।"

তিনি তখন যেন আরও খানিক অবাক্ হইয়া প্রত্যেকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড, এমন

তো সে কখনো করে না! অতি শিষ্ট ছেলে, অতি ভদ্র, সে আজ হঠাৎ —কোন অসুখই কি করলো! কি রকম তোর মনে হয়—জিতু?"

"কিছু তো বুঝতে পারলাম না" বলিয়া জিতুও চিন্তিতভাবে রহিল। সকলেই সমান আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিল। কল্যাণী তখন বলিল, "যাই হোক, মাসীমাকে কথাটা জানাই, যদি হঠাৎ কোন অসুখই বোধ করে থাকে, তিনিও শুনলেই নিশ্চয় এখনি চলে যাবেন।"

কল্যাণী উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলে গৃহমধ্যে যেন একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। একটু আগে যে গৃহে এত হাস্যালাপ চলিতেছিল, কয়েক মুহূর্ত্তেই সে ভাব একেবারে যেন উল্টাইয়া গিয়াছে। কেবল তাহার মধ্যে সেই শীর্ণকায় নবাগত ব্যক্তি, ঝরণাদের সেই কাকাটি, একই রকম শুদ্ধ গম্ভীরতার সঙ্গে অমন ভাবে জানালার বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকারমাখা অঞ্চলের পানে চাহিয়া ছিলেন। সে জগৎ ঢাকিয়াছে বটে, কিন্তু মানুষকে লুকাইবার তাহার ক্ষমতা কোথায়! এই যে কোণের মধ্যে তাহার অতন্দ্র দীপ্ত চক্ষু জ্বলিতেছে! এ আলো এ আঁধার, দুইই যেন তাঁহার আঁচলের এ পিঠ্ ও পিঠ্।

তখনি ঘরের কার বা গাড়ী যাহা হোক শীঘ্র প্রস্তুত হউক এইরূপ আদেশ চাকরদের ঘরের দিকে রওনা হইল এবং অবিলম্বে জিতুবাবুও তাহাদের মাসীমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

এই সহসা আগত দুশ্চিন্তা ও অপ্রসন্নতার ভারকে মন হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টায় তখন মোহিনীবাবু তাঁহার কথার ছিন্ন সূত্রকে জোড়া দিবার উদ্যোগ করিলেন। "হ্যাঁ, তার পরে পুরী থেকে কোন্ দিকে গেলে? মান্দ্রাজটা নিশ্চয়ই ছেড়ে আসনি, কি বল? যখন ওয়ালটেয়ার—"

"আজ একটু সকাল সকাল শুই দাদা—কি বলেন?" বলিয়া ঝরণার কাকা চেয়ার ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেই, তাঁহার মস্তকের

রুক্ষ চুলের মধ্যে এতক্ষণ যে একখানি কোমল হস্ত মৃদুভাবে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দরুণ স্তব্ধ হইয়া একস্থানেই কিছুক্ষণ আবদ্ধ হইয়া থাকিতেছিল, সেখানি সহসা স্খলিত হইয়া তাঁহার স্কন্ধ বাহিয়া যেন নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িল। তখনি সচকিতে সেই হাতখানি নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মা—"

ঝরণা চমকিয়া তাঁহার পানে চাহিল। এই 'মা' শব্দটী আজ কি করুণ, কি আর্ত্ত ভাবে ভরা। এমন স্বর যেন তাঁহার কণ্ঠে ঝরণা আর কখনো শোনে নাই। সে ব্যথিত হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল—ইতিমধ্যে মোহিনীবাবু ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক্—ঠিক্, আজ যে তুমি ক্লান্ত আছ—সে কথা ভুলেই গেছি। তাতে যে শরীর হয়েছে তোমার! ঝরণা, তোর কাকাকে আর বকাস্নি, খাবারের কত দেরী ভাখ দিখি। সকাল সকাল খাইয়ে ওঁকে শুতে দে, আর বেশী বিরক্ত করিস্নে।"

এইবার ঝরণার মুখে একটু হাসি আসিল। সেইই যেন এতক্ষণ যত যা করিবার সমস্ত করিয়াছে এবং করিতেছে! কিন্তু সেটুকু প্রকাশ না করিয়া কেবল সাদরে কাকার দিকে চাহিয়া বলিল, "এই তো সবে জল খেয়েছেন। এর মধ্যে খেতে পারবেন কেন,—তার চেয়ে—"

"হ্যাঁ, বড্ডই তো জল খাইয়েছিস্, না চা খাওয়া, না কিছু। বিনয়, আমি এখনো তোমায় বল্‌ছি, তুমি এখনো চা ধর। এই যে রাস্তার কষ্ট, গা-হাত-পা-ব্যথা, ক্লান্তি—"

"যান্ তো কাকা, আপনি গিয়ে একটু শুন্ তো, নইলে নিজেই ঐ রকম করতে থাকবেন, আর বল্‌বার বেলায় আমাদের বলবেন, বকাস্নে বেশী। ঐ দিদি আসছেন্ আবার, ওঁর সঙ্গে তো কেউই আমরা পেরে উঠ্‌ব না! পালান্ আপনি এই বেলা।"

"বটেরে বেটী? একা আমারই দোষ? তবে আবার পালাতে বলা হচ্চে কেন কাকাকে, শুনি? এবার ভূতেদের মুখেও রাম নাম বেরিয়েছে, শুনচো হে বিনয়? কিন্তু তুমিও ওদের দলে পড, এই আমার বড় দুঃখ। আমার দলে তোমরা কেউই নও, কেবল—"

"কাকা আপনি টল্‌ছেন—দাঁড়াতে পারছেন না যে, শুতে যান। একটু ঘুমিয়ে নিলে ক্লান্তি যাবে। তার পরে একটু বেশী রাত্রে আপনাকে খেতে ডাকবো। কেমন? একটু শুতে যান এখন।"

আবার যেন কোন্ অতি-দূব হইতে অতি ক্ষীণস্বরে কে বলিল, "যাই মা—তবে এখন আসি।"

৭

সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে দেখা,—তখনকার এগারো বৎসরের বালক কিশোর এখন একবিংশতি বর্ষীয় যুবা, তবু চিনিতে তো ভুল হইল না। পূর্ব্ব শ্রীর কণামাত্র এখন সেই শীর্ণ রুক্ষ অকাল-জরায় আচ্ছন্ন শরীরে নাই—তবুও কি করিয়া যে ইহা সম্ভব হইল, তাহা কিশোর ভাবিয়া পাইতেছিল না। সমস্ত রাত্রি সে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতেছিল, ইহা তাহার কল্পনামাত্রই নয় তো? যাহার স্মৃতি এই দশ বৎসর প্রাণপণে সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে, নিজের আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার সম্বন্ধে একটা দারুণ লজ্জা ক্রমে বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষের আকারে তাহার কিশোর জীবনকে জর্জ্জরিত করিয়া শেষে সেই বিদ্বেষের পাত্রকেও আঘাতের উপর কঠিনতর আঘাত করিয়া নিজের জীবন-পথ হইতে—বুঝি সংসারের পথ হইতেই—সরাইয়া দিয়াছে, এই দশ বৎসরে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত সে যে আর মনে আনিতে চাহে নাই—

তবু সেই নাম কাণে আসিবামাত্র কি করিয়া অন্তর মুহূর্ত্তের মধ্যে বলিয়া দিল, এই সেই ব্যক্তি। দশ বৎসরের দীর্ঘ অদর্শন, আকৃতির প্রভূত পরিবর্ত্তন, সর্ব্বশেষ দশ বৎসরের অনিচ্ছুক বালকের অন্তরস্থ বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণায় জড়িত অপ্রিয় স্মৃতি, তাহার এতখানি প্রভাব দেখিয়া যুবক কিশোর আজ স্তম্ভিত হইতেছিল। বার বার সে ভাবিবার চেষ্টা করিতেছিল, এই শীর্ণ জরাগ্রস্ত কুদর্শন প্রৌঢ়ত্ব কি সেই উজ্জ্বল-কান্তি সুদর্শন বলিষ্ঠ যুবকের পরিণাম?—না, না—এ বুঝি সে নয়! রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় এ তাহার একটা ভ্রম মাত্র। নামের একত্ব শুনিয়া তাহার অন্তরস্থ দুর্ব্বলতাই তাহাকে বুঝি এই অকারণ ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে।

মন কিন্তু এই সান্ত্বনা লইবার বেশীক্ষণ অবকাশ পাইতেছিল না। অন্তরে ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হওয়ার স্মৃতিতে যে শিশুকে 'মাণিক' বলিয়া তাহার অন্তশ্চক্ষুর সামনে আনিয়া দাঁড় করাইতেছিল, সেই পিতৃ-সর্ব্বস্ব পিতৃমাত্র-জীবিত বালক 'মাণিক' হইতে সেই পিতার উপরে ঘোর বিতৃষ্ণ বিদ্বিষ্ট কিশোর কিশোর একবাক্যে এইস্বরে যে তাহাকে আজ বুঝাইয়া দিতেছে, এই সেই,—সেই এই! যুবক কিশোরের তো আজ সেই শিশু মাণিক ও সেই কিশোরের কথা ঠেলিবার কোন উপায় নাই! যে ব্যক্তির সহিত তাহার আজ কোন সম্বন্ধই নাই বলিয়াই তাহার ধারণা, তাহার সহিত কিশোরের অন্তর-বাসী ঐ দুই বালকের যে সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ—তাহারা যাহাকে "এই সেই" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, যুবক কিশোরের সাধ্যও নাই যে তাহাদের সে নির্দ্দেশকে সে অন্যথা করিতে পারে! তাহাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির অস্তিত্ব যে একেবারে অভিন্ন। না—সেইই বটে, ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

সমস্ত রাত্রি কিশোরের একটা তন্দ্রার জড়তার মধ্যে কাটিল। যেন কতকগুলা অতি অস্পষ্ট মোছা মোছা ধোঁয়া ধোঁয়া স্বপ্নের সমষ্টি! যেন

সেই তিন বছরের মাণিক কাহার গলা ধরিয়া বুকে জড়াইয়া বলিতেছে, "বাবা—আমি তোমায় বুকে 'মেখে' শোব।" কাহার উপরে অত্যন্ত আবদার করিয়া দামালি করিয়া হাত পা ছুড়িতেছে, বায়না ধরিতেছে—কাঁদিতেছে, আবার কোলে উঠিয়া অপরিসীম সুখের হাসি হাসিতেছে! কাহাকে একদণ্ড দেখিতে না পাইয়া, কাহার সঙ্গ না পাইয়া বুক ফাটাইয়া চেঁচাইতেছে—অভিমানে ফুলিতেছে—আবার কি অপরিসীম আদরে সে ক্ষোভ জুড়াইয়া যাইতেছে! কিশোরের অন্তশ্চক্ষুর উপরে এমনি করিয়া তন্দ্রা জাল বুনিয়া চলিতেছিল, দেহ যেন কেমন এলাইয়া রহিয়াছে—ইন্দ্রিয় সব সমান সজাগ—কিন্তু তবু তাহাদের সাধ্য নাই, সে চেতনের স্বপ্নে বাধা দিতে পারে। অন্তষ্কর্ণের উপরে স্মৃতির দুয়ারে কে যেন অনবরত ডাকিতেছে 'মাণিক—মাণিক।' আর তাহার উত্তরে অতি শিশুকণ্ঠে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হইতেছে, 'বাবা—বাবা—' সে কণ্ঠ যে কিশোরের অত্যন্ত পরিচিত।

"কিশোর!" জোরে যেন মেঘ ডাকিয়া উঠিল—যে মেঘে বাজ পড়ে ঠিক্ তেমনি তাহার শব্দ। সচকিতে কিশোরের অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু একেবারে খুলিয়া গেল—জাগ্রত স্বপ্ন সরিয়া গেল। "এমন করে ঘুমুচ্ছিস্ কেন? ভাল করে শো—সুস্থ হয়ে ঘুমো!" রাজেশ্বরীর এই আদেশে সে পালঙ্কের অন্য দিকে পাশ ফিরিল। তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরের রেশ্‌টুকু আবার কিশোরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া সেখানে বায়স্কোপ রচনা করিয়া চলিল।

স্মৃতির দুয়ারে তেমনি করিয়া কে যেন আবার বলিতেছে, "কিশোর—কিশোর—" কিন্তু কি এ ছবি? এ যে ঘোর অস্পষ্ট। মাণিকের মত তেমনি উজ্জ্বল পরিষ্কার তো নয়। চিন্তার ঘন কুয়াশা—লজ্জার বিদ্যুৎ চমক,—আর ব্যথা—ব্যথা—ব্যথা,—অপরিসীম বেদনায় সে ছবি একেবারে

বিবর্ণ! ক্রমে সেই ব্যর্থ ব্যথার অব্যক্ত লজ্জার আরক্ত ক্ষোভের ঘন-ঘোর মেঘোদয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল ক্রোধ যেন কাহাকে ধ্বংস করিবার জন্যই একেবারে বদ্ধ-পরিকর হইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে! তাহার মাঝে হইতে যেন রুদ্ধ রোষে সাপের মত গর্জ্জাইয়া উঠিতেছে, "চাই না ওঁকে আমি, উনি কেন—কেন উনি আমার কাছে কাছে থাক্‌বেন? সরে যান্ উনি আমার সুমুখ থেকে; কিসের সম্বন্ধ আর আমার ওঁর সঙ্গে?" তারপরে বাজের মত সেই কথা কয়টি নিজের কাণের কাছে আবার ডাকিয়া উঠিল, "বিনয়বাবু গেলে আমি যাব না।"

স্বপ্নের বাজের শব্দে দেহে মনে চমকিয়া কিশোর এইবার একেবারে জাগিয়া উঠিল; জাগিয়া দেখিল, ঘামে দেহ ভিজিয়া গিয়াছে, বুক ধড়্ ধড়্ করিতেছে—মুখ শুষ্ক! বাহিরে চাহিয়া দেখিল, চারিদিক্ আলো—বজ্রাঘাতের নয়—প্রভাতের! নবসূর্য্যের রক্তিম কিরণ সার্শি ভেদ করিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে।

*　　　*　　　*　　　*

বৈকালে রাজেশ্বরী ধীরে ধীরে কিশোরের কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানা আসন টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ তিনি কথাই কহেন না দেখিয়া কিশোর সঙ্কুচিত ভাবে একবার তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিতেই দেখিল, তিনিও নির্ব্বাক ভাবে কিশোরের মুখের পানেই চাহিয়া আছেন। এ ভাব রাজেশ্বরীর পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। তিনি কিছু বলিতে বা সন্ধান লইতে আসিলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করা তাঁহার স্বভাবের একেবারেই বহির্ভূত বিষয়। তাই কিশোর অন্তরে অন্তরে সহসা অনেকখানিই কুণ্ঠিত হইয়া মাথা নামাইল। মনে পড়িল, প্রভাতে মাতার সঙ্গে সাক্ষাতেই ভয়ে সকালেই ক্লাশ আছে বলিয়া সে বাড়ী হইতে পলাইয়াছিল; এবং দুপুরেও এক বন্ধুর নিকটে যাচিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া

এই সাদর নিমন্ত্রণের সংবাদটাও বাড়ীতে পাঠাইয়াছিল। তার পর দুপুরে নিঃশব্দে বাড়ী গিয়া নিজ কক্ষে শুইয়া পড়িয়াছিল। বুঝিতেছিল, এমন করিয়া রাজেশ্বরীর নিকট হইতে কতক্ষণ সে পলাইয়া বাঁচিবে! নিশ্চয়ই কল্যকার জবাবদিহিতে তাহাকে এইবার পড়িতেই হইবে। কিন্তু এখন তাঁহার মুখ দেখিয়া সে যেন দ্বিগুণ ভীত হইয়া পড়িল। তিনিও যে জানিতে পারিয়াছেন তাহাতে তো সন্দেহ মাত্রই নাই। এ ছাড়া আরও কিছু যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু আর কি হইতে পারে, তাহাই কিশোর আন্দাজ করিতে পারিতেছিল না,—তাই সে মাথা নামাইয়া নিঃশব্দে মাতার বাক্যস্ফূর্ত্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আর কিছুক্ষণ পরে রাজেশ্বরী কথা কহিলেন। কোন ভূমিকামাত্র না করিয়া গম্ভীর মুখে ধরা গলায় বলিলেন, "তাহলে সত্যি? সত্যিই তাহলে?"

কিশোর তাঁহার মুখের দিকে না চাহিলেও, তিনি যে কি প্রশ্ন করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছিল। তাই চোখ তুলিতে না পারিয়া একভাবে মাথা নামাইয়াই রহিল। উত্তর না পাইয়া এইবারে রাজেশ্বরীর ধৈর্য্য যেন খানিকটা ভাসিয়া গেল, ঈষৎ আর্ত্ত কণ্ঠে একটু চেঁচাইয়াই পুনর্ব্বার তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সত্যিই তাহলে এই মাষ্টারই আমাদের সেই? সন্দেহমাত্র আর নেই? এ চিঠি তাহলে তারই চিঠি? তারই লেখা এ?"

এইবার কিশোর মাথা তুলিয়া চাহিল। চিঠি! কে কাহাকে লিখিয়াছে? রাজেশ্বরী কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া হস্তস্থিত একখানা কাগজকে হাতের মধ্যে সজোরে নিষ্পেষণ করিতে করিতে যেন নিজেকে কতকটা সাম্‌লাইয়া লইতে লাগিলেন। কিশোর বারকতক তাঁহার হাতের দিকে চাহিয়া আবার মাথা নামাইল। কৌতূহলের বা কিছু জানিবার কি অধিকার আছে তার।

কিছুক্ষণ পরে রাজেশ্বরী পুনর্ব্বার ভগ্নস্বরে বলিলেন, "তুমি তাহলে এই জন্যেই তাকে চিন্‌তে পেরেই পালিয়ে এসেছিলে? না?" কিশোর তখনো হাঁ না কিছুই বলিতে পারিল না।

"বুঝলুম, কিন্তু রাত্রে আমায় একবার জানালে হতো না কি?"

কিশোর তখন মাথা তুলিয়া সজোরে যেন কণ্ঠকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া শুষ্ক শান্ত স্বরে বলিল, "কেন?"

"কেন?—আমার কর্ত্তব্য তাহলে খানিকটা করবার অবকাশ পেতুম।"

একই ভাবে কিশোর আবার উত্তরের প্রত্যাশায় পুনঃ প্রশ্ন করিল, "কি তোমার কর্ত্তব্য?"

পুত্রের শুষ্ক স্বরে কঠিন হইয়া উঠিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "সে তোমায় এখন বলা নিরর্থক। কিন্তু ওদের কি এতে সন্দেহ কর্‌তে বাকি থাকৃল, ভেবেচ?"

"কিসের সন্দেহ?"

"সেও তোমায় ব'লে বুঝোতে হবে? ওরা কি সন্দেহ করছে না যে নিশ্চয় এই বিনয়বাবুর সঙ্গে আমাদের কোন গূঢ়—"

"সন্দেহ মাত্র? তাও কি আজ নতুন করে মা? ঝরণা বা ওরা কি জানেন না যে আমি কি, কি আমার পরিচয়—আমি কে?"

দ্বিগুণ কঠোরভাবে রাজেশ্বরী বলিলেন, "তোমার এ পরিচয়, এ তো বেশী অস্বাভাবিক নয়, কিশোর। জগতে এমন ঢের জায়গায় তোমার মত ছেলে আমার মত 'মা', আছে। কিন্তু যা কাল তুমি তাদের বুঝিয়ে এসেছ,—এই ঘটনাটাই জগতে খুব বিরল।"

রাজেশ্বরীর এ কথায় উত্তেজিত না হইয়া কিশোর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি মিছে লজ্জা বোধ করছ মা! আমাদের কথা তো ওঁরা জানেনই!

যদি তাঁকে ওঁরা এখন চিন্‌তেই পেরে থাকেন—তাতেই বা নতুন ক'রে কি এমন লজ্জার বিষয় হয়েছে—"

"তোমার পক্ষে না হতে পারে, আমার পক্ষে হয়েছে। যদি ওরা সবটা না বুঝ্‌তে পেরে থাকে, তাহলে এইটেই সব আগে তাদের মনে হবে না কি, এমন রাক্ষসী আমি যে তার ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে তাকে এমন পথের ভিখারী ক'রে বাড়ী থেকে পর্য্যন্ত তাড়িয়ে দিয়েছি?"

কিশোর আর কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে একখানা পুস্তক টানিয়া লইয়া দৃষ্টিকে সেই দিকে নিবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, রাজেশ্বরী আবার যেন অসংযত হইয়া কান্না-ভরা গলায় বলিয়া উঠিলেন, "এ আমি সহ্য কর্‌তে পারব না। এখনো ভাল করে খোঁজ করলে ধরতে পারা যায়, বোধ হয়। ওরাও এখনো ঠিক্ ধরতে পারেনি। কি করেই বা পারবে? এ কি কখনো জগতে কেউ দেখেছে যে—"

কিশোর বাধা দিয়া বলিল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ মা, ঝরণার তাঁর সঙ্গে খুব পরিচয় ছিল, আর তিনিও ঝরণাকে—"

"কি যে বলিস্। ঝরণা তখন সাত-আট বছরের মেয়ে মাত্র, আর সেই বা কতটুকুর পরিচয়? ওরা তাকে কখনই চিন্‌তো না। ঝরণার মামার সঙ্গে মামার বাড়ীর লোকের সঙ্গে যেটুকু তার আলাপ হয়, সেও কারো মনে রাখার মত ঘটনা নয়। ঝরণার বাবা তো দেখেনইনি। তবে এ হতে পারে যে সে ঝরণার মায়াতে পড়েই ওদের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, এটা দৈবাতের ঘটনা নয়। এই দ্যাখো না তার চিঠি—" বলিয়া রাজেশ্বরী হাতের কাগজটুকু তার সাম্‌নে ফেলিয়া দিলেন। কিশোর যন্ত্র-চালিতের মত সেটুকু তুলিয়া লইয়া চোখের সাম্‌নে মেলিয়া ধরিল। মোহিনীবাবুর নামে শিরোনামা দিয়া পত্রটুকুর আরম্ভ।

"দাদা! তোমার অকৃতজ্ঞ ভাইকে আর না দেখতে পেলে তোমরা আর দুঃখ বোধ করো না—খুঁজোও না! তার আর তোমাদের কাছে, তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার স্বর্গে স্থান পাবার উপায় নেই, তাই সে অভিশপ্ত ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে দূরে সরে গেল। এ জীবনে আর দেখা হবে না। আমার কল্পনার লতায় ফুল ধরা আমি নিজের চোখে দেখ্‌তে পাব না, এমনি আমি হতভাগ্য! ঝরণাকে, আমার নির্ঝরিণীকে আমার অজস্র আশীর্ব্বাদ দিও, আর তোমরা আমার প্রণাম নিও। এর বেশী আজ আর কিছু জানাবার অধিকারী আমি নই। ইতি—

তোমার বিনয় ভাই।"

কিশোর পত্রটুকু পড়িয়াও নিস্পন্দভাবে রহিয়াছে দেখিয়া, রাজেশ্বরী উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এখনো তুই চুপ্‌ করে আছিস্? কি পাষাণ, ওরে কিশোর, কি পাষাণ তুই!"

"কি আমায় করতে বল মা তুমি?"

ছেলের চোখের কোণে এমন একটী তীব্র বিদ্যুতের ঝলক্, মুখে এমন একটি বজ্রগর্ভ মেঘের কৃষ্ণকান্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, তাহা দেখিয়া রাজেশ্বরী ধীরে ধীরে যেন নিভিয়া আসিলেন। তাঁহার উদ্দাম অধীরতা ক্রমে যেন কিসের এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। কিশোরকে আর বেশী কিছু বলিতে তাঁহার যেন সাহস হইল না, কেবল একবার শেষ চেষ্টার মত মৃদু বিষাদপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তবে কি তাকে খুঁজে পেয়েও এমনি করে আবার যেতে দিতে হবে? তার এত থাকৃতেও সে এমনি করে পরের দুয়ারে ভিক্ষা করে নিরাশ্রয় হয়ে দিন কাটাবে?"

"দশ বৎসর তো কেটেছে,—বাকিগুলোও কাটবে।"

রাজেশ্বরী মনের সঙ্গে দৃঢ় পণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এত বড় নিষ্ঠুর অমানুষ হৃদয়হীন ছেলের সম্বন্ধে আর তিনি কোন আশা-ভরসাই পোষণ করিবেন না। সে যাহা ইচ্ছা করুক, যে পথে চলিতে চায় চলুক, তিনি আর তাহার কোন কথারই মধ্যে থাকিবেন না। কোন রকমে আর দিন কতক কাটাইয়া লইয়া তাহার একটা বিবাহ দিয়া কাশী বাস করিবেন। কিন্তু কিশোরের এই বিবাহ দেওয়ার কথাটা যে তাঁহার মনে উঠিতেছে, ইহা লইয়াও তাঁহার কপালে কোন কষ্ট ভোগ আছে কি না, তাই বা কে জানে! এই যে ভদ্র পরিবারের সঙ্গে তিনি একটা মাখা-মাখি করিয়াছেন, ইহাতে আসল কথা বুঝিতে কি তাহাদের বাকি আছে! তাঁহার মনোগত আকাঙ্ক্ষার আভাষ তিনি নিজ মুখেও তাহাদের জানাইতে তো বাকি রাখেন নাই। এখন এই দুর্দ্দান্ত ছেলে যদি বলিয়া বসে, আমি তার কি জানি! আমি কি তোমায় একদিনও এমন কথা বলিয়াছিলাম যে তুমি এতখানি করিয়া বসিয়াছ? তোমার ইচ্ছা বা সাধের দায়ে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এতখানি বাঁধা পড়িতে পারে না! এ ছেলের দ্বারা যে সবই সম্ভব, তাহা রাজেশ্বরী যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন। আজ দশ বৎসর বিনয়ের জন্য যে ব্যথা তিনি সহিয়া আসিতেছেন, সম্প্রতি তাহা নূতন হইয়া সঙ্গে আরও কতকগুলো জিনিস লইয়া অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিলেও, তথাপি এ যেন বহুদিনের সহনীয় পুরাতন ব্যথা, পুরানো কথা! আর এই যে স্বামী-বিয়োগের পর হইতে এই সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ যে আশায় লুব্ধ হইয়া আত্মীয়ের বুক ভাঙিয়া দিয়া তাহার ক্রোড় হইতে তাহার বুকের নিধিকে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দেশান্তরী পথের ভিক্ষুক করিবার কারণ-স্বরূপ হইয়াছেন, সে আশাতেও কি কিশোর বাদ সাধিবে? তাঁহাকে কি সংসার সাজাইতে দিবে না? পরের ছেলেকে আপন করিতে এই পনেরো বৎসর সুখ-দুঃখের ভাগ সমানভাবেই তাঁহার ভাগ্যে উঠিয়াছে,

কিন্তু এখন এই বৃদ্ধ বয়সে সে ছেলে হইতে তাঁহার কি মূল আশার নির্ব্বাণ হইবে? তাঁহার কি বধূ নাতি নাতিনীর মুখ দেখা ভাগ্যে নাই? তাঁহার স্বামীর নিজের শ্বশুর-বংশের জল-পিণ্ড-প্রাপ্তিরও কি এই অকৃতজ্ঞ সন্তান হইতে সম্ভাবনা নাই? ইহার স্বভাব দেখিয়া এখন রাজেশ্বরীর যেন সবই সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কিসের জন্য রাজেশ্বরী এতখানি কাণ্ড ঘটাইলেন? কিসের জন্য বিনয়কে এমন করিয়া নির্য্যাতিত করিলেন? তাঁহার সেই পাপেই কি কিশোর এমন নৃশংস-স্বভাব হইয়া উঠিল? হতাশে রাজেশ্বরীর বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া উঠিতেছিল।

ইতিমধ্যে ঝরণাদের বাড়ী হইতে দুই তিনবার গাড়ী আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। নলি বুনা আসিয়া বলিয়া গিয়াছে, তাহাদের কাকা আবার চলিয়া যাওয়াতে বাড়ীশুদ্ধ সকলে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ! মেজদিদি বড়দিদি তো কাঁদিয়া সারা হইতেছেন; মাসিমাকে যাইতে হইবে মা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে, ইত্যাদি। শরীর খারাপের অছিলা করিয়া রাজেশ্বরী তাহাদের ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার শুষ্ক মুখ ও প্রায় শয্যাগত অবস্থা দেখিয়া বালক-বালিকারা তাহা সম্ভব বলিয়াও মনে করিয়া গিয়াছে। তথাপি রাজেশ্বরী বুঝিতেছিলেন, মোহিনীবাবুর স্ত্রী ও ঝরণারা নিশ্চয়ই কিছু একটা মনে করিয়া লইয়াছে, নহিলে এতক্ষণ নিশ্চয় কল্যাণী বা ঝরণা বা জিতু কেহ না কেহ আসিয়া পড়িত! মাত্র ঐ বালক-বালিকা দুটিকে পাঠাইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতেন না! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে,—কিশোর তাঁহাকে আজ দশ বৎসরই তো এ লজ্জার এ বেদনার কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখন এই ভদ্র পরিবারের নিকটেও আবার তাঁহাকে কোন্ লজ্জায় না জানি পড়িতে হইবে! সাধ যাহা জন্মিয়াছিল—স্নেহমায়ার যে আদান-প্রদান

হইয়া গিয়াছিল, তাহার কথা দূরে যাক্—রাজেশ্বরীর মত যাহাদের পরের নিকট হইতে জীবনের প্রত্যেক বস্তুকে ভিক্ষা করিয়া আদায় করিতে হয়—ভাগ্য যাহাদের জগতে কোন বিধি-দত্ত অধিকারের দাবী করিতে দেয় নাই, তাহাদের এ সব সাধ বা আশা করাই বিড়ম্বনা। রাজেশ্বরী এখন কোনরূপে তাহাদের নিকটে আর মুখ না দেখাইয়া পলাইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিশোরকে জানাইলেন, তিনি বাড়ী যাইতে চান্; কিশোর যেন শীঘ্র তাহার উদ্যোগ করিয়া দেয়।

কিন্তু কিশোর যখন বিনা-বাধাদানে তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিল, তখন তিনি অন্তরে পুনর্ব্বার ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন! তবে সত্যই কিশোর ঝরণাকে পাইবার জন্য উৎসুক নয়? কি ভুলই তবে তিনি করিতে বসিয়াছিলেন? নিজের মজ্জাগত সংস্কার-গত ধারণাকে দূরে ঠেলিয়া, আত্মীয়-স্বজনের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া, এই যে বয়ঃপ্রাপ্তা শিক্ষিতা কুমারীকে তাঁহার মত পল্লীসমাজের অন্তর্ভুক্তা বর্ষীয়সী রমণী সাদরে নিজ অঙ্কে বরণ করিয়া লইয়া আপনার সর্ব্ব অধিকার ও অগাধ স্নেহের আসনে বসাইতেছিলেন, সে কাহার জন্য? এই কন্যা কাহার ঈপ্সিতা মনে করিয়া?—এতখানি ভুল তাঁহাকে যে করাইল, সেই দুরবগাহ-চরিত্র যুবক না জানি তাঁহাকে তাঁহার এই শেষ জীবনে আরও কতই অপদস্থ না করিবে! না, আর না!—সময় থাকিতে এইবেলা তাঁহার সতর্ক হওয়ার দরকার হইতেছে।

দুই-তিন দিনে সমস্ত ঠিক্ হইল। পরদিন তাঁহারা দেশে যাইবেন। রাজেশ্বরী দুর্ম্মনাভাবে জানালার নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। দুয়ারে মোটরের হর্ণ বাজিতেই চাহিয়া দেখিলেন, মোহিনীবাবুর বাড়ীর কার, —নলিকে সঙ্গে লইয়া ঝরণার মা নামিতেছেন। দুর্নিবার লজ্জায় কি

করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, রাজেশ্বরী শয্যায় আশ্রয় লইয়া একটা গাত্রবস্ত্র টানিয়া লইলেন।

ঝরণার মা আসিয়া নিকটে বসিয়া বলিলেন, "শরীর কি এখনো খারাপ দিদি?"

"হাঁ ভাই," বলিয়া রাজেশ্বরী উঠিয়া বসিয়া নলিনীকে নিকটে টানিয়া লইলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া ঝরণার মাতা বলিলেন, "শুনলাম দিদি তুমি দেশে যাচ্ছ! আবার কতদিনে আসবে—কে কোথায় থাকব, তখন আর দেখা হয় কি না হয়,—তাই একবার দেখা করতে এলাম ভাই।"

রাজেশ্বরী প্রায় রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এইবার না জানি তিনি কোন্ কথা বলেন! কিন্তু যখন কয়েক মিনিট ধরিয়া অতি সরলকণ্ঠে মাত্র তাঁহাদের নিরাময় প্রশ্ন করিয়া এবং আশ্ পাশ্ আরও দুই চারিটী কথা কহিয়া জজ-গৃহিণী বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন রাজেশ্বরীও ইঁহাদের আভ্যন্তরিক সৌজন্যের নিকটে মনে মনে মাথা হেঁট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, তাঁহাদের দিক্ হইতে কি অভদ্রভাবেই এই পরিচয়ের শেষ হইতেছিল! কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তিরা সকলের চক্ষের নিকটে কেমন সরল সুন্দরভাবে ইহার সমাধান করিয়া দিল। এতক্ষণে রাজেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, "কল্যাণীরা কেমন আছে?" ঝরণার নাম তাঁহার মুখে তখনো আসিতেছিল না। "ভাল আছে, তবে খোকাটার একটু জ্বর হয়ে ঘ্যাৎ-ঘেঁতে হয়েছে, তাই তোমায় প্রণাম করতে আসতে পেলে না। দেখ্‌বো, কালও যদি একবার আসতে পারে।"

তাঁহার সঙ্গে চলিতে চলিতে ঈষৎ জড়িত স্বরে রাজেশ্বরী বলিলেন, "আর ঝরণা?"

"তাকে ত জানই দিদি, পড়া নিয়ে ব্যস্ত! ক'দিন 'মাথা ধরা' 'মাথা ধরা' করে ক্লাশ পর্য্যন্ত কর্‌তে পারেনি। সেও কাল পারে যদি 'কলি'র সঙ্গে—থাক্‌ দিদি, তোমার শরীর খারাপ, নীচে আর নেমো না, আসি ভাই তবে!" বলিয়া নত হইয়া তিনি রাজেশ্বরীর পদধূলি গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেই, রাজেশ্বরী তাঁহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া অন্তর্গূঢ়-বাষ্পে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া বলিলেন, "চল, আমিও যাব—তাকে একবার দেখ্‌তে!"

"তুমি? এই অসুস্থ শরীরে? রোদের ঝাঁজ রয়েছে এখনো—!"

"তা হোক্‌।" জজ-গৃহিণী কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন, "কিশোর কি বল্‌বে—যাক্‌ দিদি, আমি তাদের গিয়ে তোমার আশীর্ব্বাদ দেবো—তোমার কথা বল্‌ব—"

"না না ভাই—আমায় নিয়ে চ' একবার—তোর হাত ধর্‌ছি—" রাজেশ্বরীর আর্ত্ত আগ্রহের উত্তরে তাঁহার হাতখানি সশ্রদ্ধ সম্মানের সহিত হাতে লইলেন; ঝরণার মা তাঁহাকে 'কারে' উঠাইয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া লইলেন।

সন্ধ্যার পরে জিতু যখন তাঁহাকে তাঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া পায়ের ধূলা লইয়া হাসিমুখে "আসি এবার মাসীমা" বলিয়া চলিয়া গেল, তখন এই কয়েক ঘণ্টা সংযত অশ্রুজল রোধ করিবার তাঁহার শক্তি রহিল না। পরিত্যক্ত শয্যার উপরে আবার দেহ-ভার ঢালিয়া দিয়া তিনি অশ্রুরুদ্ধ নয়নে মনে মনে ঝরণার শান্ত সুন্দর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, সত্যই কি মাথা ধরার জন্যই মুখখানা আজ অমন দেখালো?—'কলি' 'নলি' এরা তো আগের মত ভাল কথা কইলো—প্রণাম কর্‌লো—চ'লে যাওয়ার জন্য দুঃখ কর্‌লো, কিন্তু সে তো একটাও কথা কইলো না। একবার প্রণাম ক'রে সেই যে ক' মিনিট সামনে ছিল,

মুখখানা যেন একেবারে সাদা সাদা!—কেন?—শুধু কি সেই জন্যই? বাড়ীর সবাই তো তাদের কাকার জন্য একরকম দুঃখ ভাব নিয়েই আছে, কিন্তু তার কেন সব-চেয়ে বেশী নিঝুম ভাব? সে কি—"

কিশোর ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, "মা গাড়ী রিজার্ভ হয়েছে। কাল বেলা এগারোটার মধ্যেই বেরুতে হবে।" রাজেশ্বরী কোন উত্তর দিলেন না, অথবা উত্তর দিতেই পারিতেছিলেন না। কিশোর তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আবার বলিল, "আবার মাথা ধর্‌লো মা?"

"হুঁ।"

"আর একটু বেড়িয়ে এলে না কেন ফাঁকার দিকে?—খোলা বাতাসে মাথাটা ছাড়্‌তো।"

"আমায় কি ঠাট্টা করতেও চাস কিশোর?"

কিশোর একটু চকিতভাবে বিস্মিত দৃষ্টিতে মাতার পানে চাহিল। এমন ভাবের কথা তাঁহার মুখে সে আর কখনো শোনে নাই। কিশোরের দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া রাজেশ্বরী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "কাদের সৌজন্যের দায়ে ভদ্রতা রক্ষা কর্‌তে আবার আমি তাদের কাছে মুখ দেখাতে পার্‌লাম, তা কি জানিস্? জিতুর মা নিজে এসেছিলেন; নিজে তারা আমায় বিদায় দেবার জন্য—"

"শুন্‌লাম। কিন্তু তুমি আবার কেন তোমার এই শরীরে এ কষ্ট কর্‌তে গেলে?"

"কেন গেলাম? এ কথা মাত্র তুই-ই বল্‌তে পারিস্! তুই বুঝি ভাব্‌চিস্, তোর কাণ্ড নিয়ে সমালোচনা কর্‌বার জন্য—তোর ব্যাপারটা বোঝ্‌বার জন্যেই তারা ধড়্‌ফড়্‌ করে মরছে? তোর মন্দ অদৃষ্ট বলেই কিশোর তুই এতদিনের আলাপেও তাদের চিনলিনে। ছোট ছেলেমেয়ে ক'টা পর্য্যন্ত এমন একটা কথা তুল্‌লে না, যাতে লজ্জা পাই, কি কষ্ট

পাই। সেই তার চলে যাওয়ার পরের দিন—সে দিন সমস্ত দিন তোর দেখা না পেয়ে, রাত্রে ওদের বাড়ী থেকে ঐ রকম ক'রে আচম্‌কা চলে কেন এলি, বুঝ্‌তে ওদের কাছে গিয়েছিলাম। রাত্রে তোর ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছিল, বুঝি—বুঝি, ঝরণার বিষয়েই কিছু ভেবে তুই অমন করেছিলি, কিন্তু ওদের কাছে ঐ চিঠি আর ঐ রকম কথাবার্ত্তা শুনে যখন আমার দুঃখে সন্দেহে পৃথিবী ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছিল, তখনো তারা এমন একটা প্রশ্ন করেনি, যাতে আমি লজ্জা পাই বা বিব্রত হয়ে পড়ি। কেবল একটু যেন প্রতীক্ষা কর্‌ছিল, যদি আমি কিছু বলে তাদের বুঝিয়ে দিই। আজ আর তাও কর্‌লে না—কিছু একটু ভেবে নিয়েছে হয়তো মনে মনে। কিন্তু—" এইখানে কিশোর "মা" বলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাতে বাধা দিয়া রাজেশ্বরী উগ্র উত্তেজনার সহিত বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "জিতু হঠাৎ একখানা চিঠি হাতে ক'রে 'মা, রমেশ লিখেছে, কাকাকে সে মোগলসরাইয়ে কৌশলে'—এইটুকু চেঁচিয়ে বল্‌তে বল্‌তে এসে প'ড়ে এমন লজ্জা পেয়ে গেল। আর সকলে এমন চুপ ক'রে রইল যে নিজেরই আমার আর সেখানে দাঁড়াতে সাধ্য হচ্ছিল না।"

"তাই তো বল্‌ছি মা, তুমি কেন আবার কষ্ট পেতে গেলে সেখানে ?"

"তোর নিতান্ত মন্দ বরাত কিশোর, তাই তুই এমন মেয়ে পায়ে ঠেল্‌ছিস্। ভাবিস্‌নে যে আমি নিজে মাথায় পড়েছি বলে এ কথা তোকে বল্‌ছি। আমার অদৃষ্টে বৌ নিয়ে কুটুম্ব নিয়ে ঘর করা ঘট্‌লো না বলেই আমার বেশী দুঃখ হচ্ছে—আমি আর সে প্রত্যাশা মনেও রাখি না, জানিস্। আমি বাড়ী গিয়েই কাশীবাসের আয়োজন কর্‌ব—কিন্তু তুই নিজের যা ক্ষতি কর্‌লি, কিশোর—"

এইবার এতক্ষণ পরে রুদ্ধ রক্তের আভায় আরক্ত মুখ তুলিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কিশোর বলিল, "মা কেন এত বকে যাচ্ছ তুমি ? আমার ক্ষতি ? কি

ছিল আমার জীবনে যে তার আবার নতুন করে ক্ষতি করলাম? তুমি কি ভেবেছ, চাইলেই সব জিনিস পাওয়া যায়? তুমি কি ভেবেছ মোহিনীবাবুরা আমরা চাইলেই অমনি—"

বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "কি বল্‌তে চাস্ তুই? কি ভেবে রেখেছিলি, ঝরণাকে যদি আমরা চাইতাম, তাহলে পেতাম না? তাহ'লে তোর ঘটে বুদ্ধি ব'লে কোন জিনিসের বিন্দুও ছিল না! তুই কি দেখিস্‌নি বুঝিস্‌নি—তারা—"

"না, না, না, আমি দেখ্‌তে চাইনে—বুঝতে চাই নে। তুমি জান না, জান না মা, হয়তো ওঁরা রাজী ছিলেন, হয়তো ওঁরা তোমার ইচ্ছায় সায় দিতেন—কিন্তু তা যে হবার নয়, তা তোমরা কেউ জানো না!"

"কি আমরা জানি না? তুই কি ঝরণার কথা বলছিস্? তার মতামত কি তুই জেনেছিলি?" দ্বিগুণ বিস্ময়ে পুত্রের আনত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রাজেশ্বরী যেন অন্য মনে বলিলেন, "কই তোরা তো কখনো একা একা একটা কথাও কস্‌নি। যেমন শুন্‌তে পাওয়া যায়, সে তো তেমন মেয়ে ছিল না! এত লেখা-পড়া শিখলেও তাদের বাড়ীর চাল্ যে আমাদের মতই। ঝরণা কি তোকে কখনো—"

বাধা দিয়া সবেগে কিশোর বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌ছ মা, এ কি আজকের কথা। সেই রাঁচিতে তখনি আমার পরিচয় শুনে দেখোনি কি, কি ঘৃণায় আর আমার সঙ্গে কথা কয়নি? আর আলাপ করেনি? তাঁর কাছ থেকে আমার পরিচয় সে ভাল করেই নিয়েছিল তো! সেই দিনই যে—"

"কিশোর, কিশোর, তুই কি পাষাণ! কতটুকু মেয়ে সে তখন? ঘেন্নারই বা কি এমন প্রমাণ পেয়েছিলি তাতে? হ্যাঁ, আমিও একটু দুঃখ পেয়েছিলাম তার ব্যবহারে—তখন তো জানি না—আরও কতখানি

দুঃখ তাকে নিয়ে আমার ভাগ্যে পাওনা আছে, কিন্তু সে এমনই কি? ছেলেমানুষ একটু অবাক্ হয়ে গিয়েছিল হয়তো, একটু সঙ্কোচ এসেছিল বোধ হয়। সেইটুকু এখনো মনে করে আছিস্? আর দেখতে পাসনি, তারা আমার মনের এ ইচ্ছাটাতে কত আনন্দের ইঙ্গিত আভাষে জানাত? স্পষ্ট করে আমিও বলিনি, তাই তারাও বলেনি, নৈলে আমি যেদিন তার সেই ছোট্ট ঝরণাকে এই দশ বৎসর চিনে রাখার গল্প ঝরণার মার কাছে করেছিলাম, সেদিন—"

"হয় তো তার বাপ-মা রাজী ছিলেন, কিন্তু সে কখনই সম্ভব হতো না—"

"ঝরণা রাজী হতো না? সে যে কেমন মেয়ে, তা তো তুই জানিস্ না। বল তুই, আমি এখনি তোকে দেখাচ্ছি—"

"থামো মা, রক্ষা কর! তুমি যখন বল্‌ছ, হয়তো তাও সম্ভব হতে পারে, তাঁদের বাড়ীতে—কিন্তু আমি কি জানি না যে—"

"কি জানিস্ তুই? সে তোকে ঘৃণা করে? আচ্ছা, আমি কলিকে দিয়ে তোর এ সন্দেহেরও"—

"না মা—" আর্ত্তকণ্ঠে কিশোর ফুকারিয়া উঠিল, "তুমি মনের রঙে জগৎকে রঙিয়ে চলো না আর! তারা হয়তো দয়া ক'রে মায়া ক'রে সবই করতে পারে, কিন্তু আমি কি নিজেকে ভুলতে পারি? আমি কি ভুল্‌তে পারি, আমি জগতের চোখে কত ঘৃণ্য?—কি আমি—কি আমি? আমায় কি কেউ শ্রদ্ধা কর্‌তে পারে? দয়া দিতে পারে, মায়া দিতে পারে, কিন্তু আর-কিছুর কি আমি যোগ্য? তবে কেন আমি তাদের কাছে, যে জিনিসে জগতে আমার অধিকার নেই, তারই ভিক্ষুক হয়ে দাঁড়াব? তা দাঁড়াব না!"

কিশোরের আরক্ত মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া পরস্পর-বিরোধী ভাবের দ্বন্দ্বে রাজেশ্বরীর অন্তরও আর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার প্রকৃত

সহানুভূতিশীল উচ্চ হৃদয়ে কিশোরের দুঃখের ভারও গভীরভাবে ধ্বনিত হইতেছিল। আবার নিজের এতদিনের মাতৃ-অভিমানে আপনার গভীর স্নেহময় প্রকৃতির মাতৃ-হৃদয়েও কিশোরের এই অকৃতজ্ঞতার নিদারুণ ব্যথা বাজিতেছিল। তাই গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কিশোর, পরের ছেলে বলেই তুই আজ আমার মুখের ওপরে এমন সব কথা বলতে পারলি! জগতে তোর মত কি আর কারো হয়নি? এতদিনে বুঝলাম, বুকের রক্ত জল ক'রে দিলেও পর আপনার হয় না,—পরের ছেলে আপনার হয় না। তুই যদি—"

উন্মাদের ন্যায় কিশোর চেঁচাইয়া উঠিল, "ঠিক, একেবারে ঠিক এ কথা! কিন্তু কে আমায় জগতের সকলের কাছে এমন 'পর' করেছে, মা? সে তুমিই তো! কার আমি আপনার? তোমারও না—কারুই না! নিজের জীবন, নিজের অস্তিত্বই .য আমার নিজের কাছেও পরের—নিজের নয়! তবে কোন্ মুখে আমি সকলের মত দাবী করব? তুমি বলেছিলে না যে আমার মত কি কারু হয়নি? না, না, হয়নি, হয়নি! তুমি তো জান না—জান না সব! আমার ছোট বেলার কথা, তখনকার জীবনের মত যা। সেই জায়গা থেকে 'পর' হয়ে যাওয়া যে কত-বড় আঘাত, আর তার পরে সেই 'পর' হয়েও কাছে কাছে চোখের সুমুখে থাকা যে কত বড় যন্ত্রণার, কতখানি লজ্জার, তা কি তুমি অনুভব করতে পারবে? পারবে না, তাই এমন কথা বলতে পেরেছ! মনে ভেবো না যে তোমার দুঃখও আমি বুঝচি না—কিন্তু কেন এমন ভুল করেছিলে মা? 'পর'কে কেন জোর করে আপনার করতে গিয়েছিলে? যা হয় না, তাই করতে যাওয়ার ফলেই তিনটে জীবন এমন হয়ে গেল। এ দেখেও এই জালে আবার একটা প্রাণীকেও জড়াতে ইচ্ছে করে? আর না—এ ভুল আর করব না—"

রাজেশ্বরীর যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, চোখের উপর সব ঝাপসা হইয়া উঠিতেছিল। কিশোরের তীব্র স্বরের আঘাতে মনে হইতেছিল, তিনি এখনি অজ্ঞান হইয়া যাইবেন। তবু তিনি প্রাণপণ বলে খাটের পাশটা চাপিয়া ধরিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন, "তাহলে—তাহলে তুমি বিয়েওকরবেনা? তাঁদের জল-পিণ্ডের কথা—তাঁদের কথা—"

"নিশ্চয়—নিশ্চয় মা, কোথায় আমি ভুলেছি মনে করেছ! নিজের জীবনকে কি কেউ ভুলতে পারে? এত বড 'প্রাণ-যজ্ঞ' কি মিথ্যা যেতে পারে? তোমাদের বংশে তোমার এত বড ক্ষতি কি আমি করতে পারি? কি জন্যে তবে তিনি আমায় উৎসর্গ করেছেন? বিয়ে আমায় করতে হবে বৈকি—নৈলে যে তোমাদের বংশলোপ হবে, সে কি আমি সর্ব্বদাই মনে রাখি না? কিন্তু এর মধ্যে আর ঝরণাকে টেনো না মা, এই মিনতি তোমায়। যা হয়েছে, এর ওপর দিয়েই যাক্—আর না।"

৯

রাজেশ্বরী দেবীকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া কিশোর কয়েক দিন তাঁহার অনুমতির অপেক্ষায় গৃহেই রহিল; কিন্তু সপ্তাহের পরও যখন মাতার কোন ইচ্ছার আভাষমাত্র আর তাহার নিকটে প্রকাশ পাইল না, তখন অগত্যা সে নিজেই তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। কুণ্ঠিত মুখে মাত্র বলিল, "আমি কি এখন কল্‌কাতায় যাব?" মা বলিয়া ডাকিতে মুখে বাধিয়া গেল। সেদিনের সেই উন্মাদ উচ্ছ্বাসের পর কিশোর আর তাঁহার সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতেই পারিতেছিল না!

রাজেশ্বরী কি একটা করিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "যেতে পার।"

ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া কিশোর আবার বলিল, "কবে যাব ?"

"যেদিন তোমার ইচ্ছা।"

কিশোর বুঝিল, তিনি আর তাহার বিষয়ে কোন মতামতই দিতে চাহেন না! তথাপি সে আবার বলিল, "সে বাসা তো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—এখন মেসে থাক্‌ব যখন, তখন সঙ্গে বেশী লোক নিয়ে কি হবে ?"

"যাকে তোমার ইচ্ছা তাকেই নিয়ে যাও—বেশীর দরকার না থাকে, নিও না।"

কিশোর একটু হাসিয়া বলিল—"এম্-এ দেওয়ার পর গেজেট দেখে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদের চেষ্টা দেখতে হবে। এবার বোধ হয় অনেক দিনই বাড়ী আসা হবে না।"

"আচ্ছা।"

কিশোর যেন লগি নামাইয়া রাজেশ্বরীর মনোভাবের তল নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা পাইতেছিল। এমন সংবাদেও তাঁহাকে ঈষৎ মাত্রও বিচলিত না দেখিয়া, এইবার নিঃশব্দে কিছুকাল ভাবিয়া লইয়া, শেষে আরও মাথা নামাইয়া আরও মৃদুস্বরে বলিল, "আমায় কিন্তু এর মধ্যে আবার বাড়ী চলে আস্‌তে হলে মুস্কিলে পড়্‌তে হবে। যদি কোন দরকার থাকে, এখনো দু-এক মাস দেরী করে তবে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে কল্‌কাতায় গিয়ে বস্‌তে পারি।"

"আমার দরকার তো কিছুই দেখ্‌ছি না। তবে তোমার বিষয়-সম্পত্তির যদি কোন কাজ পড়ে, তোমার দেওয়ান গোমস্তাকে এ কথা ব'লে সেই রকম ব্যবস্থা করে যাও। তারা কি বলে এ কথায়, জানো।"

"তাদের কথা পরে, তোমার কি এই দু'এক বছরের মধ্যে আমায় আর কোন দরকার হবে না মা ?"

এতক্ষণে রাজেশ্বরী একটু মুখ তুলিয়া অন্য দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"আমার আর কি দরকার ?—না—কোন দরকার পড়্‌বে না।" কিশোর ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া এইবারে যেন মরিয়ার মত বলিয়া উঠিল, "এবারে কল্‌কাতা যাবার আগে কি যে-সব সম্বন্ধ আন্‌ছিলে, মেয়ে দেখ্‌ছিলে,—সে সব ব্যাপারের জন্যেও দরকার হবে না ?

রাজেশ্বরী কিশোরের দিকে চাহিলেন। বিস্ময়ে তিনি যেন হত-বাক্ হইয়া উঠিলেন ! এত বড ব্যাপারের পর এই নির্ম্মম অমানুষ যুবকের কি এ বিষয়েও এতখানি হৃদয়হীনতা প্রকাশ পাইবে ? দুইদিনও তাহার দেরী সহিতেছে না ? এই জন্যই কি ঝরণার সম্বন্ধে সে এত খোঁজ রাখিয়াছিল ? ছি, ছি, সবই কি তাহার খেয়াল মাত্র ? এই ছেলেকে এতদিনেও না চিনিয়া রাজেশ্বরী কত না ব্যথাই জীবনে সঞ্চয় করিলেন। কিন্তু আর না।

কিশোর উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া রাজেশ্বরী গম্ভীর মুখে বলিলেন, "যদি তাই ইচ্ছা কর, দেওয়ান-গোমস্তাকে বল। তারাই—" এইবারে কিশোর ঈষৎ মাত্র হাসিয়া মাতার পানে চোখ তুলিয়া বলিল, "তাও দেওয়ান-গোমস্তাই ঠিক্ কর্‌বে মা ? বৌ এনে আমাকে সংসাব সাজিয়ে কি তাদেরই দিতে হবে না কি ?"

রাজেশ্বরীর মুখ দেখিতে দেখিতে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। এই নিষ্ঠুর পরের সন্তানেব নিকটে নিজের ব্যথা-প্রকাশে আর তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি আর উত্তর মাত্র না করিয়া নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগের উপক্রম করিবামাত্র, কিশোর দুই হাত দিয়া দুয়ার রোধ করিয়া দাঁড়াইল ; রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা হবে না মা, পালালে চল্‌বে না। বল, আমায় এখন কি কর্‌তে হবে ?—না বল্‌লে তোমায় কিছুতেই ছাড়্‌ব না।" রাজেশ্বরীর সঙ্কল্প-কঠিন অন্তরে কিসের যেন ঘা পড়িতে লাগিল—রুদ্ধকণ্ঠে সগর্জ্জনে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুই কি আমায় সে কথা জোর করে বলাবি ?

তোর কাছে আর আমি কিচ্ছু চাইব না। পরের সন্তান দিয়ে সংসার তৈরীর আমার প্রবৃত্তি আর নেই। তোর যা খুসী তুই তাই কর,—আমারও যা খুসী আমি করব।"

"কি তুমি করবে আর? কাশী যাবে? চল না, তাই যাই দুজনে।"

"কাশী যাব তোমায় কে বললে? আমার স্বামীর ভিটা—তাঁর সর্ব্বস্ব ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। এই আমার কাশী।"

কিশোর একটু উন্মনাভাবে বলিল, "তুমি যখনি রাগ কর, কাশী যাব বল কি না, তাই আন্দাজ করছিলাম। যাক্, আমায় তো আর কিছু করতে হবে না, চিরদিনের সেই কথাটি আমি জানতে চাই। বলতে হবে তোমায়।"

রাজেশ্বরী ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া শেষে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ, এতেই যদি তুমি সুখী হও, স্বস্তি পাও—হ্যাঁ, চিরদিনের মতই তোমায় আমি ছুটী দিলাম। আমার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত, লোভের সাজা তোমায় দিয়েই ভগবান আমায় ভাল করেই দিলেন! এখনো যদি লোভ করি, তোমার হাত দিয়ে না জানি আমার আরও কত পাওনা হবে! তুমি যা খুসী কর কিশোর, তুমি স্বাধীন। আমার জন্য আমাদের জন্য তোমার কর্ত্তব্য আজ থেকে আর কিছু নেই,—তোমার উপর আমাদের কোন দাবী নেই। তুমিও আমার কেউ নও—আমিও তোমার কেউ নই! কেমন, এই তো তুমি চাও? এইবার তো তুমি সুখী হয়েছ? এইবার আমায় দাও, তুমি আমার সুমুখ থেকে যাও।"—বলিতে বলিতে মুখে কাপড় দিয়া রাজেশ্বরী কাঁদিয়া উঠিলেন। বিবর্ণ স্তব্ধ মুখে কিশোর ক্ষণেক তাঁহার সেই রোদনোচ্ছ্বাস সম্বরণের বিফল চেষ্টা দেখিতে লাগিল; ক্ষণেক পরে একটু যেন দৃঢ় হইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দ্বার ছাড়িয়া

দিল। ধীরে ধীরে রাজেশ্বরীর পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি তাহলে কল্‌কাতাতেই যাচ্ছি মা।"

"যাও—এস।"

*　　　*　　　*　　　*

প্রভুকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে দেওয়ান এবং আরও দুই-তিন জন লোক ষ্টেশনে আসিয়াছিল। ষ্টেশন হইতে গ্রাম দূর-পথ, তাই কিছু পূর্ব্বেই তাহারা সদলবলে আসিয়াছে। সম্মুখে তখন পশ্চিম-গামী ট্রেণ। এখানা ছাড়িলে তাহার পরে কলিকাতাগামী ট্রেণটা আসিবে। কিশোরকে তাহারা ওয়েটিং রুমে একটু অপেক্ষা করিতে বলিবে ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে কিশোরকে একটা ইণ্টার ক্লাশ-কম্পার্টমেণ্টের হাতল ধরিয়া ঘুরাইতে দেখিয়া সবিস্ময়ে "এটা নয়—এটা—নয়—এটা যে, দেখছেন্ না—?" বলিয়া বাধা দিতে দিতে কিশোর কামরার দ্বার খুলিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "হ্যাঁ, এইটেই। আমি এইটেতেই যাব।"

দেওয়ান সবিস্ময়ে হাঁ করিয়া চাহিতেই কিশোর অন্য একজন কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শীগ্‌গির একখানা টিকিট্ নিয়ে আসুন। এখনো পাঁচ মিনিট সময় আছে।"

"আজ্ঞে—আজ্ঞে, কোথায় যাবেন? কোথাকার টিকিট?"

"যেখানের হোক। এ গাড়ীটা যতদূর যাবে! মোকামা—মোগলসরাই—কাশী—যেখানে হোক্।"

দেওয়ান এইবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ কি বল্‌বেন?

"কিছু বল্‌বেন না। তুমি তাঁকে গিয়ে বলো, আমি দুদিন পশ্চিম বেড়াতে চল্‌লাম—হাওয়া খেয়ে আস্‌ব।"

"তাহলে—তাহলে মোগলসরাই হয়ে কাশীই যান্, কাশীরই টিকিট

আনো—বুঝলে ভবচরণ—শীগ্‌গির—শীগ্‌গির। কিন্তু এ ক্লাশে কেন? সেকেণ্ড ক্লাশে চলুন—আর সঙ্গে কে কে যাবে? শুধু ভজহরি—?"

"হ্যাঁ—মাত্র ভজহরিই যাবে। আর এই ইণ্টারেই যাব আমরা। জিনিসপত্রগুলো তুলে দাও। ভজা, উঠে পড়্—কৈ ভবচরণ, টিকিট আনলে—?"

"আন্‌ছে, এখনও সময় আছে। এসে পৌঁছুবে।—মাঠাকরুণ—"

"কিচ্ছু বলবেন না তিনি। নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি গিয়েই তাঁকে পত্র দেব। আমাদের পাণ্ডার নাম কিম্বা আপনার কোন জানিত পাণ্ডার নাম বলে দিন্ তো, লিখে নিই।"

"ঠিক্, ঠিক্ বলেছেন,—গণেশলাল পাণ্ডাকে একটা তার করে দিচ্চি এখনি। পৌঁছেই খবর দেবেন, দেরী না হয়।"

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হতভম্ব সহযাত্রীদের সহিত দ্বিগুণ হতভম্ব দেওয়ান নিজেদের অশ্বযানে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "চল—কি আর করা যাবে? মাঠাক্‌রুণকে গিয়ে বলিগে। পাণ্ডা ঠাকুরকে তো টেলিগ্রাফ করে দিলাম! একটা বাসা-টাসা ঠিক্ করুক সে ইতিমধ্যে, আর মোগলসরাই থেকে ধরেও নিয়ে যাক্। যে রকম ভাব দেখলাম, যতদূর গাড়ীটা যাবে, ততদূর যাবেন, বলেন না? কে জানে, ততদূরই চ'লে যান! কল্‌কাতার বাসা উঠিয়ে দেওয়াই উচিত হল না! কি যে কর্‌বেন, তাই বুঝ্‌ছি না! এই রকম ক'রে কি বেড়াতে যায়? আগে বল্লেই হ'ত—ব্যবস্থা করা যেত, মাঠাক্‌রুণও সঙ্গে যেতে পার্‌তেন। যত সব ছেলেমানুষী কাণ্ড, হুঁঃ!"

কিশোর নিজের এই স্বাধীন জীবন লইয়া প্রথমে কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। নিজের অতি শৈশব স্মৃতির পর এ রকম অনুভূতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। তাই সে প্রথমে রাজেশ্বরীর কথা বিশ্বাসই করিতে পারে নাই। তার পরে বিশ্বাস আসিল। রাজেশ্বরীর কথাগুলি যে তাঁহার সম্পূর্ণ আন্তরিক, তাহা বুঝিতে পারিলে, স্বাধীনতা লাভের প্রথম উত্তেজনা-তপ্ত রক্ত মাথায় উঠিবার পূর্ব্বে সেই আশৈশব একান্ত স্নেহের সঙ্গে পালয়িত্রী মাতার বেদনাও আজ নূতন হইয়া যেন তাহার চক্ষে পড়িল। সে বুঝিল, তিনি নিজে যাহাই বলুন, ইঁহার কাছেও আর তাহার এতখানি কৃতঘ্ন হওয়া চলিবে না। তিনি তাহাকে সর্ব্ব কর্ত্তব্য হইতে মুক্ত করিয়া দিলেও, তাহা যে আর এ জীবনে অসম্ভব! তাহার এই ব্রজকিশোর রায় নামও থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সবই থাকিবে। যাহা গিয়াছে, তাহা তো আর সে ফিরিয়া পাইবে না! সে-মাণিক তো সে আর হইতে পারিবে না—তবে কেনই আর সে নূতন নূতন অপরাধের সংখ্যা বাড়াইয়া চলে? এই চিরদিনের মাতৃসম স্নেহাতুর হৃদয়কেও কেবলই ব্যথা দিতে থাকে? আবার তাহাকে তাহার ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট পথেই যে চলিতেই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইতিমধ্যে সে কেন একবার কিছুদিনও অন্ততঃ তাহার এই মুক্ত জীবনকে ভোগ করিয়া লউক্ না! রাজেশ্বরীর কথিত-মত ভাবিয়া লউক্ না কেন! সে আজ পিতার অপরকে বিলাইয়া দেওয়া হত-ভাগা সন্তান নয়! সম্পূর্ণ অনধিকারের স্থানে কলমের মত তাহাকে কেহ জোড়া দিয়া পরের রসে বর্দ্ধিত করিয়া তো পর-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে দেয় নাই! পরের ঘরে তাহাকে পরের সন্তান হইয়া আর আপন-জনার সান্নিধ্যে

লজ্জায় পৃথিবীর বুকে মুখ লুকাইতেও হইবে না। আপন হইয়াও 'পর' হইয়া যাওয়ার বেদনার বিষেও আর তাহার জীবন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে না। সে এখন অপর সাধারণের মতই একজন সহজ মানুষ! আজীবনের অধীনতার দূষিত বাষ্পে ঘেরা পৃথিবীতে আজ সে মুক্তির শুদ্ধ নির্ম্মল নিশ্বাস টানিয়া লইয়া দুদিন বেড়াইয়া বেড়াক্ না কেন! আজ তাহার স্নেহ, ভালবাসা, মমতা, প্রেম প্রভৃতি জীবনের সমস্ত বৃত্তিকে স্বাধীন জীবনের ভূমিতে আনিয়া একবার সাধারণের মত অনুভব করিয়া লউক না কেন! আজ একবার ঝরণাকে গিয়া সে কি বলিতে পারে না যে, আজ তোমাকে আমার এই অতি অস্বাভাবিক দুর্জ্জয় প্রেম আমি নিবেদন করিতে পারি, যে প্রেম তোমার অতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার স্মৃতির মধ্যেই জন্মিয়া আমার অন্তরে ধীরে ধীরে দিনে দিনে কালে কালে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে! ইহার কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কোন আশা ছিল না। এমন স্পর্দ্ধাও ইহার এতদিন ছিল না যে তোমার কাছে সে নিজের এই আত্ম-নিবেদন প্রকাশ করিতে পারে! অন্তরের অন্তরে অপ্রকাশ্যরূপে তাহার এই "গুহায়িত পরমতত্ত্ব" একটী বেদনার আকারেই তাহার জীবনে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। সেই বেদনাটুকুই মাত্র আজ তোমার কাছে নিবেদন করার মত স্বাধীনতা সে পাইয়াছে, তাহার বেশী আর কিছু নয়। তোমার শ্রদ্ধা বা অন্য কিছুর কথা স্বপনেও তাহার আশা করিবার কথা নয়! কেবল একটু সহানুভূতি, তাহার এই বেদনা প্রকাশ করিতে পাওয়ার একটু অধিকার এইমাত্র সে চাহে। তার পরে—না, ইহার পরের কথা এখন সে আর ভাবিতে পারে না। এখন এইটুকুই মাত্র তাহার ভাবিবার এবং বলিবার। পরের কথা পরের জন্যই থাক্।

রাজেশ্বরীর সেই উদাসীন বাক্য তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিবার যে আভাস প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা সে মনের সঙ্গে বিচারের সঙ্গে গ্রহণ না

করিলে, তাহার চিরদিনের ব্যথা-জর্জ্জর মুক্তিকামী অন্তর এক এক বার এমনি উতলা হইয়া উঠিয়া, তাহার তরুণ যৌবনের দুর্দ্দম বেগকে, অন্তর-গুহাশ্রিত রুদ্ধ স্রোতকে এমনি উদ্দাম করিয়াই তুলিতেছিল। তাই সে কলিকাতা যাইবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ষ্টেশনে আসিয়া সে যাহা করিল, তাহা সে কেন করিল, নিজেই যেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে পশ্চিমে যাইতেছে, কাশী যাইতেছে। কেন? কিসের জন্য? কি পাইতে চায় সে, যাহার জন্য ঝরণার নিকটেও না গিয়া, তাহাকে বিপরীত পথে ছুটিতেহইল। ঝরণার কাছে গিয়া যে অন্তর তাহার আত্ম-নিবেদনের জন্য এতক্ষণ উতলা হইয়া উঠিয়াছিল, সে এখন আবার ও কি চাহে? অন্তরেরও কি অন্তরতম আর কোন এমন কিছু আছে, যাহা তাহার নিজের কাছেও অজ্ঞাত তত্ত্ব?

মোগলসরাইয়ে নামিয়া সে যখন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন এক রুদ্রাক্ষ ও চন্দন-চর্চ্চিত বিশাল বপু ত্রিপুণ্ড্র-শোভিত ললাট এবং স্থূল উদর লইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। জানাইল, সে রায় বাবুদের বংশানুক্রমে পাণ্ডা বংশধরের ছড়িদার, দেওয়ানজীর টেলিগ্রাম পাইয়াই তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া সে "হুজুর"কে লইতে আসিয়াছে। হুজুরকে তাঁহার কলিকাতার বাসায় অল্পদিন পূর্ব্বেই কার্য্যানুরোধে গিয়া দেখিয়াছিল, তাই তাহার মনিব পাণ্ডা গণেশলাল তাহাকেই পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি বক্তৃতার মধ্যেই সে ভজহরির সঙ্গে কিশোরের জিনিস-পত্র কাশী-যাত্রী ট্রেনে তুলিয়া ফেলিল। যন্ত্র চালিতের মত কিশোরও তাহাদের সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

আরামজনক বাসা, দেব-দর্শন, কাশীর সর্ব্বত্র ঘুঁটিয়া বেড়ানো ইত্যাদি পাণ্ডার অনুচরদের সাগ্রহ চেষ্টায় সমস্তই কিশোরের যথানিয়মে হইতে লাগিল। ভৃত্য ভজহরির বড়ই আনন্দ। কেবল মাঝে মাঝে সে গণেশ-

লাল পাণ্ডার স্থূলতা লক্ষ্য করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িত! প্রভুর নিকট মন্তব্য প্রকাশ করিত যে, বেচারী বোধ হয় কোন দিন ফাটিয়াই মরিয়া যাইবে। নিজের ভবিষ্যৎ-জ্ঞান সম্বন্ধেও প্রমাণ দিতে বসিত যে—যখনি পাণ্ডার ছড়িদারের ঐ রকম চেহারা দেখেছি, তখনি আন্দাজ করেছি, পাণ্ডা না জানি কি হবেন! আচ্ছা দাদাবাবু, বাবা বিশ্বনাথের তো সবাই ছেলে, তাঁর দুয়োরে এত অনাথ আতুর ভিখারী একমুটো চালের জন্য হাহাকার কর্‌ছে, আর পাণ্ডা ব্যাটারা এমন হয় কি ক'রে?" ভজহরির মন্তব্য শুনিতে শুনিতে সহসা একবার কিশোরের মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "পাণ্ডারা বোধ হয় বিশ্বনাথের পোষ্যপুত্র।" ভজহরি একটু যেন অবাক হইয়া প্রভুর পানে চাহিল। কিন্তু ক্ষণপরে সরলহৃদয় বৃদ্ধ ভৃত্য সরল হাসি হাসিয়া বলিল, "আর ভিখারিগুলো বুঝি আপন ছেলে? তাই দাদাবাবু আপনি ওদের অত ভালবাসেন? পাণ্ডার চেলাগুলো যে বলাবলি করেছিল, 'বাবু এখনো বাচ্ছা আছেন, তাই কাঙাল ভিখারীর ওপরই দয়া বেশী, ওদের দিকেই পয়সা বেশী খরচ করেন। পুণ্যি-ধরমের কাছে তেমন "হিচ্ছা নেই।"

কথাটা সত্যই! তাই কিশোর খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাশীধামের যেখানে যেখানে অনাথ-আতুরের' ভিখারীর দুঃখহরণের ব্যবস্থা ছিল, সেই সেই স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইত। ৺অহল্যা বাই, ৺রাণী ভবানী, ৺রাণী বিদ্যাময়ী, ৺রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী মহিলাদের ছত্রে অন্নদান সে সস্পৃহনয়নে দেখিত, আর মনে মনে নিজ মাতা রাজেশ্বরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিত, "এমন সব উপায় থাকিতে এমন পথে কেন গিয়াছিলে! নিজেও সুখ পাইলে না, পরেরও যা হইবার তা হইল! বংশের নাম এমন চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা আর কিসে সম্ভব হইত? এই যে প্রাত্যহিক প্রাণী-যজ্ঞ, ইহার কাছে পর ধরিয়া বৎসরান্তে

পরলোক উদ্দেশে কয়েক গণ্ডুষ জল ও পিণ্ড দান, সে যে কি তুচ্ছ, এ কি তোমার মনে একবারও জাগে নাই মা ?”

সেদিন ৺বটুক ভৈরব দর্শন করিয়া কিশোরকে আগেই ৺রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডার অনুচরেরা আজ বিরক্তি দমন করিতে পারিল না। কিন্তু তাহাদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশেও লেডকা বাবু সাহেবের যে কোন মত পরিবর্ত্তন হইবে, এমন বোধ হইল না। আশ্রমের প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রত্যেক কক্ষ ঘুরিয়া প্রত্যেক রোগীকে বিশেষ করিয়া সে দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাহাকেও যন্ত্রণাগ্রস্ত দেখিলে তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার কি কষ্ট, জানিয়া লইতেছিল। তাহাদের কি নিয়মে আহার, চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা হয়, তাহা সেবকদের নিকট হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিয়া লইতেছিল। কয়েকটা ঘরের মাথার উপরে কোন্ কোন্ পিতৃভক্ত মাতৃভক্ত সন্তান, স্বামীহারা স্ত্রী, স্ত্রীগত-প্রাণ স্বামী তাহাদের মৃত প্রিয়জনের উদ্দেশে সেই কক্ষ কয়টি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া তাঁহাদের নামগুলি সে টুকিয়া লইল। প্রাঙ্গণের সেই সুন্দর জলাধারটি, যাহার অঙ্গে সেই অমৃতময়ী শ্লোকে পানীয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের পরে তাহা যে দাতার স্বর্গগত পিতার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত, তাহা পড়িয়া কিশোর স্তব্ধ হইয়া ক্ষণেক সেইখানে দাঁড়াইয়া জলাধারটির পানে চাহিয়া রহিল। বুকের মধ্যে তাহার যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল! হায় ভাগ্য, হায় হতভাগ্য, যাহার পিতাই নাই, শৈশবেই যে পিতৃহীন, তাহাব আবাব এ কি সাধ! কাহার তৃপ্তির জন্য কে দিবে ? ৺নন্দকিশোর রায়ের উদ্দেশে এখনি এমন একটা কিছু করা অতি সহজ, কিশোরের ইচ্ছা মাত্রেই এখনি তাহা সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাই কি! অন্তর কি এই সাধেই এমন করিতেছে ? কোথায় সে পিতা তার, যাঁর অভাবে যাঁর জন্য তাহার অন্তর এমন মরুভূমিতে

পরিণত হইয়াছে! তাঁর স্মৃতি পর্য্যন্ত যে কিশোরের পক্ষে অগ্নিময়ী! সেই প্রচণ্ড অগ্নিস্রোতকে এমন স্নিগ্ধ ক্ষীর নীরধারাতে কিশোর তো পরিণত করিতে পারিবে না! তবে কেন আর···?

সেদিনের মত দেখা শেষ করিয়া সে ফিরিবে মনে করিতেছে, এমন সময়ে তাহার পরিদর্শক সেবক যুবকটি বলিল, "মোক্ষ-মন্দিরটা দেখবেন না কি? তাতে অবশ্য দেখার এমন কিছু নেই। যার আর বেশী দেরী নেই বলে মনে হয়, তাকেই সেখানে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। সিরিয়স্ কেস্ হলে সকল রোগীর কাছে তাকে রাখা হয়। ঐ যে ঐদিকে একটী মাত্র বড় ঘর দেখছেন, ওতেই তাকে রাখা হয়। তার সুমুখেই ঐ যে ছোট ঘরটি, ঐটিই মোক্ষ-মন্দির। আজ একজন আধ-মরা লোককে এনে মোক্ষ-মন্দিরে রাখা হয়েছে। রাস্তায় পড়েছিল, খবর পেয়ে আনা হয়েছে। লোকটীর কোথায় চোট্ লেগেছে, বোধ হচ্ছে,—আঘাতের চিহ্ন ডাক্তারে এমন কিছু ধর্‌তে পার্‌লে না, কিন্তু একেবারে অজ্ঞান। গিয়ে দেখে আস্‌তে হচ্ছে।"

শুনিতে শুনিতে ও বলিতে বলিতে উভয়ে মোক্ষ-মন্দিরের দ্বারের নিকট পৌঁছিলে, কিশোর দেখিল, নামের উপযুক্ত ঘর বটে! সে ঘরে আলো-বাতাসের তেমন কোন নিকাশ-পথ নাই, গৃহতলে কোন দ্রব্য নাই, খালি ঘরের মেঝের উপরেই একটু শয্যায় একটি মুমূর্ষু একাকী পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহের মধ্যে যাইতে আর কিশোরের ইচ্ছা হইল না, এর আর কি দেখিবে! এমন ঘটনা তো জগতে অহরহই ঘটিতেছে; বরং এ হতভাগ্য যে ইহাদের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িতে পারিয়াছে, ইহাই তাহার পক্ষে শেষ সৌভাগ্য! উভয়ে গৃহের মধ্যে চাহিতেই দেখিল, রোগী যেন মাথা চালিতেছে, মাঝে মাঝে হাত পা নাড়িতেছে। সঙ্গের পরিদর্শক যুবক তখনি ছুটিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করায়, কিশোরও সঙ্গে সঙ্গে

ঢুকিয়া পড়িল। যুবক বলিল, "এঁর অবস্থান্তর এসেছে দেখ্‌ছি। এমন করে তো একবারও নড়েনি।" তার পরে রোগীর নিকটে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠোঁট নড়ছে—কি যেন বলছে, মশায়! আমি ডাক্তার আর এখানের যারা সেবক তাদের খবর দিতে যাচ্ছি, আপনি এখন আর এখানে থাকবেন কি?"

কিশোর ঈষৎ কৌতূহলী হইয়া বলিল, "আপনি আসুন তাদের ডেকে। আমি থাক্‌ছি এইখানেই।"

রোগী তখন অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সবেগে হাত-পা নাড়িতেছে এবং অস্ফুট আর্ত্তনাদে কি যেন বলিতেছে। সহসা কিশোরের কাণে তীবের মত একটা শব্দ প্রবেশ করিল, "মাণিক—মাণিক—"

বন্দুকের গুলি খাইয়া যেমন করিয়া পাখী ঘুরিয়া পড়ে, তেমনি করিয়া সহসা কিশোর মুমূর্ষুর মুখের নিকটে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। এ কি, এ কি শব্দ! কে এ, এ কে? নিজেকে সামলাইয়া লইতে লইতে তাহার কাণে সেই একই শব্দ পুনঃপুনঃ প্রবেশ করিতেছিল, "বাপরে মাণিক, মাণিক, ওঃ!"

দুই হাতে সেই মৃত্যুশয্যাশায়ীর মুখখানা আলোর দিকে ফিরাইয়া কিশোর দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল, চিনিবার চেষ্টা করিতেছিল। চোখের দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত যেন তাহার লোপ পাইয়াছে।—আঁধার, আঁধার, কিছু দেখা যায় না, কাণেও আর কোন কোন শব্দ প্রবেশ করিতেছে না, সর্ব্বাঙ্গ যেন জড়ের ন্যায় সর্ব্বক্রিয়া-রহিত!

মনুষ্য সমাগমের সংঘাতে কিশোর সসংজ্ঞ হইয়া মুখখানা ছাড়িয়া ছিল! নিজের এই অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেও সে বেশ চিনিতে পারিয়াছে, এ মুমূর্ষু কে! ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, "এ ঘর থেকে একে

নিয়ে যাও। বাঁচবে বোধ হয় না,—তবে এখনো দু'চার দিন টিক্‌তে পারে, একটু চেষ্টা-চরিত্তির করে দেখতে হবে,—যখন হাল এমন ফিরেছে—"

রোগীকে ষ্ট্রেচারে করিয়া সাবধানে নিকটস্থ সেই সিরিয়স কেশের ঘরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে করিতে কিশোরের এতক্ষণকার সঙ্গী সহসা তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "একে কি আপনার কোন পরিচিত ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে মশায় ?"

"হ্যাঁ, আমি এঁর কাছে থাকতে চাই, আপনারা অনুগ্রহ করে সেই রকম বন্দোবস্ত করে দিন।"

১১

"আঃ—। মামীমা—আর কেন! এই তো, ওই তো তোমার কিশোর!—আমার মাণিক আর তো নেই, নেই—! মাণিক নেই—ঐ তো তোমার কিশোর! তবে আর কেন!···কে? ঝরণা?—মা, মা, আমার মা, ঝরণা তুই! মাগো তুই? তবে আর কেন! এসেছিস্ তুই? আঃ, তাই! তাই! না, না, কিশোরই তো—হ্যাঁ, কিশোরই তো—ওঃ—"

রোগী প্রচণ্ড বিকারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "কে তুমি···? কে···? কে?" তাহার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া রুদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে কিশোর মৃদুস্বরে বলিতেছিল, "আমি, আমি মাণিক।"

"মাণিক? আমার মাণিক? কই আমার মাণিক—কই আমার খোকা? সরযূ—কই? কই? দাও, আমার বুকে দাও,—দাও, দাও—"

রোগীর প্রসারিত শীর্ণ বাহু-যুগলের মধ্যে—মৃত্যুর করাল আকর্ষণের বেগে কম্পিত বক্ষপঞ্জরের মধ্যে নিজের মুখখানা ও মাথাটাকে পাতিয়া দিয়া কিশোরও মুমূর্ষুর সঙ্গে একই সুরে জ্ঞানহারার মতই গোঁঙাইতেছিল। কি বলিতেছিল, বোঝা যায় না। সেবক যুবকটি অতি কষ্টে কিশোরকে সেই বাহু-বন্ধনের মধ্য হইতে টানিয়া লইয়া করুণা-কম্পিত অথচ, দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল, "মশায়, এমন করলে কর্তৃপক্ষ আপনাকে এখানে থাকতে দেবেন না। আপনাকে একটু সংযত হতে হবে! রোগীর সঙ্গে আপনিও রোগী হলেন যে!"

কিশোর উঠিয়া বসিল। ক্ষণপরে সে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছে বুঝিয়া সেবক যুবক বলিলেন, "আপনার টেলিগ্রাম দুটো কাল রাত্রেই রওনা হয়েছে—এই তার রসিদ। রাত্রে আর দিয়ে যেতে পারিনি।"

"আপনি বল্‌তে পারেন, মশায়, ডাক্তার কি বল্‌ছেন? কোন উপায় আছে কি এখনো?—কিছু করবার থাকে যদি—"

কিশোরের ভগ্ন কণ্ঠে বোধ হয় ব্যথিত হইয়া যুবক উত্তর দিল, "অন্যত্র নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবে যে-কোন ডাক্তারকে এনে দেখাতে পারেন যদি ইচ্ছা করেন,—কিন্তু আমাদের মনে হয় সেও অনর্থক! আশা পাওয়া গেলে আমরা নিজেরাই আপনাকে বল্‌ব। তবে ভগবানের ইচ্ছায় সবই সম্ভব—" এই স্তোকবাণীর দিকে কাণ না দিয়া কিশোর বলিল, "কিন্তু ঐ টেলিগ্রাম দুটো পৌঁছে—"

"সেও কেউ বল্‌তে পারে না—সবই ভগবানের উপর নির্ভর। তবে বিকারের যে রকম উত্তরোত্তর জোর দেখা যাচ্ছে, তাতে খানিকটা সময় পেতেও পারেন! এই জোরটাতে যতক্ষণ না অজ্ঞানের অবসাদ আসে, ততক্ষণ তো সময় পেতেই পারবেন। চাই কি, দু'তিন দিনও কাটতে পারে, আবার এ বেলা ও বেলাতেও নষ্ট হওয়া সম্ভব।

কিশোর আর কোন প্রশ্ন না করিয়া নিঃশব্দে রোগীর মাথার কাছে বসিল। তখনো রোগী একই ভাবে বকিয়া যাইতেছেন! সে প্রলাপ কখনো স্পষ্ট, কখনো অব্যক্ত আর্ত্তনাদে প্রকাশ পাইতেছিল। সেবাকারী যুবক বলিল, "আপনি কাল থেকে একভাবে দিন-রাত্রি বসে আছেন,—এইবার উঠুন, স্নান-টান করে দুটি খাওয়ার—

কিশোর হাত দুটী যোড় করিবামাত্র যুবক সহানুভূতির ভাবে বলিল, "আপনাকে বেশী দূরে যেতে বল্‌ছিনে মশায়, আমাদেরই কাছে একটু নেয়ে খেয়ে নিন্! এখানে ব্রাহ্মণই রাঁধে। আমি এখন এঁর কাছে নিযুক্তই থাকব! আপনি উঠুন। কর্ত্তৃপক্ষরা এঁর জন্যে সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। হয় আপনি নিজের বাসায় গিয়ে স্নানাহার করে আসুন—নয় তো এইখানেই যা হয় শেষ করে ফেলুন।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া কিশোর একবার রোগীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া, উঠিবার জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিবা মাত্র, তাহার যেন মনে হইল, রোগীও তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যুবকটিও তাহা লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তাই তো, জ্ঞান এলো না কি! দৃষ্টি তো অনেকটা পরিষ্কার।"—কিশোরের মনে হইল, সে চোখে যেন একটা প্রশ্নও ফুটিয়া উঠিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের চক্ষু নত হইয়া গেল। যদি সত্যই ইঁহার জ্ঞান আসিয়া থাকে! উঃ—কি করিয়া সে চাহিবে? সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে? ঠোঁট নড়িল, মৃদু প্রশ্ন হইল, "কে?"

অজ্ঞানকে যে উত্তর সে দিয়াছে, এখন এই অর্দ্ধ-সজ্ঞানকে সে উত্তর দিবার শক্তি কিশোরের কোথায়! সে শুনিল, ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন চলিতেছে, —"ঝরণা? মোহিনী দাদা?" কিশোর বুঝিল না, ততখানি ভয়ের এখনো তাহার কারণ নাই! উত্তর দিল, "তাঁরা আস্‌বেন শীগ গিরই।"

আবার কি যেন বলিবার চেষ্টায়, বুঝিবার চেষ্টায় রোগীর ঠোঁট ঘন নড়িতেছে দেখিয়া, কিশোর তাঁহার মাথার দিকে সরিয়া দাঁড়াইল। না জানি, এবার সে কি প্রশ্ন শুনিবে! ক্ষণেক পরে সেবক বলিল, "চলুন এইবার। আচ্ছা মশায়, যদি কিছু মনে না করেন তো—"

"না, না—" দুই হাতে মুখ ও কর্ণ ঢাকিয়া কিশোর প্রায় আর্ত্ত স্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "দয়া করে কোন প্রশ্ন করবেন না আমায়।"

"মাপ করুন। চলুন, আপনাকে আর একজনের জিম্মা করে দিই, সেই আপনার স্নানাহারের—"

"ওঃ—" তীব্র আর্ত্তনাদের সঙ্গে রোগীর মস্তক উপাধান হইতে লুটাইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, কিশোর ত্রস্তে তাঁহার মুখের নিকটে গিয়া দুই হাতে অতি সন্তর্পণে মাথাটি বালিশে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, ইতিমধ্যে বিকারগ্রস্ত অর্দ্ধমৃত রোগী দুই হাতে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "না, না, আমায় যেতেই হবে যে মা,—কিশোর লজ্জা পাবে—রাগ করবে। না, আবার কেন—আর কেন!"

অর্দ্ধ-জড়িত স্বর—অন্যের সম্পূর্ণ বুঝিয়া লইবার উপায় নাই, কিন্তু কিশোরের বুঝিতে একটুও বাধিতেছিল না। রোগীকে সান্ত্বনার্থে আবার সে বলিল, "খবর দিয়েছি তাঁদের, আসবেন তাঁরা শীগ্‌গিরই—।"

"কে—মামীমা? না, না, তাঁর সামনেও আমি আর যাব না, কি ভাব্‌বে!"

"তিনিও আসবেন শীগ্‌গিরই।"

"কে আস্‌বে? কিশোর? কিশোর? আমি জান্‌তাম না। তাহলে আর তো ফির্‌তাম না। তাঁকে লজ্জা পেতে, দুঃখ পেতে আর দিতাম কি? আমি যাচ্চি, আবার যাচ্চি মা। তুই—তুই—"

কিশোরের হাত ছাড়িয়া দিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া লইয়া রোগী

আবার নিজ মনেই বলিলেন, "বেঁচে থাকি তো আবার—আবার একবার দেখে যাব—তোদের। তখন তুই কিশোরের—কিন্তু লজ্জা পেতে আর দেব না, লুকিয়ে দেখে যাব। দেখ্‌ব না? আমার সেই ঝাঁচির কত দিনের সাধ আজ পুরবে। আমার—আমার সেই সরযূর কোলের মাণিককেই তো,—যাই করুক সে—ওঃ!"

অব্যক্ত আর্ত্তনাদের সঙ্গে কিশোর একেবারে বিনয়ের পায়ের উপরই পড়িয়া গেল—ধৈর্য্য সংযম লজ্জা কিছুই আর তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিল না। সেবক যুবকটি ত্রস্তে কিশোরকে টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল,—"এ সময়ে ধৈর্য্য ধরুন! রোগীর বেশ জ্ঞান হয়েছে, এ সময়ে আপনার অধৈর্য্যে রোগীর ক্ষতি হবে। আপনাকে তাহলে এখন এখানে রাখা চল্‌বে না। বুঝে চলুন।"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিয়া ভগ্ন স্বরে কিশোর বলিল, "বলুন, আমায় কি কর্‌তে হবে—"

"আর কিছু না—স্থির হয়ে বসে উনি যা বল্‌ছেন, শুনুন, দরকার বুঝলে একটু আধটু উত্তর দিন—কিছু বল্‌বার থাকে, তাও বলুন।"

"বল্‌বার?—কিছু যে আমার বল্‌বার নেই—"

"তবে চুপ করে বসে থাকুন। ঐ শুনুন, উনি কোথায় আছেন, প্রশ্ন করছেন—পরিষ্কার জ্ঞান হচ্চে ক্রমে! আপনি ভাল যায়গায়ই আছেন—এই ওষুধটা খান দেখি! মশায়, আমি একবার ডাক্তারকে খবর দি; স্থিরভাবে থাকবেন কিন্তু আপনি, বুঝেছেন?"

যুবক চলিয়া গেলে কিশোর লক্ষ্য করিল, এতক্ষণ ধরিয়া রোগী বিস্ফারিত চক্ষে তাহাকেই দেখিতেছিল। আবার সে প্রশ্ন করিল, "কোথায় আমি? কল্‌কাতায়?"

"না, কাশীতে।"

"কাশীতে কোথায়?"

"রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে।"

"কে তবে তুমি?"

"উনি একজন সেবা কর্‌বার লোক।"

"কিন্তু তুমিও, না—কে তুমি?"

সচকিতে কিশোর দুই হাতে মুখ ঢাকিল, আর বুঝি লুকাইবার উপায় নাই! এ দৃষ্টি হইতে কোথায় সে লুকাইবে!

"কতকাল, কতযুগ পরে, ওঃ, এই যে সে দিন দেখ্‌লাম! রাজকান্তি, আমার রাজকান্তি—কত বড—কত সুন্দর আমার সোণার মাণিক! কিন্তু আমার দেখ্‌তে পাবাব নয়—আমি দেখ্‌তে পাব না আর। পরের, পরের সে!—কে তুমি তবে? সে নও তো—কিশোর নও তো?"

"না, না, আমি মাণিক—তোমার মাণিক—" বলিতে বলিতে কিশোর আবার জ্ঞান-হারা হইয়া পিতার বক্ষের নিকটে আছ্‌ড়াইয়া পড়িল, "বাবা, আমার বাবা।"

কতক্ষণ পরে নিকটে লোক-সমাগমের শব্দে কিশোর যখন পিতার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, বিনয়ের তখন আর কোন চাঞ্চল্য নাই,—দুই হাতে তাহার মাথাটা সেই জীর্ণ পঞ্জরের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সে নিমীলিত নেত্রে স্তব্ধ হইয়া আছে। কেবল মাঝে মাঝে ঠোঁট একটু একটু নড়িয়া যে শব্দটুকু উচ্চারিত হইতেছিল, তাহা কেবল কিশোরেরই বোধগম্য। তাহা "সরযু—খোকা—আমার মাণিক"—এমনি টুক্‌রা-টুক্‌রা গোটা-কয়েক শব্দ মাত্র।

দিনের পর রাত্রিও কাটিতে চলিল। ডাক্তার এমন কিছু ভরসা দিতে পারেন নাই। ও-সব জ্ঞান সাময়িক, উহার দ্বারা কোন সুফলের আশা

এখনো করা যায় না। হার্টের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক, মস্তিষ্কের বোধ হয় গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। কিশোর বসিয়া ভাবিতেছিল, মস্তিষ্কের আর অন্তরের এ আঘাতের কথা অন্যে কি বুঝিবে! এই দশ-এগারো বৎসর যে এই জীর্ণ-শীর্ণ শরীর ঐ ভগ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণিত বস্তু দুটিকে এই পঞ্জরের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্য! নির্নিমেষ নেত্রে সেই অর্দ্ধ-জ্ঞান-অজ্ঞানে মিশ্রিত দেহখানির দিকে চাহিয়া কিশোর ভাবিতেছিল, এই জীর্ণ ঘরের ভিতরে যিনি এখন ঐ আধি-ব্যাধি-পীড়িত তাপ-জর্জ্জরিত আতুর দেহ-মনকে ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তিনি গতদিনের কথা, গত স্নেহ-মমতার কথা একবারও কি এখন আর ভাবিতেছেন না? যাহার জন্য তাঁহার এই অকাল-মৃত্যু সেই তাঁহার বক্ষ-কোটরবাসী সর্পের দংশনের জ্বালা কি তিনি এখন ভুলিতে পারিয়াছেন? তাহাকে কি ক্ষমা করিয়াছেন? ক্ষমা যদি না করিতেন, তাহা হইলে "আমার মাণিক" বলিয়া আবার কি তাহাকে বক্ষে স্থান দিতেন? কিম্বা এ সমস্তই চির-দিনের সংস্কার বশেই করিয়া গেলেন? আজন্ম প্রগাঢ় স্নেহ যে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার মধ্যেও প্রাণাধিক স্নেহাস্পদের গভীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে বক্ষে উঠাইয়া লইতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করে নাই! কিশোর যাহা পাইল, ইহাও কি তাহাই মাত্র?

হউক,—তাহাতেই বা এমন কি! এত বড় পিতৃহত্যার অপরাধের এক দিনেই মোচন হইবে! সে যে অসম্ভব! আর ইহার জন্য তো কিশোরের জীবনও এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে! এই হত্যার পাপও কিশোরের জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং তার পরে ইহার প্রায়শ্চিত্ত সারা জীবন ধরিয়া তাহাকে করিতে হইবে, সেজন্য কাতর হইলে চলিবে কেন! তাহার জীবনের দেবতা, তাহার ঈশ্বর যে এই জন্যই তাহাকে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজে পর হইয়া শেষে এমনি করিয়া বাকি কাজটুকুও শেষ করিয়া

যাইবেন, এ যেন কিশোরের কতকটা জানাই ছিল! কেবল সে জানিত না যে তাহাকে এতটুকু সুযোগও শেষে তিনি দিবেন! পথে পড়িয়া না মরিয়া, এই অনাথ-সেবাশ্রমে কিশোরের হাতেরই একটু শুশ্রূষা যে তিনি লইবেন, একটু জল-গণ্ডুষ লইয়া যে তিনি খাইবেন, এইটুকুই কিশোর জানিত না। তাই কল্পনায় ইহার অন্য একটা রূপ চিন্তা করিয়া দেহে মনে সে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল।—কিন্তু কেন এই অনর্থক চিন্তা—কেন এ ভয়? এইই বা সে কেন পাইবে না? এটুকু যে তার প্রাপ্য, নহিলে কে তাহাকে সেই কলিকাতা-যাত্রার পথ হইতে পশ্চিমের গাড়ীতে তুলিয়া দিল? সে তো রাজেশ্বরীর মুখে অজিতের কথিত "মোগলসরাই ষ্টেশনে তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল—" এইটুকু মাত্রই শুনিয়াছিল! ইহাতে তাহার অন্তর এমন কি জানিল যে যৌবনের অদম্য মনোবৃত্তিরও হাত এড়াইয়া এই দিকেই ছুটিয়া আসিয়াছে! এই চির-অত্যাচার-প্রাপ্ত স্নেহশীল অন্তর যেমন স্নেহাস্পদের এত অপরাধেও তাঁহার নিজের অন্তরের বৃত্তিকে শুষ্ক করিতে পারে নাই, এই মৃত্যু-উন্মুখ প্রাণও যেমন 'আমার মাণিক' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, তেমনি এই কিশোরের অন্তর-গুহা-বাসী সেই মাণিকও এ পর্য্যন্ত একদিনও কি ইহাকে ছাড়িয়াছিল? ছাড়ে নাই, তবে সেটা যে কি, তাহাই সে চিনিতে পারিত না। এই ভ্রমেই আগাগোড়া সব গোল হইয়া গিয়াছে। সেই যে বন্ধন—বৈরীরূপে বিদ্বিষ্টভাবে অহরহ কিশোরকে জর্জ্জরিত করিত, স্বতঃজাত আকর্ষণের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা বিপ্রকর্ষণরূপে অন্তরকে উদ্যত রাখিত, তাহাকেই কিশোর বুঝিতে পারে নাই। বহুদিন পূর্ব্বে একবার রাজেশ্বরী বাড়ীতে পণ্ডিত দ্বারা ভাগবত পাঠ করাইয়া ছিলেন,—তাহাতে সেই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপাল প্রভৃতির বৈরানুবন্ধের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাই আজ কিশোরের মনে পড়িতেছিল। যাহা

জীব উদ্ভূত, জীবের জীবত্ব বা আত্মত্ব যাহাতে পর্য্যবসিত, সেই পরমাত্মার উপরই তাহার এই বিদ্বেষ, এই বিপ্রকর্ষণ, ইহা আত্মার আকর্ষণেরই রূপান্তর মাত্র। তাই 'প্রেমানুবন্ধ' আর 'বৈরানুবন্ধের' গতি একই, প্রাপ্তি একই!—নহিলে শিশুপালের আত্মা, জ্যোতিরূপে আবার যিনি তাহাকে হত করিলেন, তাহাতেই গিয়া মিশিল কেন? কিশোরেরও পিতার উপর এই বিদ্বেষ, সে যে গাঢ় আকর্ষণের রূপান্তর, অভিমানেরই ক্রিয়া মাত্র! কেন তুমি আমায় পরকে দিয়া নিজে পর হইলে! তোমার সাক্ষাতে আমায় পরের পরিচয়ে পরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়, এ দুঃখ এ লজ্জা যে জগতে রাখিবার স্থান নাই! তুচ্ছ এ বিষয়ে কি হইবে—যদি আমি তোমায়ই হারাইলাম—তোমায় বাবা বলিতে না পাইলাম? এ কথা তুমি একবারও ভাবিলে না! যদি নাই ভাবিয়াছ, বিষয়কেই যদি এত বড় দেখিয়াছ, তবে আর কেন? অহরহ নিকটে থাকার এ লজ্জা, এ বেদনা আর আমি সহিতে পারি না—যাও, তুমি যাও। কিশোরের কিশোর হৃদয় অহরহ এই কথাই না বলিয়াছে! ইহাকে দূরে সরাইয়া দিয়াও কি কিশোর এক দিনও নিজেকে ভুলিতে পারিয়াছে? পিতৃপরিত্যক্ত হতভাগ্য বলিয়া পরের দেওয়া এত সুখ-সম্পদও যে তাহার পক্ষে বিষের তুল্য হইয়াছিল। রাজেশ্বরীর এতখানি স্নেহকেও যে সে মাথা পাতিয়া লইতে পারে নাই। শুধুই কি তাই? নিজের যৌবনোচ্ছল জীবনের সর্ব্বোত্তম সার্থকতা তাহার বুঝি দুয়ারে আসিয়াও দাঁড়াইয়াছিল—সে তবু তাহাকেও ফিরাইয়া দিয়াছে! এমন অভিশপ্ত বিষময় জীবন কি জন্য হইয়াছিল? শুধু এই যায়গায় পর হইয়াই ত! এত বড় বেদনার অভিমানের স্বরূপকেই যে সে চিনিতে পারে নাই, ইহাই তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অভিশাপ, সব চেয়ে ভ্রম।

গাঢ় চিন্তায় তন্ময় কিশোর সহসা এক সময় চমকিত হইয়া দেখিল, রাজেশ্বরী ও মোহিনীবাবু ঝরণাকে লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

১২

প্রভাত হইতেছে। মুমূর্ষুর পাশে বসিয়া তাহার মুখ চাহিয়াই কয়টি প্রাণীর সে দিন রাত্রি কাটিল। উষার আভাষের সঙ্গেই সেই অজ্ঞান অচৈতন্য দেহে জ্ঞানের আভাষ দেখা দিল! ক্রমে পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে চোখ মেলিয়া বিনয় ডাকিল, "মাণিক, আয়, একবার কাছে আয়।" নির্ব্বাক মাণিক পিতার তুষার-শীতল হস্ত-পদে ঈষৎ উত্তাপ আনিবার জন্য ও সকলের অজ্ঞাতে সমস্ত রাত্রি কোথায় না তাহাদের চাপিয়া চাপিয়া ধরিতেছিল, সহসা এই পরিষ্কার কণ্ঠের সতেজ আহ্বানে মূঢ়ের মত কেবল চাহিয়াই রহিল! এ কোন্ আহ্বান সে তখনো বুঝিতে পারিতেছিল না! সে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই রাজেশ্বরী তাহার মুখের কাছে যাইবা মাত্র বিনয় বলিল, "কে?—মামীমা! তোমাকেই একবার চাইছিলুম যে মনে মনে, পায়ের ধূলো দাও।" হাত বাড়াইয়া মাতুলানীর পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহার কালিমাময় বিশুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া বিনয় সকরুণ কণ্ঠে বলিল, "এইবার মাপ্ কর আমায়, বড় কষ্ট দিয়েছি তোমায়—জানি।"

"বিনয়"—রাজেশ্বরীর অন্তরের রোদন এইবার শতধা হইয়াই ফাটিয়া পড়িল।

"আজ তো আমি আমার মাণিককে পেয়েছি, আর কান্না কিসের মা? এই নাও, আবার তাকে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি—আমার তো আর কোন কষ্ট নেই! তুমিও—তুমিও এমনি আমার মত সুখী হও—সব পাও!"

"বিনয়, আমি যে পরের ছেলের লোভে নিজের সন্তানকে এমন করে মেরেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত আমার সমস্ত জীবন ধরে চল্‌ছে,—এখন—"

"আমার মাণিককে আমি আজ যে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি মামীমা,—কেড়ে নিয়েছিলে, তাই সইতে পারিনি! আজ থেকে মাণিক তোমার—তোমার—"

"বিনয়,—ভাই—আমায় কিছু বল্‌বে না—একবার চাইবে না?" মোহিনীবাবুর গম্ভীর স্বরে চক্ষু মেলিয়া হাসি-মুখে বিনয় বলিল, "দাদাও এসেছ আমায় দেখ্‌তে? পায়ের ধুলো দাও ভাই। নিতে পারছি না যে—"

"তোমার ঝরণাকে এনেছি যে ভাই—তাকে না কি ডেকেছিলে! তাকে কই দেখ্‌ছনা যে আর!"

"কই—আমার মা-ঝরণা! কই মা? এসেছিস? সত্যি? আঃ—আমার যে—আমার যে মাণিকের গাছে মুক্তার লতা কল্পনায় জড়িয়েছিলুম সেই রাঁচিতেই! সেইখানে যে খুঁজে-খুঁজে গিয়েছিলুম! দাদা—মামীমা—তোমরা দেখো—আমার তো—আমি তো সে ভাগ্য করিনি!—কেন কাঁদছিস মা? অজ্ঞানেও তোকে খুঁজেছি যে, আয়,—আমার মাণিক—আয়—"

ডাক্তার এবার শেষ কর্ত্তব্য করিতে আসিয়া বলিল, "দরজা-জানালা-গুলো খুলে দিন্"—তার পরে আশ্রমের সেবকদের পানে চাহিয়া বলিল, "এইখানেই? মোক্ষ-মন্দিরে?" সকলেই "না—না" বলিয়া কথাটাকে আর শেষ হইতে দিল না। তার পরে ঝরণা ও মাণিকের হাতে হাত রাখিয়াই ঈষৎ হাসি-মুখে বিনয় সর্ব্ব আধি-ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইল!

*   *   *   *

পিতৃহীন হতভাগ্যের বেশে কিশোরকে দেখিয়া রাজেশ্বরী আবার বহুক্ষণ বিবশা হইয়া কাঁদিলেন। তাঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়া মোহিনীবাবু বলিলেন, "এইবার আমরা যেতে পারি কি?"

রাজেশ্বরী চোখের জল মুছিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "আমার তো বলবার কোন মুখ নেই—তবে বিনয়ের আপনি দাদা হয়েছিলেন, সেই সাহসে বল্‌ছি—বিনয়ের সাধ তো শুনেছেন? আর দুদিন থেকে কিশোরকে পিতৃকৃত্য করিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যান—নিয়ে গিয়ে যা উচিত মনে করেন, করুন! আমার কোন-কিছুরই ঠিক নেই—"

"কিসের ঠিক নেই?—শুন্‌ছি, আপনি না কি এখানেই বাস কর্‌বেন, বলেছেন? এও কি কখনো হয়, দিদি? আপনি কিশোরের আর ঝরণার মা,—আপনার কোল ছাড়া ঝরণাকে আমরা কোথায় দিতে পারি? কিশোরের পিতৃ-কৃত্যের পরে আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, এ জেনে রাখুন।"

কিশোরকে মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পারছি না—আপনাকেই ভার দিই। ঐ সেবাশ্রমে বিনয়ের নামে সেদিন হাজার কতক টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন্—অনাথসেবার ঐ-রকম একটা চত্বর যেন বিনয়ের নামে দেওয়া হয়। আর তার শ্রাদ্ধ—"

"দেখুন, কিশোরের যে রকম প্রকৃতি—এখনো সে কি কর্‌বে বুঝ্‌ছি না। কে পুরোহিত শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ করতে এসেছিলেন—তাঁকে সে বল্‌লে, তিল-কাঞ্চনের ফর্দ্দ করুন। আপনি নিজে বলুনএকবার তাকে এ বিষয়ে।"

কিশোরকে ডাকাইয়া অতি সংক্ষিপ্তভাবে রাজেশ্বরী বলিলেন, "বিনয়ের নামে কর্ত্তার উইলে যে সম্পত্তি দেওয়া আছে, তা থেকে তার নিয়মিত ভাবে শ্রাদ্ধ, আর বাকি সবটা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তার স্মরণ-কৃত্যে উৎসর্গ করাতে হবে ঐ দিনে। তারই বন্দোবস্ত কর।"

কিশোর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বিষাদ-ক্ষিন্ন স্বরে বলিল, "আর কেন মা? তিনি ছেলে-বিক্রির অর্থ জীবনে যখন স্পর্শ করেন নি, তখন আর কেন তাঁকে তাঁর ভাগী কর? তাঁর শ্রাদ্ধ তিল-কাঞ্চনেও না করে শাস্ত্রের যে সর্ব্বশেষ ব্যবস্থা, তাই-ই আমার কর্‌তে ইচ্ছে হচ্চে! তাঁর তো কিছুই নেই!—তাঁর ছেলে মাণিক তাঁর শ্রাদ্ধই বা কোন্ অর্থে কর্‌বে? এ তিল-কাঞ্চনে যা ব্যয় হবে, এ আমার তোমার এষ্টেট থেকে ধার বলে লেখা থাক্‌বে,—আমার শরীর দিয়ে খেটে এ আমি শোধ দেব। মা দুঃখ পেয়ো না, রাগ করো না—ভেবে ছাখো ভাল করে, তিনি জীবনে যা স্পর্শ কর্‌লেন না, তা কি এখন তাঁর নামে ছোঁয়ানো উচিত? একান্ত অশক্তের পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ বনে গিয়ে কেঁদে এলেও যে সিদ্ধ হয়। আমি তাই করব,—তিনিও তাতেই বেশী খুসী হবেন, জেনো! তুমি অনুমতি দিলেই পারি।"

"কিশোর, কিশোর, ওরে—তারই যে সর্ব্বস্ব! আমার নয়, তোর নয়, সব তার—তার! তার মামা তাকেই সব দিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ভয়-দেখানিতে অন্য পোষ্যপুত্র নিলে মাণিকের সব যাবে, এই ভয় যদি সে না করত, সবাই যদি এই ভয় না দেখাত, তাহলে আমার সাধ্য ছিল না, অন্যের ছেলেকে পোষ্য নি। তার মামা—যদি বিনয় ছেলে দেয় তবেই, নইলে বিনয়ই আমার সর্ব্বস্বের মালিক থাক্‌বে—এই প্রতিজ্ঞা আমায় করিয়ে তবে আমার দৌরাত্ম্যে বাধ্য হয়ে তোমার ছেলে করে নিতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমায় কেবল আমার সাধ মিটুবার খেলনা করে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি,—তিনি জান্‌তেন, বিনয়ই তাঁর ছেলে বিনয়কেই তিনি সর্ব্বস্ব দিয়ে গিয়েছেন। ওরে, বিনয়ের নামে আজ তাঁর সব সম্পত্তি দান করলেও সে নেবে। সে তো আজ সব জেনেছে। চলে যাবার সময়ও বুঝি সে সব বুঝ্‌তে পেরেছিল—তার মামা তার কাণে

কাণে সব বুঝি বলে দিচ্ছিলেন, তাই হেসে নিজের ধন এইবার আমাদের দান করে গেছে। এখনও আমার কথা শোন্ কিশোর,—এতে তার কিছু অতৃপ্তি হবে না।"

আবার এক নূতন তরঙ্গ! সবই তার ছিল! সে কেবল তার ··কের অভাবেই জগৎকে তৃণের মত পায়ে দলিয়াছিল! সেই একই তার জীবনের পরশমণি, সাতরাজার ধন মাণিক ছিল যে!

কাঁপিতে কাঁপিতে আবার বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে কিশোর বলিল, "তাই হবে মা।"

১৩

জানালার কাছে ঝরণা দাঁড়াইয়া ছিল। জানালার নীচেই কাশী-তলবাহিনী ভাগীরথীর বেগবতী জলধারা পোস্তায় আঘাত করিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। দুইদিকে অগণ্য সোপানশ্রেণী, তাহাতে কাশী-বাসীর স্নান-আহ্নিক পূজার কলরব বিচিত্র সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, ঝরণা জানালা হইতে মুখ ঝুঁকাইয়া তাহাই দেখিতে ও শুনিতেছিল। মুণ্ডিত মস্তকে নত মুখে কিশোর আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। পদশব্দে ফিরিয়া দেখিয়া, ঝরণা কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে বুঝিয়া, কিশোর বলিল, "জীবনে যা কখনো কর্‌তে পার্‌ব বলে মনে করিনে, আজ তাই করতে এসেছি। অবস্থা বুঝে মাপ করো ঝরণা।"

কিশোরের কণ্ঠস্বরে ব্যথিতা ঝরণা কি করিবে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, কেবল দ্বিগুণ কুণ্ঠিত মুখে একবার তাহার পানে চাহিয়া আবার মাথা নীচু করিল। কিশোরের বিবর্ণ মুখ-কান্তি এখন যেন আরও কি এক রকম হইয়া উঠিয়াছে! ঝরণার একটা অতীত দিনের স্মৃতি মনে

পড়িল,—যেদিন সে তাহার কাকাবাবুর প্রত্যাগমনের সংবাদে তাহাদের সেদিনের নিমন্ত্রণ রহিত করিবার জন্য রাজেশ্বরীকে বলিতে গিয়াছিল। সিঁড়িতে সেই অতর্কিত সাক্ষাতের পর 'কারে' বসিয়া উর্দ্ধ-দৃষ্টি যে উদাস ব্যথা-পাণ্ডুর মুখচ্ছবি বিনয়কে গবাক্ষ-পথে দেখিয়া বেদনা পাইয়াছিল, তাহার অন্তর অন্তরে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিয়াছিল,—সেই মুখ, সেই দৃষ্টি আজ এই শোক-শান্ত সংযত-কান্তি কিশোরেও ফুটিয়া উঠিয়াছে! মৃদুস্বরে ঝরণা বলিল, "কেন?"

"কি 'কেন' বল্‌ছ, ঝরণা?—কেন এই ভাবে কথা কইতে এসেছি—কেন তোমায় ব্যস্ত কর্‌তে এসেছি?"

"না, তা নয়!—কেন—কেন আপনি—"

"কি কেন আমি—বল?"

"এমন ভাবে কথা কইছেন কেন?"

"তাই তো বল্‌তে এসেছি। সবই তো নিজের কাণে তুমি শুনেছ,—কিন্তু তবু আমার এখনো একটু বল্‌বার আছে! আমাকে আমাদের গুরুজনেরা যা দিতে চাচ্ছেন, এ সৌভাগ্য-সম্ভাবনার আভাষ কল্‌কাতাতেও আমি একটু যেন পেয়েছিলুম—কিন্তু তা সহ্য করতে পারিনি বলে যে আমি পালিয়ে আসি, তা কি তোমরা আন্দাজ কর্‌তেও পারো ঝরণা?"

"পেরেছিলুম,—কিন্তু এ কথা আমায় না বলে এখন বাবাকে জানানোই আপনার উচিত।"

"তা জানি, তবু একবার তোমাকেও আজ জানাতে দাও। সেই রাঁচির—সেই এক যুগের—"

"আপনার সে আষাঢ়ে গল্প যার মুখে আমাদের বাড়ীর কারুরই জান্‌তে বাকি ছিল না—কিন্তু কি দরকার ছিল আপনার এ আরব্যোপন্যাস তৈরী করে সকলকে জানাবার? নিজের মাকে বোঝাবার?

ঝরণার উত্তেজিত আরক্ত মুখের দিকে স্বপ্নাভিভূতের মত চাহিয়া কিশোর যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বরেই বলিল, "আরব্যোপন্যাস? তাতেও কি এমন অসঙ্গত স্বপ্নের কাহিনী আছে ঝরণা? আমার মত কোন ঘৃণ্য হতভাগ্য পথের কাঙাল কি এমন দুর্লভ স্বপ্ন দেখেছিল?"

ঝরণা আবার কি-একটা শক্ত কথা বলিতে গিয়া কিশোরের মুখের পানে মুখ তুলিয়া সহসা থামিয়া একদৃষ্টে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সত্যই কি কিশোর এখনো স্বপ্নই দেখিতেছে?—যত অন্যায়ই করুক, ইহাকে কি আর কঠিন কথা বলা যায়?—কিশোর বলিয়া চলিল, "কিন্তু তবু—তবুও এই সাধারণ হতে শত ক্রোশ দূরের নিজের জীবন, এর কথা কি ভোলার সম্ভাবনা ছিল আমার পক্ষে? লোকের চোখের আড়ালে সারা জীবন ধরে যে স্বপ্ন দেখ্‌তে পারি—জাগ্রত জীবনে যদি তা সত্য হয়ে উঠতে যায়, তখন কি—"

"তখন তাকে লাথি মেরেই ছুঁড়ে ফেলে পালিয়ে যেতে হবে। কিশোর-বাবু, আপনার যে দুঃখের জীবন, তা আমরাও বুঝি, তবু আপনার অন্যায়ও বড্ড বেশী। তারই বাড়াবাড়িতে নিজেও সুখী হতে পারেন না—যারা আপনার আপন-লোক, তাদেরও কষ্ট দেন্। এই যে নিজেকে ঘৃণ্য বল্‌লেন, কত কি বল্‌লেন, এও কি সবই ঠিক্? দুঃখী হতে পারেন, ঘৃণ্য কিসে হলেন?"

"নই কি ঝরণা? নিজের কথা মনে করে ত্যাখো—সেই রাঁচিতে যেদিন—যেদিন বাবার মুখে আমার কথা শোনো—সেদিন থেকে কি ঘৃণার—"

"কি আশ্চর্য্য! আপনি বলেন কি! তার নাম ঘৃণা? কতটুকু তখন আমি? সেও কি ঘৃণা কর্‌বার বয়স? হয়তো আশ্চর্য্য হয়েছিলুম, কাকার কাছে সব কথা শুনে খুবই একটা ধাক্কা লেগেছিল মনে—এ বেশ

মনে আছে। কিন্তু তার নাম কি ঘৃণাই বল্‌তে পারেন? আপনাদের কথা ভেবে একটা দুঃখ, কষ্ট—”

“হতে পারে ঝরণা, সে বয়সে তোমার পক্ষে তাইই ভাবা সম্ভব। কিন্তু আমার যে ও ভুল হয়েছিল, তার কারণ, আমি তো সাধারণ বালক-বালিকার মত সৌভাগ্যে করিনি, তাই অকাল-কুটিলতায় আমার জীবন ভারাক্রান্ত ছিল। কিন্তু এখন? এখন তো তুমি আর সে সরলা বালিকা নেই ঝরণা, এখন তো বুঝেছ, আমি কি! তুমি না বল্লে এখনি, ‘আপনার অন্যায় বড বেশী, কিন্তু তোমার উপর তো কোন অন্যায় করিনি, ঝরণা। জানি আমি তুমি এমন হয়েও ঠিক আমাদের ঘরের দশ বছরের মেয়ের মতই, মা-বাপের আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছার কাছে নিজের স্বাতন্ত্র্য বলে স্বপ্নেও কিছু জানো না,—তাঁরা যা করবেন তাই মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছ! কিন্তু তবু আমার কি সারা জীবনের অন্যায়ের ওপরেও তোমার জীবনটাকে এমন করে বিফল করে দেওয়াই সব-চেয়ে বেশী হবে না?”

“যদি অন্যায় বলে মনে করেন, তবে—”

“হ্যাঁ, করি! তুমি না এখনি রাগের মত করেই আমার সফল স্বপ্নকে ছুঁড়ে ফেলার কথা বললে! যা মাথায় ধরবারও আমি নিজেকে যোগ্য মনে করি না, তাকে কোন্ সাহসে হাত বাড়িয়েধরব? হয় তো তুমি দুঃখী ব’লে হতভাগ্য ব’লে আমায় দয়াও করতে পারো ঝরণা, কিন্তু তাঁরা যা আমায় দিতে চাচ্ছেন, তাতে এইটুকুই কি পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারব? যাকে জীবনে কখনো শ্রদ্ধা করা কিছুতেই তোমার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, তাকেই—”

ঝরণা এবার উত্তেজনায় একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিল, “আপনি কি বলতে চান যে আমাদের গুরুজনরা এতই অবিবেচক

যে, যা এতখানি অসম্ভব, তাইই তাঁরা করতে চাচ্ছেন? তবে এ হতে দেওয়া যে আপনার পক্ষেই অসম্ভব আপনার তাঁদের একবার এখন সেটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। কেন না আপনার সেই আজগুবি গল্পের অন্যায়েই আপনার মা এ ভ্রমটা করেছিলেন, আর আমাদেরও তাই বুঝিয়েছিলেন। এখনো বোধ হয় সেই ভ্রমেই তাঁরা আছেন—"

"আমার অক্ষে অসম্ভব? তোমায় শ্রদ্ধা করা—তোমায়—তোমায় কি বল্ছ ঝরণা? যদি সে আজগুবি গল্প তোমরা জান্‌তেই, তবে এমন কথা কি করে বলছ?"

"কেন বল্‌ব না? আপনার আগাগোড়া সবই যে আজগুবি! জগতের সমস্ত সত্যকেই এমনি ক'রে অস্বীকার করে করেই আপনার এমন দশা! নিজে এত দুঃখ পেলেন—দুঃখ দিলেন। তবে এও মনে হয়, আপনার অবস্থায় পড়্‌লে আমিও হয় তো এমনি করতুম!"

ঝরণার উত্তেজনা-ভরা কণ্ঠস্বর ক্রমে যেন বুজিয়া আসিল। আর সেই কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি-ভরা মুখকান্তিকে কিশোর যেন একটা অজ্ঞান তত্ত্বও খুঁজিয়া পাইল। অনিমেষ চক্ষে সেই মমতায ভবা মুখের পানে চাহিয়া সবই যেন সম্ভব বলিয়া তাহার মনে হইল।

ঝরণা আবার বলিল, "কিন্তু ভগবানের বিধানেব উপর একটু নির্ভর করতে শিখুন। তিনিই তো সব করান্—নইলে এ-সব কি মানুষের দ্বারা সম্ভব? তার পরে—ভগবান আপনাদের এত কষ্ট দিয়ে শেষটা কতখানি দয়া দেখালেন, সত্যি তো? তাঁকে কতখানি শান্তি দিলেন, সুখ দিলেন তিনি! আর আমাদেরও! ওঃ কাকাকে যদি এটুকুও দেখ্‌তে না পেতুম! স্বপ্নেও জান্‌তুম না, তিনি, আমাকেও দু'দিনের দেখায় এত ভাল বেসেছিলেন,—যাতে জীবনের শেষ সময়ে আমাদেরই কাছে ছুটে গেলেন; স্বপ্নেও জানতুম না যে কাকাই রাঁচির সেই তিনি—

যাঁকে আমার মোটেই মনে ছিল না।" বলিতে বলিতে ঝরণার ব্যথা-পাণ্ডুর মুখ আবার আরক্ত হইয়া উঠিয়া চোখে অশ্রুর রেখা আনিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সেটুকু কয়েকটা ফোঁটার আকারে ঝরিয়া কিশোরের মনের জ্বলন্ত আগুনে যেন সুধাধারা পাত হইয়া গেল। সে স্বপ্নাভিভূতের মত বলিল, "তিনি বরাবরই মনের মধ্যে এই ইচ্ছা করতেন,—তাঁর এত সাধের কথা কতবার অজ্ঞানের মধ্যেও বলেছেন। তিনি যেন জেনেই গেছেন—"

"তাও কি আপনার মনে পড়ছে না? তাই তো সবই আপনার বাড়াবাড়ি বলতে ইচ্ছা হয়। আর আপনার যিনি চিরদিন মা হয়ে আছেন, তাঁর কথাও একবার আপনার মনে হচ্ছে না? তিনি যে—"

"সবই মনে হচ্ছে ঝরণা, তবু একবার বল আবার, সবই সম্ভব। আমাদের গুরুজনরা, আমার স্বর্গের দেবতা, তাঁরা দেখ্‌তে পাচ্ছেন সবই, বুঝতে পেরেছেন সব, তাই আমাদের এই আসল মিলন তাঁরই নিজ-হাতে বেঁধে দিচ্ছেন! আমি তোমার শুধু দয়া নয়, মায়া নয়—স্নেহও পেতে পারি—আমার কথা তুমি জান্‌তে এত দিন, জান্‌তে আমার এই আরব্য উপন্যাসের গল্পকে, তাই ঘৃণা করনি—তাই দয়া করে এই অসঙ্গত আশাকে—"

"যা খুসি করুন আপনি! আপনার মিছে বকুনি আর শুন্‌তে চাই না। মা আসছেন—" বলিতে বলিতে ঝরণা, সেই রাঁচির ছোট্ট ঝরণাটির মতই ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬